মূল্যায়ন

সংখ্যা - 2, 4, 5, ফাল্গুনীয়া

- ডঃ কে. এম. আশরফ—কমিউনিস্ট নেতা ও ঐতিহাসিক
- কমিউনিস্ট পার্টি ও পি. ডি. এ—বিতর্কিত প্রশ্নের বিশদ আলোচনা
- সোভিয়েত বিরোধিতার বিপজ্জনক দিক—একটি আলোচনা

* চিলির শিক্ষা—পনোমারিয়ভ
* গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে মূল শক্তি
* শ্রমিকশ্রেণী—সোভিয়েত গবেষক

- ম্যাক্সিম গোর্কির রোজনামচা থেকে
- 'টোটা' নাটক সম্পর্কে আলোচনা

১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮১

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

রূপের প্রকাশ চুলে...

আর সেখানেই কেয়ো-কার্পিনের কথা ওঠে।
এক অতুলনীয় কেশ তৈল...
চুল চটচটে হয় না
জামা কাপড়ে দাগ লাগে না
মনোরম গন্ধ

দে'জ মেডিকেলের তৈরী

নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখুন-
চুলের সৌন্দর্য্য অটুট রাখুন

With best compliments from :

NAVA BHARAT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

NILHAT HOUSE ANNEXE

11 R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-1

Regd. Office :
920, TILAK ROAD, HYDERABD-1.

Other Branches :
BOMBAY • COCHIN • DELHI • MADRAS •
GUNTUR • AGRA • MORADABAD

একনিষ্ঠ শিল্পসাধনায়
কারিগরি দক্ষতায়
জাতীয় স্বয়ম্ভরতায়
সর্বাত্মক সেবাপরায়ণতায়
লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনে
নিরন্তর যত্নবান
আপনার অনলস প্রতিবেশী
বাটার দোকান

Bata
Bata
Bata
Bata

With best compliments from :

BENGAL POTTERIES LIMITED

Makers of Fine Crockeries & Insulators

বাংলা ভাষায়

মার্কসবাদ চর্চায় অমূল্য সংযোজন

শান্তি

স্বাধীনতা

সমাজতন্ত্র

পড়ুন ও পড়ান

নিজস্ব সংগ্রহে রাখার মত ও উপহার দেওয়ার মত কয়েকটি বই

●

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস	১৫·০০
রূপনারাণের কূলে : গোপাল হালদার	৬·০০
আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	১০·০০
দ্বীপান্তরের বন্দী : নলিনী দাস	১০·০০
রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : চিন্মোহন সেহানবীশ	১৮·০০
মানুষের পার্থিব সম্পদ : লিও হুবার ম্যান	১০·০০
সলঝেনিৎসিন—শাখারভ ধাপ্পাবাজি : গাস হল	১·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

তরী হতে তীর : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম ও মার্কসবাদ : অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র

●

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড

৪/৩বি, বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্যায়ন

শারদীয় সংখ্যা

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

এই সংখ্যায় থাকবে : জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ : যেমন আরব দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, লাতিন আমেরিকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রভৃতি নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা। একটি প্রবন্ধে আলোচনা তোলা হয়েছে ভারতে অ-ধনতান্ত্রিক পথ আদৌ প্রযোজ্য কিনা ?

আরও থাকবে : ভারতের জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২) ও কমিউনিস্ট পার্টি এই বিতর্কমূলক বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ।

এ ছাড়া থাকবে : ভারতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ : যেমন, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ার পরিপ্রেক্ষিত ; ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা বিশেষ ক'রে কংগ্রেসে প্রগতিশীল কারা ?—এই সমস্ত বিষয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা।

আরও থাকবে : পুঁজিবাদী দুনিয়ার সাম্প্রতিক সংকট সম্পর্কে তথ্যবহুল, চিন্তাশীল প্রবন্ধ।

এজেন্টদের যথাসত্বর অর্ডার জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মূল্যায়ন

১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
আষাঢ়-শ্রাবণ
১৩৮১

সূচী

পৃষ্ঠা

ডঃ কে. এম. আশরফ / পত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় ১
চিলির শিক্ষা / বোরিস পনোমারিয়ভ ১৫
আমার রোজনামচা থেকে / ম্যাক্সিম গোর্কি
সুনীল জানা অনূদিত
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা /
কিরিল শিরিনাভা
সোভিয়েত বিরোধিতার এক বিপজ্জনক দিক / সুবিনয় সেন
কমিউনিস্ট পার্টি ও পি-ডি-এ / রণধীর দাশগুপ্ত
পিপল্‌স লিট্‌ল থিয়েটার অভিনীত "টোটা" / নরহরি কবিরাজ
পুস্তক পরিচয়

প্রচ্ছদ : অমূল্য দাস

সম্পাদক :
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০, বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত ও
কালান্তর প্রেস, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত।

A new theoretical journal

Problems of National Liberation

Editors : **Satyendranarayan Mazumdar**
Narahari Kaviraj

CONTENTS

- Introducing the Communist Manifesto
  —Boris Ponomaryov
- The Development of Nepali speaking Nationality in Darjeeling
  —Satyendranarayan Mazumdar
- The Santhal Agitation over the Rent Question
  —Narahari Kaviraj
- Nature of Congress Agrarian Reforms—Z. A. Ahmad.
- Non-Capitalist Development in Tanzania
  —Parimal Chandra Ghosh
- Non-Capitalist Path in India Certain Implications :
  (a discussion)
- Book Review : 1. Outline History of Communist International
  2. Amiya Bagchi—Private Investment in India

Watch for the date of publication

To be had of :

Manisha Granthalaya Private Limited

4/3B, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12

ডঃ কে. এম. আশরফ

পত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম নেতা ডক্টর কে. এম. আশরফের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হচ্ছে—সম্পাদক]

প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত কুনওয়ার মহম্মদ আশরফ আজকের লোকজনের কাছে যথেষ্ট পরিচিত নন। আজ যেখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, আর মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কাছ থেকে মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আশরফের জীবনী পর্যালোচনা কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক কাজের অংশ হওয়া উচিত, কারণ আগের যুগের কমিউনিস্টদের বিপ্লবী অবদান সম্পর্কে নতুন যুগকে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, আর এ সবের বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করেছেন কুনওয়ার মহম্মদ আশরফ।

১৯০৩ সালের ২৫ নভেম্বর আলিগড়ের হাথরাস তহশীলের দরিয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আশরফ। একটি মুসলমান রাজপুত পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানদের অনেক রীতিনীতি ছিল এক। সংস্কৃতির এই একত্ব গর্বের সঙ্গে স্বীকার করতেন আশরফ, তাঁর চিন্তাধারাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নাগরিকত্ব বিহীন আশরফ যখন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি লণ্ডন থেকে এসে নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য, নেহরু তাঁকে বলেন, 'আপনি এখন আর ভারতীয় না।' 'আমি আপনার চেয়ে বেশি ভারতীয়, আমি রাজপুত'—ছিল আশরফের জবাব।

খুব অল্প বয়সেই আশরফ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতিতে আসেন, যদিও

ধর্মের দিক থেকে। মোরাদাবাদে স্কুলে পড়ার সময় হাজব্ আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের দলের সংস্পর্শে আসেন তিনি। ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিয়েছিল এই দল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফত আন্দোলন এবং হিজরত আন্দোলন (যে আন্দোলনে মুসলমানদের কয়েকটি দল—মুজাহির—ভারতবর্ষ ছেড়ে গিয়েছিলেন তাশখন্দে-এ, যেখানে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব শুরু হয়েছে) আশরফের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ইতিমধ্যে তিনি আলিগড়ে মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। সে সময়টা ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ের যুগ, অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যুগ। গান্ধীজী এবং মওলানা মহম্মদ ও শওকত আলি ডাক দিলেন ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করার ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণ আশরফ।

আশরফের রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপে কলেজের ইংরেজ শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হলেন, সতর্ক করে দিলেন তাঁকে। ইংরেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাকে সাড়া দিয়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ ছেড়ে নবপ্রতিষ্ঠিত জামিয়া-মিলিয়া য় যোগ দিলেন তিনি। আলিগড়ে প্রতিষ্ঠিত এই জামিয়া-মিলিয়া পরবর্তীকালে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এখানকার প্রথম দল স্নাতকের মধ্যে ছিলেন আশরফ।

এই সময় আশরফের রাজনৈতিক জীবনের আর একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। ১৯২২-এ চৌরিচৌরার পরে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সংগ্রামের গান্ধী-প্রদর্শিত পথ সম্বন্ধে বহু যুবকের মতো আশরফেরও মোহভঙ্গ ঘটে। নতুন পথের সন্ধান করতে থাকেন তিনি। ইতিমধ্যেই মওলানা হসরত মোহানির সঙ্গে সংযোগ ঘটেছিল তাঁর। ১৯২১-এ কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব হসরত মোহানিই প্রথম আনেন। পরে ১৯২৫ সালে কানপুরে সি পি আই-এর প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির তিনি ছিলেন সভাপতি। আশরফ এরপর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী শওকত ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন ছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে, তার লেখাও পড়তে শুরু করেন তিনি। তবে তখনও পর্যন্ত

সমাজতন্ত্রের আদর্শে আকৃষ্ট হন নি আশরফ। তখন তার প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল ১৯২১-এর আন্দোলন প্রত্যাহারের পরবর্তী পর্যায়ের নীতিভ্রষ্টতা-সঞ্জাত ইংরেজ প্ররোচিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন তিনি, এবং গ্রামাঞ্চলে কিছু জায়গা বেছে নিয়ে কাজ চালাতে থাকেন।

ইতিমধ্যে আলিগড় কলেজ পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। আশরফ আলিগড়ে ফিরে আসেন ও সেখান থেকে এম. এ ও এল. এল. বি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়েই তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নে কোন ছাত্রের পক্ষে অধিকারযোগ্য সর্বোচ্চ পদ ছিল সহ-সভাপতির পদ। রাজনৈতিক মতামত সত্ত্বেও আশরফ সহ-সভাপতি হন।

১৯২৭ সালে আলোয়ারের তৎকালীন মহারাজার কাছ থেকে একটি বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান আশরফ। তার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন আলোয়ারের লোক। মহারাজা আলিগড়ে এসে আশরফের বক্তৃতা ও দীপ্তিতে মুগ্ধ হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে যোগাযোগও ছিল তাঁর। কিন্তু এই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আলোয়ারের মহারাজার বিভিন্ন অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচার দেখে শেষ পর্যন্ত আশরফ স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ফলে এই বৃত্তি পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কোন বৃত্তি ছাড়াই তিনি গবেষণা শেষ করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক খ্যাতি সত্ত্বেও ডক্টর আশরফ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চিন্ত পড়াশুনোর জীবনের বদলে অন্য এক পথ বেছে নেন। সাকলাতওয়ালা ও অন্যান্য কয়েকজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আকৃষ্ট ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯২৯ সালে ইংল্যাণ্ডে তিনি কমিউনিজম বরণ করেন। সেইদিন থেকে ১৯৬২ সালের জুন মাসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন।

পার্টির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা একটি ঘটনার উল্লেখেই পরিস্ফুট হবে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কিছু ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক কারণে তিনি দিল্লি

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কমিউনিস্ট-বিরোধী কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ডক্টর আশরফ, শুনেছি আপনি কমিউনিস্ট'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেন, 'আপনি ভুল করছেন, আমি শুধু কমিউনিস্ট নয়, পার্টি সদস্যই বটে।'

১৯৩২-এ ভারতবর্ষে ফিরে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর অধ্যাপনা করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃস্থান গ্রহণ করেন ও তার বামপন্থী অংশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ই. এম. এস. নামবুদিরিপাদ, ডক্টর জেড. এ. আহমেদ, সাজ্জাদ জহির, অশোক মেটা, রামমনোহর লোহিয়া ও অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের বামপন্থী দল হিসেবে স্থাপিত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালের লখনৌ অধিবেশনের পর ডক্টর আশরফ জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জবাহর লাল নেহরু তাঁকে মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচীর দায়িত্ব দেন। ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরা আবার কংগ্রেসে যোগদান করেন।

যে কাজ তাঁকে কংগ্রেস থেকে দেওয়া হয়েছে, সে কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ছিল ডক্টর আশরফের। আরবী ও ফারসী ভাষা, ইসলামী ইতিহাস ও দর্শন এবং মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস, এসব বিষয়েই সুগভীর জ্ঞান ছিল তাঁর, আর ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলমান নেতা ও উলেমাদের সঙ্গে দুই দশকের যোগাযোগ। আর এই সঙ্গে বক্তা হিসেবে তাঁর অসাধারণ প্রকাশের ক্ষমতা মুসলমান জনগণকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে টেনে রাখার ও মুসলিম লীগ পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরানোর কাজে তাঁর সহায় হয়। কমিউনিস্ট ও হিন্দু মুসলিম ঐক্যের মহান যোদ্ধা হিসেবে সর্বাধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সারাজীবনই তিনি এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

ত্রিশের দশকে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে আশরফের। ১৯৩৭-৩৪-এ আলোয়ারের মহারাজার বিরুদ্ধে মিও কৃষকদের সংগ্রামে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন কর ও রাজস্ব কমানোর দাবিতে ও মহারাজের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন তিনি—মহারাজার বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃষকদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেন। মহারাজার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটে এবং মহারাজা ক্ষমতাচ্যুত হন, রাজস্ব ও করের ক্ষেত্রে কৃষকেরা অনেকগুলি সুবিধা লাভ করে। একই ধরনের আন্দোলন ভরতপুরে শুরু হলে সেখানেও আশরফ নেতৃত্ব করেন। তাঁরই পরামর্শে মিও কৃষকেরা ও বিশেষ করে তাদের নেতা নৈয়র মুত্তালিব, চৌধুরী আবদুল হাই প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলন ও সত্যাগ্রহে যোগদান করেন।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে অপারগ হন, সমস্যা আগের থেকেও জটিল হয়ে ওঠে। মুসলমান গণসংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের এই নেতিবাচক অগ্রগতি ঠেকানোর শক্তি ডক্টর আশরফের বা কমিউনিস্টদের ছিল না।

ইতিমধ্যে ডক্টর আশরফ সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে কমিউনিস্ট দলের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখছিলেন। ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন তিনি, আর ঐতিহাসিক নাগপুর অধিবেশনের উদ্বোধন করেন (ডিসেম্বর ১৯৪০)। ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত বহু জন-সভায় বক্তৃতা করেন আশরফ। এই সময় (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে) মৌলানা আজাদ যখন কংগ্রেস সভাপতি হন, তাঁর বিশেষ অনুরোধে আশরফ তাঁর সচিব হিসেবে কাজ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হাজার হাজার কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও বামপন্থীদের সঙ্গে আশরফকেও পাঠানো হয় দেউলী বন্দী শিবিরে। সেখান থেকে ছাড়া পাবার পর ১৯৪৩ সালে পার্টির সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বম্বের প্রধান কেন্দ্রে কাজ করার জন্য যান তিনি। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ও ঐতিহাসিক ভূমিকা—এই দুই বিষয়কে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও পার্টির পত্রিকায় লেখার কাজ করতে থাকেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিতও হন। যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের সময় আবার লড়াইয়ের মধ্যে আসেন তিনি—পার্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণ প্রচার-অভিযানের সংগঠক হিসেবে।

১৯৪৬-এর কোন এক সময় আশরফ দিল্লিতে আসেন এবং দরিয়াগঞ্জের দিল্লি পার্টি কমিউনে খাওয়া ও মাসিক আট টাকা ভাতায় পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে থাকতে আরম্ভ করেন। যাঁরা সে সময় কমিউনে ছিলেন তাঁদের মধ্যে আশরফ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ মানসিকতা-সম্পন্ন। কিন্তু তিনি ছিলেন আবার অত্যন্ত বিনয়ী ও স্নেহপ্রবণ। পার্টি শৃঙ্খলাবোধ ছিল তাঁর অসাধারণ, আর সেই সঙ্গে রসবোধেরও অভাব ছিল না।

এই সময়েই তিনি উর্দু ভাষায় ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতি বিষয়ে বইটি লেখেন। গত একশো বছরের মুসলমান রাজনীতির বিভিন্ন ধারার সম্বন্ধে প্রচুর আলোকপাত করে বইটি।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের সময় তিনি ছিলেন দিল্লিতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য দিল্লি প্রাদেশিক পার্টি কমিটির নির্দেশে আশরফকে দরিয়াগঞ্জের কমিউন থেকে জামা মসজিদের প্রাদেশিক অফিসে চলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। বহুদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করার পর এই ঘটনায় আশরফ একেবারে ভেঙে পড়েন—most tragic moment of my life বলেছেন তিনি এই ঘটনাকে।

পার্টি এর পর দিল্লি থেকে 'নয়া দৌর' নামে এক উর্দু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করলে আশরফ তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রধানত অর্থের অভাবেই পত্রিকাটি বেশিদিন চলে নি। তবে 'নয়া দৌর' দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে মেওয়াটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জনগণের সঙ্গে পার্টির ছিন্ন যোগাযোগ পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। আশরফের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে মেওয়াটি কৃষকেরা তাদের পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করে।

এই সময় আলোয়ার ও ভরতপুর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র সরবরাহ চলছিল। ভরতপুরের মহারাজার নেতৃত্বে সামন্তরাজাদের ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী লোকজনের এই ষড়যন্ত্রের কথা আশরফ প্রকাশ করেন 'নয়া দৌর' পত্রিকায়। আশরফেরই নিরলস প্রচেষ্টায় নেহরু ও ভারত সরকারের দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়, তাঁরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

'নয়া দৌর' বন্ধ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই আশরফকে পাকিস্তানে যেতে

হয় সেখানকার পার্টিশন-পরবর্তী ভেঙে যাওয়া পার্টিকে পুনর্গঠিত করতে। সেখানে পার্টি প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। খুব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আশরফ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও গোপনে কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাকিস্তানে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকাকালীন তাঁর শরীর খুবই খারাপ হয়। কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর চেষ্টায় তিনি ছাড়া পান তৎক্ষণাৎ পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসবেন এই শর্তে। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব হারিয়েছেন, ভারতবর্ষ আর তাঁকে ফিরে নিতে রাজী নয়। অবশেষে নাগরিকত্ববিহীন অবস্থায় তিনি বন্ধুদের সাহায্যে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গবেষণার কাজ শুরু করেন তিনি—মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস লেখার উপাদান সংগ্রহ আরম্ভ হয়। প্রচণ্ড অর্থাভাব সত্ত্বেও তাঁর গবেষণা তিনি চালিয়ে যান। ব্রিটিশ মিউজিয়াম খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ঢুকতেন তিনি, আর বেরোতেন সবশেষে।

আশরফ সব সময়েই চাইতেন তাঁর প্রিয় ভারতবর্ষে ফিরতে। ফেরেন ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ববিহীন হয়ে বিশেষ অনুমতি নিয়ে। আর নেহরু ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় সত্ত্বেও নাগরিকত্ব পেতে দু বছরের বেশি সময় লাগে তাঁর। সবচেয়ে বেশি সাহায্য পান তিনি জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বকসী গোলাম মহম্মদের কাছ থেকে। গোলাম মহম্মদ কাশ্মীর জাতির ইতিহাস লেখার জন্য শ্রীনগরে একটি পরিকল্পনায় আশরফকে কাজ করতে বলেন। দু বছর পরে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের করোরি মল কলেজে যোগদান করেন ও ইতিহাস বিভাগের প্রধান হন। কলেজটি ডক্টর আশরফের কলেজ হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং কার্ল মার্কস কলেজ নামে পরিচিত হয়। ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত পঠনপাঠনের জন্য একটি সাত্যকার সৃজনশীল আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠেন তিনি।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এই জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না। সারাজীবন সক্রিয় রাজনীতি করার পর রাজনীতিতেই আবার ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল তাঁর অবশ্য নিজের শারীরিক ও অন্যান্য বাধা তিনি বুঝতেন। কিন্তু প্রায়ই সর্ব-ভারতীয় স্তরে কর্মীদের মধ্যে পার্টি শিক্ষা সংগঠিত করার পরিকল্পনা করতেন তিনি।

১৯৬০ সালে আশরফ বার্লিন যান বিশ্ববিখ্যাত হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি প্রোফেসর হিসেবে যোগ দেবার জন্য। বার্লিনে দু বছর থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রিয় বিষয় মধ্যযুগে ভারতের জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা ও পড়াশুনো করেন। এই জন্য তিনি মস্কো এবং তাসখন্দ যান, প্রচুর তথ্যও সংগ্রহ করেন। কিন্তু অকালমৃত্যুর ফলে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হোলো না। মধ্যযুগের একটি মার্কসীয় ইতিহাস, জনগণ ও তাদের কাজকর্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস—যে দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৬০-এর ইতিহাস কংগ্রেসে মধ্যযুগীয় বিভাগের সভাপতি হিসেবে তিনি প্রকাশ করেন—তা রচনার কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো।

কুনওয়ার মহম্মদ আশরফের জীবন—জাতীয় জীবনে তাঁর বিভিন্নমুখীন অবদান, আত্মত্যাগের ভাবাদর্শ, পার্টি ও জনগণের স্বার্থে তাঁর আত্মোৎসর্গ, আর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে তাঁর আসক্তি নতুন যুগের রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগাবে।

আজীবন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে গেছেন আশরফ। তাঁর পড়াশুনো গবেষণাতেও সেই প্রচেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায়। যে গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। সেই গবেষণাতেও সুলতানী আমলে জনগণের ইতিহাস রচনাকালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সত্যিকার রূপ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন তিনি।

ডক্টর কে. এম. আশরফের গবেষণাগ্রন্থ 'Life and conditions of the people of Hidustan'। সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনা-কালে তিনি তিনটি প্রধান পরিচ্ছেদে তাঁর আলোচনাকে ভাগ করেছেন—রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা।

রাজনৈতিক ছবিতে সর্বোপরি আছেন সুলতান। ইসলামী সাম্রাজ্য যতো বিস্তৃত হয়েছে, কোরাণের আদর্শ থেকে তা ততোই দূরে সরে গেছে। বিশেষত পারস্য জয় করার পর পারসীকদের সংস্পর্শে এসে পারসীক আদর্শ তারা সম্পূর্ণই গ্রহণ করে। রাজনৈতিক শাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শ, বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন, পারসীক রাজার ব্যক্তিত্ব,—তাঁর অন্তঃপুর, খোজা, ক্রীতদাস ও অনুচর, রাজকীয় অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজকীয় প্রতীক,—সামরিক সংগঠন, রণকৌশল, শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অঙ্গ পর্যন্ত ; সামাজিক আচারের

ক্ষেত্রে সামাজিক আমোদ-প্রমোদের সমস্তরকম উপকরণ,—শিকার, পোলো ও দাবা খেলা, সুরা, সঙ্গীত ও নওরোজ উৎসব মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিজ্ঞানসহ সব রকম পারসীক আদর্শ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত পারসীক রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারের মতবাদ। বাগদাদ থেকে এই ধারণাগুলি আসে গজনীতে ও সেখান থেকে ভারতবর্ষে। গজনী ছিল দিল্লি সুলতানদের রাজনৈতিক আদর্শের উৎস।

পারসীক রাজতন্ত্রে রাজা ছিলেন পৃথিবীতে ঈশ্বর—তাঁর ইচ্ছাই সব। এই ধরনের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, বিশেষ করে ঈশ্বর ও মানুষকে এক করে দেখা, কখনোই মুসলমান ধর্মে স্বীকৃত নয়। ফলে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ঐশ্বরিকত্ব আরোপিত হয়েছে, সুলতানের পদে। হিন্দুস্তানে কিন্তু এরকম প্রচেষ্টা প্রায় দেখা যায় না—সুলতান মানুষের চেহারায় ঈশ্বর বলেই স্বীকৃত। অতএব দিল্লির সুলতান ছিলেন সমস্ত আইনের ওপরে বাধাবন্ধবিহীন স্বেচ্ছাচারী রাজা। জনগণের কোন অধিকার ছিল না, সুলতানের আদেশ পালনই ছিল তাদের কাজ।

অবশ্য সুলতানের ক্ষমতা অবাধ ও সর্বময় হওয়া সত্ত্বেও কার্যত কতগুলি নিয়ম তাঁকে মেনে চলতে হোতো। প্রথমত, সব সুলতানই রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য-বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিলেন। আর বাইরে লড়াই করতে যেতে হলে অভ্যন্তরীণ শান্তি দরকার। অভ্যন্তরীণ শান্তি রাখতে হলে শাসনব্যবস্থা ঠিকমতো রাখতে হবে। আর তার জন্য সুলতানকে সভা সরকারের কতগুলি প্রাথমিক নীতি মেনে চলতে হোতো, যার একটা ছিল রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় বিচারের একটা মান রক্ষা করা। রাজস্ব ও অন্যান্য কর ঠিকমতো আদায় করতে গেলেও কৃষক ও শ্রমিকদের এমন কি কখনো কখনো শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে হলেও নিরাপত্তা দিতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তাদের সুপ্রাচীন অনুভূতির প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হয়। অতএব বাস্তব ও শাসনতান্ত্রিক কারণে সুলতানকে একটি নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে হোতো।

সুলতানী শাসনে ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই অতএব ব্যাহত হোতো। সুলতানী শাসনে ইসলামী আইনের বদলে সুলতানের ইচ্ছাই ছিল আইন।

উলেমা বা মুসলিম ধর্মগুরু সম্প্রদায় সবসময়েই সুলতানের স্বেচ্ছাচারী শাসনের ধর্মীয় বা নৈতিক সমর্থন স্থাপনের চেষ্টা করতেন। উলেমাদের নৈতিক সমর্থনে দিল্লি সুলতানদের স্বেচ্ছাচারের ভিত্তি দৃঢ় হয়ে ওঠে, ক্রমশ ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রকে শাসন করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের অনুগত সেবক হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র ও সুলতানের এই ঐশ্বরিক চরিত্র সাধারণভাবে মুসলমান প্রজারা মেনে নেয়। হিন্দুরাও, কারণ শান্তি ও শৃঙ্খলার একমাত্র নিশ্চয়তা ছিল রাষ্ট্র। মুসলমান শাসনে বাস করাকে হিন্দুরা তাদের কর্মফল বলে মনে করতো। এর একমাত্র বিকল্প তাদের কাছে ছিল জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া, যা তারা পরম সন্দেহের ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতো।

মুসলমানদের মধ্যে একদল আবার কোরাণ ও মহম্মদের নির্দেশ ছাড়া অন্য কোন নিয়মে শাসিত হতে রাজি ছিল না। উলেমাদের মতো রাষ্ট্র ও সুলতানের সঙ্গে কোনরকম আপোষে তাদের অনীহা ছিল। কঠোর বাস্তবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মুসলমান রাষ্ট্র অবশ্য কোনরকম বিরোধিতা সহ্য করত না। ফলে যে সব মুসলমান সুলতানী শাসনকে ইসলামের পরিপন্থী মনে করতো, তারাও কোন রকম বিরোধিতা করত না, বরং তারা জাগতিক ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান। তাঁর প্রাসাদ, হারেম, ক্রীতদাস, সভাকবি, জ্যোতিষী ইত্যাদি নিয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক, সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কাছেও দুরধিগম্য। রাজসভার সমস্ত পরিবেশই ছিল কৃত্রিম। সুলতানের নিচে অভিজাত ও অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণী। বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের নিয়ে গঠিত ছিল নিম্নতম শ্রেণী—সাধারণ জনগণ। তাদের ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।

সুলতান, রাজপরিবার, শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত লোকজন এবং এমন কি সুলতানের ভৃত্যেরাও ছিল শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে ছিল যে বিশাল জনগণ, শাসনব্যবস্থায় কোন অংশ ছিল না তাদের, কোনরকম রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। তাদের প্রায় কোন অধিকারই ছিল না, আর প্রধান কর্তব্য ছিল রাষ্ট্রকে কর দেওয়া। গ্রামের প্রধান এবং সুলতানের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের দায়িত্ব ছিল কর আদায় করা। প্রচণ্ড অত্যাচার করত তারা, আর নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করে খুব ধনী হয়ে

উঠত। এমতাবস্থায় সুলতানী শাসনের পেছনে জনসমর্থন ছিল একথা বলা কঠিন।

মুসলিম জনগণের বেশির ভাগই ছিল হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তারা জাতিভেদ প্রথা লাঞ্ছিত পুরোনো পারিপার্শ্বিক ছেড়ে যেতো না। ফলে ভারতীয় মুসলমান ধর্মে ক্রমশ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন উপাদান প্রবেশ করতে থাকে।

হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল জাতিভেদ প্রথা। কিন্তু মুসলমান ধর্ম প্রবর্তনের ফলে যেহেতু নিম্নশ্রেণীর সমস্ত লোকের জন্য ইসলামের দরজা খোলা ছিল, ফলে জাতিভেদ প্রথার জটিলতা এবং উচ্চ বর্ণের প্রাধান্য ক্রমশ কমে আসছিল। নিম্নশ্রেণীর যে সব লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নি তাদের মধ্যেও ধর্মের জটিলতা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভক্তিনির্ভর জনপ্রিয় উদার ধর্মের এক আন্দোলন শুরু হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকের পুরোনো সামাজিক বাধাগুলি যেখানে কমে আসছিল, সেখানে নতুন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল ব্রাহ্মণেরা, যেহেতু কোন বৃত্তিমূলক কাজের যোগ্যতাই তাদের ছিল না। তবে, সব কিছু সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় জীবনের মূল অবস্থাগুলির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। বরং ইসলামই শ্রেণী-বিভাগের কাছে আত্মসমর্পণ করে কোরাণের বাণী বিস্মৃত হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থায় গ্রামগুলিই ছিল প্রধান। প্রতিটি গ্রাম উৎপাদন করত স্থানীয় ব্যবহারের জন্য। কৃষিই ছিল উৎপাদনের প্রধান উপায়, অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। সামান্য সংখ্যক লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, আর মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তারই ফলে প্রধানত গ্রামাভিত্তিক অর্থনীতিতে কিছুটা নাগরিক জীবনও গড়ে উঠেছিল, যদিও সামগ্রিক অর্থনীতিতে তার প্রভাব ছিল খুবই কম।

জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের। উৎপাদনের উপায়ের কোনরকম উন্নতি, বা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন রাষ্ট্রের নীতিবহির্ভূত ছিল। বরং জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের নিচু মান রক্ষা করাতেই রাষ্ট্র ছিল আগ্রহী। তবে জমি ও তার সম্ভাব্য সম্পদ সীমাহীন হওয়াতে শাসনতান্ত্রিক কঠোরতা বা তার ওপর শাসকশ্রেণীর প্রাধান্য খুব বেশি থাকতে পারতো না।

গ্রামে জীবনধারণের মান ছিল খুবই নিচু। কৃষকেরা সব সময়ই অর্ধাহারে থাকতো।

শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্রশিল্প, ধাতুর কাজ, পাথরের কাজ, চিনি, নীল ও কাগজ। উৎপাদিত জিনিসের উৎপাদন ও বন্টন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে ছিল।

শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা কৃষি শ্রমিকদের চেয়ে উন্নত ছিল না। সুবিধা অসুবিধাগুলিও ছিল একই রকম। শিল্প সংঘগুলি (industrial guilds) বিশেষ জাতি ও পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উৎপাদিত বস্তু গুণগত উৎকর্ষে অসাধারণ হলেও পরিমাণে ছিল কম। একমাত্র রাজকীয় কারখানা ছাড়া অন্যত্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ শিল্প বিষয়ে দক্ষতা বিশেষ বিশেষ পরিবার বা শিল্প সংঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে যে অসংযোগের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ শিল্প চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে।

শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যে বহুদিনের ঐতিহ্য। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যে নীতিবোধ ছিল খুবই নিম্নমানের, যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনই ছিল ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য। তবে উপকূলবর্তী শহরগুলি ছিল ব্যতিক্রম। সেখানকার ভারতীয় বণিকদের সততা সম্বন্ধে বিদেশীরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

জীবনধারণের মান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে ছিল বিভিন্ন রকম। সুলতানের ব্যয়বাহুল্য ছিল তুলনাবিহীন। দেশের সমস্ত সম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, রাজস্ব ছিল তাঁর আয়ত্তে, আর অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি যে কোন লোকের সম্পত্তি রাজেয়াপ্ত করতে বা অন্য রাজ্য আক্রমণ করতে পারতেন। সুলতানের সমস্ত কর্মচারী এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সুলতানের অনুকরণে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতেন। আর উচ্চশ্রেণীদের সঙ্গে কৃষকদের জীবনধারণের মানের পার্থক্য ছিল আকাশচুম্বী।

সাধারণভাবে হিন্দু সমাজের যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই মেয়েদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনরকম সুযোগ ছিল না। পর্দাপ্রথা চালু ছিল সাধারণত উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে, কারণ তাদের সাংসারিক কাজকর্ম প্রায় করতে

হোতো না। কৃষক পরিবারের মহিলাদের কোনরকম ওড়না বা ঘোমটা ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না।

মানুষের, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের, গার্হস্থ্যজীবনের প্রধান ঘটনা ছিল জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। এই তিনটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু রীতিনীতি তারা উৎসবের মতো পালন করত। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সুলতানী রাজ্যে সতীদাহ করতে হলে একটি বিশেষ অনুমতিপত্র নিতে হোতো। হয়তো অনিচ্ছুক সতীদাহ বন্ধ করার জন্যই এই প্রথা ছিল। কিন্তু সাধারণত প্রথাগতভাবে অনুমতিপত্র প্রায় সবক্ষেত্রেই দিয়ে দেওয়া হোতো।

আমোদ-প্রমোদ, সামাজিক উৎসব, খেলাধুলা প্রভৃতিও উচ্চশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন। হিন্দুদের মধ্যে বসন্ত পঞ্চমী, হোলি, দেওয়ালী প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবগুলি সমাজিক উৎসবেরও রূপ নিয়েছিল। মুসলমান ধর্মে অবশ্য সাধারণভাবে উৎসবের অবকাশ ছিল না। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশ ও ঐতিহ্যের প্রভাবে ঈদ প্রভৃতি মুসলমান ধর্মীয় উৎসবগুলিও সামাজিক উৎসবের রূপ নেয়, মুসলমান দিনপঞ্জীতে নওরোজ বা বসন্ত উৎসব, শবেবরাত প্রভৃতি কিছু নতুন উৎসবেরও সংযোগ ঘটে।

আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রায় ছিলই না। সমসাময়িক ভারতীয় চরিত্রের প্রধান দুটি গুণ ছিল বিদগ্ধতা ও দানশীলতা। আর প্রধান ত্রুটিকে ব্যক্ত করা যায় মাত্র দুটি কথায়—নারী ও সুরা।

'Life and conditions of the People of Hindustan'-এ যেমন ভাবে জনগণের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে, এভাবে মধ্যযুগের জনজীবন আর বোধ হয় কেউ আলোচনা করেন নি। শুধু আলোচনা নয়, সুলতান, অভিজাত আমীর-ওমরাহ, হিন্দু ও মুসলমান জাগণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার করেছেন আশরফ। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে আমরা সুলতান বাদশাদের ইতিহাস বুঝি! সুলতানী আমলের ইতিহাস সব সময়েই সুলতানের রাজত্ব, রাজ্যবিস্তার, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন সংস্কারের ইতিহাস হয়ে থেকেছে, তা দেশের মানুষের ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে নি। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণ মানুষের ইতিহাস

রচনাই আশরফের সর্বাধিক কৃতিত্ব। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষের যে মার্কসীয় ইতিহাস রচনার কাজে আশরফ ব্যাপৃত ছিলেন, ত'ার আকস্মিক অকালমৃত্যুতে সেই কাজে ছেদ পড়ে। ভবিষ্যতে যদি কোন ঐতিহাসিক এই গবেষণা সম্পূর্ণ করেন, তবে তাই হবে ভারতবর্ষের সত্যিকার ইতিহাস।

এই প্রবন্ধ লিখতে যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. Dr. K. M. Ashraf—Life and Conditions of the People of Hindustan.

2. Farooqui & Gupta—Dr. K. M. Ashraf, Communist Party Publication.

চিলির শিক্ষা

বোরিস পনোমারিয়ভ

চিলির জনগণের আজকের দুর্ভাগ্য হল ফ্যাসিস্ত বিপদের বাস্তবতার একটা সাক্ষী। বহু মানুষ সচেতন যে চিলিতে নিপীড়ণের ব্যবস্থাসমূহ—গুলি করে খুন, বন্দিশালা, বইপোড়ানো—সমস্ত হল হিটলারী ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি। চিলির ঘটনাবলী, ওদেশের গণতন্ত্রী ও বিপ্লবীদের রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট কর্মী ও নেতাদের এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নির্যাতন থেকে বাঁচাবার জন্য এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। স্বভাবতই আজকের পরিস্থিতিতে, বিপ্লবী অগ্রগতির চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে-চিলির শিক্ষা বিশ্লেষণ করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

সোভিয়েত বিপ্লবও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের তীব্র প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। ঐ প্রতিরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পরাজিত হয়েছিল একটা দৃঢ়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ব্লক গঠন মেনে নেবার এক নীতিনিষ্ঠ ও নমনীয় লেনিনীয় পলিসি দ্বারা, প্রয়োজন মতো আপস ও অস্থায়ীভাবে পলিসি বদল করার কৌশলের দ্বারা—নয়া অর্থনৈতিক পলিসি যার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত। সে কারণেই বিপ্লবের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলিতে, তার মোড়গুলি ঘোরার সময়, শ্রমিকশ্রেণী জনগণের অধিকাংশের পর্যাপ্ত সমর্থন পেয়েছে, আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ও তাদের ভৃত্যরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিপর্যয় থেকেও কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় কমিউনিস্টরা তা জানে। প্যারি কমিউন থেকে এবং রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লব থেকে অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের গর্ভপাত থেকে, অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষাগ্রহণই ১৯১৭ সালের অক্টোবরের ঐতিহাসিক বিজয়কে স্থিরীকৃত করার রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণকে সম্ভব করেছিল। আজকের পরিস্থিতির মধ্যে চিলির ঘটনাবলী, যা একটা দীর্ঘ সময় ধরে "শান্তিপূর্ণ" বিপ্লবী বিকাশের সর্বপ্রথম উদাহরণ উপস্থাপন করেছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই মূল্যবান।

যদি আমরা ঐ সব ঘটনা-সঞ্জাত সমস্যাগুলির একটা সংক্ষিপ্তসার—অবশ্য খুবই সাধারণ অর্থে—করার চেষ্টা করি, তবে নিম্নোক্তভাবে বলা যায়,

প্রথমেই, এই বিপর্যয় যেন চিলির বিপ্লবীদের—কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট-দের—নিঃস্বার্থ কাজকর্মের অভিজ্ঞতার যে ইতিবাচক দিক সে সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা না করে। সমগ্র পৃথিবীকে দেখানো হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির দ্বারা পরিচালিত একটা বাম ব্লক সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, তাছাড়া আরও দেখা গেল, কৃষকদের ও অন্যান্য মধ্যবর্গীয় এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে বিপ্লবের দিকে আনা যায়।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বিপ্লবী ধারার শান্তিপূর্ণ বিকাশ যখন মাত্র কয়েকটি মাস ধরে চলেছিল, চিলিতে তিন বছর ধরে তা চলে, যার ফলে—এটার উল্লেখ আবশ্যিক—শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা গিয়েছিল। এ ধরনের বিকাশ গতিরুদ্ধ হল ঠিক তখনই যখন আরও বেশি সাফল্যের আশা নিয়ে বিপ্লবের অনুকূলে জনগণের এক নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা হল। জোরের সঙ্গেই একথা বলতে হবে যে বিপ্লব নয়, প্রতি-বিপ্লবই খোলাখুলি ও নগ্নভাবে সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে পদদলিত করেছে। বিপ্লবের ইতিহাসে বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে এমন একটা বিষয়গত বিধি যা পুনরায় অনুমোদিত হল। যখনই বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থে প্রকৃত বিপদ ঘনিয়ে ওঠে তখন এই বিপ্লবী ধারাকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে স্বপক্ষের যাবতীয় শক্তিকে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে যোগাযোগকে, তারা অবলম্বন করে এবং বিপ্লব দমনের উদ্দেশ্যে একেবারে চরম, সন্ত্রাসবাদী, একনায়কত্বের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে।

ফলে, চিলির ঘটনাবলী আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বিপ্লবের লাভ-গুলি সুরক্ষিত করার গুরুত্ব, সংগ্রামের রূপ, শান্তিপূর্ণ ও অশান্তিপূর্ণ, দ্রুত বদল করার প্রস্তুতির এবং বিপ্লবী হিংসার দ্বারা প্রতিবিপ্লবী হিংসাকে প্রতিহত করতে পারার সামর্থ্যের অসীম গুরুত্ব। চিলির ঘটনাবলী শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র সফল বিপ্লবের পথের বিষয়টাকে একটা সঠিক লেনিনীয় অবস্থান থেকে বোঝার প্রয়োজনীয়তাকেও পুনরায় মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক ভার-সাম্যের এমন এক অবস্থা যার মধ্যে বুর্জোয়ারা গৃহযুদ্ধ বাধাতে সাহস পায় না,

মাত্র এটাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব-বিকাশের সুনিশ্চিতি দেয় না, এজন্য আরও দরকার, সংগ্রামের দুঃসাহসিকতম উপায় অবলম্বন করার জন্য বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর এবং জনতার অবিরাম প্রস্তুতি—শুধু কথায় নয়, কাজেও—যদি অবশ্য প্রয়োজন হয়।

অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে, চমৎকারভাবে বিপ্লবের অগ্রগতি হতে পারে যদি তার সামাজিক ভিতকে সংহত ও নতুন নতুন শক্তি দ্বারা বলীয়ান করা হয়। এটা মুখ্যত অর্থনৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে। চূড়ান্ত রাজনৈতিক সাফল্যগুলির পর বিপ্লবের বিজয়ের জন্য অর্থনীতিই প্রধান রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। যুগ সংক্রমণকালে একটা সঠিক অর্থনৈতিক নীতি রচনা করার এবং তার যথাযথ প্রয়োগের সমস্যা, তার আঙ্গিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের গতিবেগ স্থিরীকরণ প্রভৃতি বিষয় এজন্যই জটিল, যেহেতু বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক অবরোধ, কৃত্রিম উপায়ে চাঙ্গা করা অর্থনৈতিক অসুবিধা এবং শিল্পে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতিকে মুখ্য অস্ত্র করে নেয়।

মধ্যবিত্ত ও মধ্যবর্গীদের শ্রমিকশ্রেণীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করার ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধেই ওদের লাগানোর আশা নিয়ে প্রতিক্রিয়া সোজাসুজি এদের দোদুল্যমানতা, মনোদ্বন্দ্ব ও দ্বিমুখিতার ওপর ভর করে। তাছাড়া "বামপন্থী" হটকারী গ্রুপগুলি যারা বিষয়ীগতভাবে প্ররোচনাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে, শ্রেণীশত্রুরা তাদেরও ব্যবহার করে, বিশেষ করে যখন বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটতে থাকে শান্তিপূর্ণভাবে। ঐসব গ্রুপের ভ্রান্ত লাইন ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত সংগ্রাম করার ও যুগপৎ ওদের প্রভাবিতদের মধ্যে ধৈর্য সহকারে কাজ করে তাদের বিপ্লবী উৎসাহকে সঠিক পথে পরিচালনা করার একটা অনিবার্য মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হয় কমিউনিস্টরা।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে গণ প্রচারের মাধ্যমগুলির ভূমিকা আজ এমনভাবে বেড়েছে যা অতীতে কোনোদিন দেখা যায় নি। চিলির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে সাফল্যের জন্য সংবাদ প্রদান ও প্রচার করার এই মাধ্যমগুলি থেকে শ্রেণীশত্রুদের বঞ্চিত করা একটা আবশ্যিক কর্তব্য।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেনাবাহিনী ও বিবিধ ধরনের পুলিস সংস্থার উপর আরোপ করে এবং জনগণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে

ও তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী ভাবধারা প্রবেশ করিয়ে এদের রক্ষণশীলতার প্রাকারে পরিণত করার চেষ্টা করে। সকল ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, সমাজের উপর ওদের ক্ষমতা যখনই বিপন্ন হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়া তখন নির্বিবাদে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে। প্রনান্সিওমিয়েন্তোস (ঘোষণা বাণী)-এর উত্তরাধিকারী লাতিন আমেরিকা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য নয়, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও একথা সত্য। সে কারণেই, বিপ্লব যখন শান্তিপূর্ণ পথে চলতে থাকে তখনও পুরানো রাজতন্ত্রকে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি, যেমন সেনাবাহিনী থেকে, বঞ্চিত করা এবং একটা নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র-বহির্ভূত কিংবা রাজনীতি-বহির্ভূত সেনাবাহিনী বলে কিছু থাকতে পারে না।

চিলির ঘটনাগুলি পুনরায় খুবই নাটকীয়ভাবে বিপ্লব সম্পর্কিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সামনে তুলে ধরেছে। এ ব্যাপারে মার্কস-এর একটা ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের অভিজ্ঞতাগুলি এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, আধুনিক বিপ্লবগুলিতে "উপস্থিত মতো কাজ" ও স্বতঃস্ফূর্ততার ভূমিকা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকবে, এবং জনগণ ও পার্টিগুলির অধিকতর সামাজিক চেতনার ও সংগঠিত কর্মের বেশি বেশি দরকার হবে। আমাদের কালে এ কথার মূল্য সরাসরি। চিলির ঘটনাবলী পুনরায় জোরের সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের লাভকে প্রয়োজনীয় যে কোনো উপায়ে বাঁচাবার ও রক্ষা করার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

আমার রোজ্‌নামচা থেকে ঃ ম্যাকসিম গোর্কি

সুশীল জানা অনুদিত

ভাগ্যের উৎস সন্ধানে

স্টেপান প্রোখোরফ ছিল সেস্‌ত্রোরিংস্ক স্নানাগারের একজন কর্মী—বছর ষাটেকের মতো বয়স হবে, দিব্যি চমৎকার শক্তিমান বৃদ্ধ। পুতুলের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো—তার চারদিকে সংসারের সব কিছু লক্ষ্য করতে করতে সে চোখে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ঘনিয়ে উঠত। যদিও সে দৃষ্টিতে একটু বেশী উজ্জ্বলতা ও কাঠিন্য দেখা যেত—তবু তা ছিল শান্ত, এমন কি সহৃদয় হাসিতে ভরা। সকলের মধ্যেই এমন একটা জিনিস যেন সে দেখছে যা সহানুভূতির যোগ্য।

এমন ভাবে সে মানবতার সেবা করছে যেন সে হলো সমস্ত মানুষের মধ্যে বিজ্ঞতম। সতর্ক পদক্ষেপে সে ঘোরাফেরা করে এবং কথা বলে গলা নামিয়ে—যেন তার চারদিকের লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে এবং তার মতলব নেই তাদের জাগিয়ে দেওয়ার। সে ছিল অবিচল এবং অশ্রান্ত কর্মী এবং অন্যের কাজের ভার নিতেও সদাপ্রস্তুত। স্নানাগারের কর্মচারীদের মধ্যে কেউ যদি তার কোনো কাজ করে দিতে বলতো, অল্পকথার মানুষ প্রোখোরফ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। "বেশ তো ভায়া", সে বলত, "বেশ তো। আমি করে দেব, ও নিয়ে তুমি ভাবনা ক'রো না।"

কতগুলো অলস মানুষকে যেন করুণা বিতরণ করছে এই ভাবে সে অন্যের কাজ করে দিত, কোনো বৈরীভাব বা দম্ভ ছিল না তার মধ্যে।

লোকজনের সঙ্গে সে মেলামেশা করত না—এই তার নিয়ম, থাকত একা একা। কি কাজের সময় আর কি অবকাশে, আমি তাকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় দেখিনি বললেই চলে। তার সম্পর্কে অন্যদের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে আমার বিশ্বাস—তারা ওকে খুব চতুর ভাবত না। আমি যখন তাদের জিজ্ঞেস করতুম—প্রোখোরফ লোক

কেমন, তারা জবাব দিত, "ওঃ, তার সম্পর্কে অসামান্যতা কিছু নেই।..." কিন্তু একবার হোটেলের এক পরিচারক একটু ভেবে, পরে বলেছিল, "একটু গর্বিত, কড়া ধাতের বুড়ো।"

এক সন্ধ্যায়, আমার ঘরে প্রোখোরফকে চা খাওয়ার নিমন্ত্রনে আসতে বললুম। একটা শয্যাগারের মত বড় ছিল আমার ঘরটা, ঘরকে গরম রাখার বাষ্পীয় ব্যবস্থা আছে, পার্কের দিকে বড় বড় দুটো ভিনিসিয় কেতার জানালা। (প্রত্যেকদিন রাত নটার সময় বাষ্পের পাইপটা এমনভাবে শাঁ শাঁ আর ঘড়্‌ঘড়্‌ করতো—যেন কে একঘেয়ে শব্দে ফিসফিসিয়ে বলতো: "তোমার কিছু রবার আছে?"—"মাছ কি ভাল খানা?")

বৃদ্ধ এল, দিব্যি ছিমছাম ভাবে সাজগোছ, গোলাপী রঙের নতুন সুতীর সার্ট গায়, পাঁশুটে রঙের প্যান্ট এবং জমাট পশমের নতুন জুতো। লালচে রঙের চওড়া দাড়ি সযত্নে বুরুশ করা এবং মাথার পাকা চুলে কোনো মলম মাখিয়ে চিকন্ করা—যা থেকে কড়া ভুরভুরে একটা গন্ধ উঠছে। গম্ভীর-ভাবে চায়ে সে চুমুক দিলে এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"আমার যে দয়ামায়া আছে", সে বললে, "এ তো তুমি ভালভাবে লক্ষ্য করেই দেখেছ এবং সঠিক বিচার করেছ। তবে অন্য সকলের মতই, আমি জন্মেছি এবং জীবনের অর্ধেক ভাগ বেঁচেছি অন্য সম্পর্কে কোনো পরোয়া না করেই—এ কথা অবশ্য আমার স্বীকার করে নেওয়া ভাল। শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবার পরই আমি দয়ালু হতে পেরেছি।

"ব্যাপারটা ঘটেছিল একটানা সাফল্যের একটা জীবন কাটাবার পর। জন্মের দিন থেকেই ভাগ্য আমাকে অনুগ্রহ করেছে। আমার বাবা ছিলেন মজেনেস্ক এর এক তালাচাবি তৈরীর কর্মকার। তিনি বলতেন—'স্টেপান্‌কা জন্মেছিল সৌভাগ্য নিয়ে।' কারণ আমার জন্মের বছরেই তাঁর ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত এতটাই হয়েছিল যে, তিনি নিজস্ব একটা কারখানাই খুলতে পেরেছিলেন।

"খেলাধুলোতেও আমি ছিলাম সৌভাগ্যবান, আর লেখাপড়া ছিল আমার কাছে ছেলেখেলার মত। আমার কখনো কোনো অসুখ বা কোনো ধরনের অসুবিধে হয় নি। যখন আমি স্কুলের লেখাপড়া শেষ করলুম, তার পরেই এক সৎ ও দয়াবান লোকের জমিদারী সেরেস্তায় একটা কাজ পেয়ে

গেলাম। আমার কর্তা আমাকে ভালবাসতেন এবং তাঁর স্ত্রী বলতেন, 'তোমার ক্ষমতা আছে খুব স্টেপান ; সে সম্পর্কে সতর্ক থেকো।' তা সত্যি : আমার এমন সব অসাধারণ গুণ ছিল যে আমি নিজেই অবাক হতাম এই ভেবে, তা কোথা থেকে এল! এমন কি আমি ঘোড়ার চিকিৎসা পর্যন্ত সুরু করে দিলাম—যদিও রোগের কারণ সম্বন্ধে কোনো ধারনাই আমার ছিল না। শুধু দয়া দেখিয়ে এবং বেত লাঠি ব্যবহার না করেই কুকুরকে তার পেছনে দু'পায়ে হাঁটাতে পারতুম।

"মেয়েদের সম্পর্কে—ভাগ্যবান ছিলুম সেখানেও ; যে মেয়ের দিকে একবার তাকাতুম আমার কাছে সে আসতই, বিফল হত না।

"আমি প্রধান গোমস্তা হয়েছিলাম ছাব্বিশ বছর বয়সে এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না যে, সহজেই আমি সেরেস্তার ম্যানেজার হতে পারবো। মিস্টার মার্কেভিচ, তোমার মতই একজন গ্রন্থকার ছিলেন উল্লসিত হয়ে উঠতেন প্রায়ই। তিনি তোর গলায় বলতেন, 'পোখোরফ সত্যিকারের একজন রাশিয়ান, দ্বিতীয় একজন পারসোভ।' পারসোভ কে ছিলেন আমি জানি না, তবে মিস্টার পার্কেভিচ লোকজন সম্পর্কে সাধারণত খুব কড়া সমালোচক ছিলেন। এবং তাঁর প্রশংসা তামাসা ছিল না। নিজের জন্যে আমি খুবই গর্বিত ছিলাম—এবং সবই আমার দিব্যি চলে যাচ্ছিল। বিয়ে করবো বলে অল্প কিছু টাকা আমি আলাদা ক'রে রেখেছিলাম—ক'রণ একটি সুন্দর ও যোগ্য তরুণী পাত্রী আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। এই সময়ে হঠাৎ, প্রায় বুদ্ধির অগোচরে, আমার বোধ হলো—যেন সাংঘাতিক একটা বিপদ আমাকে আক্রমণ করতে আসছে। অত্যন্ত অদ্ভুত একটা জিজ্ঞাসা আমাকে আগুনের মত পোড়াতে লাগল : সব বিষয়েই আমি সৌভাগ্যবান হবো কেন? কেন আমি এই ভাবে আনুকূল্য পেয়ে যাব? এই ধরণের প্রশ্ন আমার মাথায় অনবরত জ্বলতে লাগল এবং আমাকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখল।

"কখনো কখনো সারাদিনের কাজের পরে লাঙলটানা ঘোড়ার মতো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তাম। শুয়ে পড়তাম এবং বড় বড় চোখ করে ভাবতে থাকতুম। এত সৌভাগ্য আমার কেন? অবশ্যই আমার ক্ষমতা আছে ; ধর্মভীরু মানুষ আমি, অনুদ্ধত ও সংযত, বোকা নই। অথচ, আমার চারদিকে

এমন সব লোকজনকে দেখি যার সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে ভালো কিন্তু ভাগ্য তাদের জন্যে প্রসন্ন হাসি হাসে না। এ তো সম্পূর্ণ সত্যি।

"এইভাবে আমি ভাবতুম আর ভাবতুম—ঈশ্বর কেমন করে এটা হতে দিচ্ছেন। এই যে আমি এখানে আছি, এক ভাঁড় মধুর মধ্যে মাছির মতো দিব্যি সুখে আছি এবং এমন লোক কে আছে যে আমার ক্ষতি করতে পারে? ধারণাটা আমার মনে ক্রমাগত ঘা দিতে লাগল। আমার বোধ হতো—আমার জীবনের এই সাফল্যের পেছনে কোনো একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে, কোন একটা যাদু কাজ করছে! কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে? বার বার আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করতুম—কি তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে, কোন দিকে আমাকে তিনি নিয়ে চলেছেন?

"কিন্তু ঈশ্বর নীরব···উত্তরে তিনি একটা কথাও বললেন না।"

"তারপর আমি মনস্থির করে ফেললাম। ভাবলাম—যদি কিছু বেইমানী আমি করি—তাহলে কি ঘটতে পারে? সেই মতো আমি চারশ' কুড়ি রুবল্ দেরাজ থেকে সরিয়ে নিলাম, এটা জেনেই নিলাম যে তিনশ' রুবলের বেশী চুরি করলে কঠিন দণ্ড পাওনা। যাই হোক, টাকাটা সরালাম। বলা বাহুল্য, এই খোয়া সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল। ম্যানেজার ফিলিপ কার্লোভিচ সহৃদয় মানুষ, টাকার ব্যাপার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। কারণ টাকাটা আমি এমন ভাবে চুরি করেছিলাম যে আমাকে ছাড়া আর কারুকে সন্দেহ হতে পারে না। দেখলাম ফিলিপ কার্লোভিচ হাঙ্গামে পড়েছেন এবং ঘাবড়ে গেছেন। যাক—মনে মনে বললাম, ভালো লোকটাকে যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কি? তাই আমি বললাম—টাকাটা আমি চুরি করেছি। তিনি আমাকে বিশ্বাস করলেন না; বললেন—আমি ঠাট্টা করছি শেষপর্যন্ত যাই হোক, বিশ্বাস না করে তাঁর আর পথ ছিল না। সেইভাবে তিনি আমার কর্তার স্ত্রীকে আমার জবানী জানিয়ে দিলেন। শুনে তিনি তো অবাক এবং শঙ্কিত। 'তোমার কি ব্যাপার স্টেপান?' তিনি শুধোলেন। জবাবে বললাম, 'আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারেন।' তিনি লজ্জিত হলেন এবং চটে গেলেন, ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর জামার প্রান্ত টানতে লাগলেন। বললেন, 'তোমাকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু তোমার ব্যবহার যে অত্যন্ত নির্লজ্জ—এ তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে।'

"আমি স্বীকার করলাম এবং ওদের বাড়ি ছাড়লাম, চলে গেলাম মস্কোয়—আমার নামোল্লেখ না করে টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।"

"এ কাজ তুমি কেন করেছিলে?" বৃদ্ধকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। "দুর্ভোগ ভোগ করতে চেয়েছিলে?"

তার মোটা মোটা ভুরু দুটো তুললো সে সবিস্ময়ে—এবং হাসলো দাড়ির অন্তরালে। মাথার কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে হাসি তার মিলিয়ে গেল।

"মানে—না, নিশ্চয়ই না। কেন আমি দুর্ভোগ চাইব? আমি শান্তির জীবন পছন্দ করি। না, আমাকে পেয়ে বসেছিল সেই কৌতূহল। আমার সৌভাগ্যের রহস্য সন্ধানের জন্য আমি হাপিত্যেশ করেছিলুম। আমার সৌভাগ্য কতটা পাকাপোক্ত হতে পারে তা যাচাই করার একটা আকাঙ্ক্ষা—এবং হুঁশিয়ার হওয়া, বোধ করি এইরকম একটা চেতনা আমাকে তাগিদ দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, বয়স আমার অল্প, যেন খেলছিলুম—নিজের সঙ্গেই এ এক খেলা। যদিও, বাস্তবিক পক্ষে আমি যা করে ফেলেছিলাম তা আমার কাছে খেলা ছিল না—অর্থাৎ শুধু খেলা মাত্র নয়। আমার জীবন এমনি অস্বাভাবিক ছিল। কোলের পোষা ছোট্ট কুকুরটির মতো আমি বেঁচে ছিলাম প্রেমে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে। আমার চারপাশের লোকজন ভ্রূকুটি করছে, অভিযোগ করছে—আর আমি যেন ঈশ্বরের অভিশাপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একটা শান্ত জীবন কাটিয়ে যাব। প্রত্যেকেরই লড়াই করবার মতো ঝঞ্ঝাট আছে, গোলমাল আছে, আর আমার তেমন কিছুই ছিল না। স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত ওই জিনিসগুলো পাওয়ার উপযুক্ত যেন আমি ছিলাম না। আমার মনে হয়—ব্যাপারটা এইরকম একটা কিছু ছিল।...

"মস্কোর এক হোটেলে আমার ঘরে শুয়েছিলাম আর নিজেকে বলছিলাম—একটা রুবলের জন্যে অন্য যে কোনো লোক হয়তো পুলিসের হাতে পড়ত। আর আমি চারশ' রুবল চুরির পরও আমার কিছু হলো না! কপাল খারাপের এই একটা নজির শেষ পর্যন্ত! আমার হাসি পেল।

"'না', মনে মনে ভাবলাম, 'একটু তুমি সবুর করো স্টেপান।' আমি হোটেলের লোকজনদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওটা ছিল একটা নোংরা গর্ত এবং তার বেশীর ভাগ লোকই ছিল শানওয়ালা, অভিনেতা এবং হত-

ভাগিনী কিছু স্ত্রীলোক। একটি লোক ভাণ করে দেখাত যে, সে ছিল রাঁধুনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল—সে একটা জাত চোর। আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার চলছে কেমন?' সে বললে, 'এই—এক রকম। ব্যবসায় উঠতি পড়তি আছে তো আমরা যখন আরও অন্তরঙ্গ হলাম—সে কিছুটা প্রাণখোলা হলো। 'আমার মাথায় একটা মতলব আছে,' সে প্রকাশ করলে, 'কিন্তু তার জন্যে কিছু ভাল যন্ত্রপাতি চাই—দামী জিনিস সব এবং কিন্তু আমার কোনো টাকা পয়সা নেই।' 'আহা'—আমি ভাবলাম, 'শেষ পর্যন্ত এই তো পেলাম জিজ্ঞেস করলাম, কারুকে মেরে টেরে ফেলার ব্যাপার কি?' আমার প্রশ্নে মনে হল সে রাগ করলে। 'ঈশ্বর না করুন,' সে বললে 'আমার নিজের মাথাটাকে খুবই আমি মূল্যবান মনে করি।'

"যাই হোক, আমি তাকে যন্ত্রপাতি কেনার টাকা দিলাম—এই শর্তে যে, আমাকে সে তার সঙ্গে নেবে। সে মুখ বাঁকাল এবং আমার কথার ভাবে সংকুচিত হয়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। তার দুঃসাহসিক কাজকে আমি মোটেই পছন্দ করি নি। আমরা একটা বাড়িতে গেলাম এবং ভাণ করলাম—যেন দেখা করতে এসেছি। বাড়িতে কোনো লোকজনের দেখা পেলাম না। বেশ সুন্দর মতো একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল—স্পষ্ট বুঝলাম, মেয়েটি এই লোকটিরই বান্ধবী। সঙ্গে সঙ্গে সে খুব নিপুণভাবে তার হাত-পা বেঁধে ফেললে এবং থালা-বাসনের আলমারি হাতড়াতে সুরু করে দিলে—এই সঙ্গে চললো তার গিস্ দেওয়া। সবটা এত সহজ—তাই না? কোনো হাঙ্গামা ছাড়াই আমরা যেমন এসেছিলাম তেমনি চলে গেলাম। পরে অল্প-দিনের মধ্যেই লোকটি মস্কো থেকে গা ঢাকা দিলে এবং আমার দিন কাটতে লাগল আবার শুধু নিজেকে নিয়ে।

"চুরির ব্যাপারটা তা হলে এই, মনে মনে ভাবলাম। আবার সেই ভাগ্য! সবটা ছিল খুব মজার এবং সেই সঙ্গে খেপিয়ে দেওয়ার মতো।

"যাই বলো—স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি কিনা আমার কাণ্ডকারখানা সবই দেখতে পাচ্ছেন সেই ঈশ্বরের ওপরে এবং নিজের ওপরে অত্যন্ত বিরূপ হয়ে এক রাতে চলে গেলাম থিয়েটার দেখতে। ঝোলা বারান্দার এক আসনে গিয়ে বসেছিলাম—সহসা চোখে পড়ল সেই সুন্দর মেয়েটি, যার হাত-পা আমরা

বেঁধেছিলাম। একটা আসনের পরেই বসেছিল সে, মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিল।

দুই অংকের মাঝামাঝি এক বিরাম সময়ে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। 'আমার মনে হয়—পরস্পরকে আমরা চিনি।' আমি বললাম। বোধ হয় তার কথা বলার ইচ্ছে ছিল না—তবু দু-একটা কথা তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'স্—' সে বললে, 'চুপ করবে?'

'চেঁচাচ্ছ কেন?' আমি বললাম।

'রাজকুমারের জন্যে আমি খুব দুঃখিত,' সে বললে। (মঞ্চে জনৈক রাজকুমারের ওপর তখন খুব অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছিল।) অভিনয় শেষ হওয়ার পর আমার সঙ্গে সে এক পানশালায় গেল এবং পানশালা থেকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার ঘরে এবং প্রেমিক যুগলের মত আমরা একসঙ্গে বাস করতে লাগলাম।

"আমাকে সে জাত চোর বলেই মনে করেছিল এবং প্রায়ই জিজ্ঞেস করত—হাতে কোনো নতুন কাজ আছে কিনা।

'না, কিছু নেই,' আমি জবাব দিতাম।

'ভাল, আমি কয়েকজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।' আলাপ সে করিয়ে দিলে এবং এবং চোর হলেও তাদের খুব ভালো লোক বলে মনে হলো—সব কজনাই। তাদের মধ্যে বিশেষ করে একজন কোস্টিয়া বাদমক্ফ, প্রকৃতির চমৎকার এক সন্তান, পুরাপুরি নিরীহ, উচ্ছল হাসিখুসি মেজাজের মানুষ। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

"একদিন তাকে সব খুলে বললাম। যাই হোক, ওই ধরনের জীবন বাস্তবিক আমি চাইনি এবং কৌতূহল বশেই আমি চোর হয়ে গিয়েছিলাম।

'আমারও তাই,' সে বললে। 'শুধু সাহস দেখাতে গিয়ে এই বৃত্তিতে এসে পড়েছি। পৃথিবীতে এত সব সব সুন্দর জিনিস আছে এবং বেঁচে থাকা একটা পরম লাভ! মাঝে মাঝে রাস্তায় আমি চিৎকার করে বলতে চাই বন্ধুগণ দেখ—আমাকে ধরো, আমি একটা চোর!'

"অদ্ভুত মানুষ ছিল সে। একদিন সে পুরোদমে ছোটা এক [illegible]

দিলে লাফ এবং হাতটি ভাঙলো। পরে তাকে ধরল ক্ষয়রোগ এবং ঘোড়ার দুধ—কুমিস খেয়ে রোগ সারাতে চলে গেল প্রান্তরের দেশে।*

"চোদ্দ মাস ধরে বাকি তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কেটে গেল আমার। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সি'ধ দিলাম, টেনে টেনে চুরি করলাম এবং আমি সব সময়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম—পরের দিনই হয়তো বিস্ময়কর এবং সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু আমাদের সব উৎকট প্রয়াস ঘটে গেল দিব্যি অবলীলায়।

"আমাদের দলনায়ক মিখাইল পেট্রোভিচ বোরোখফ বেশ মগজওয়ালা সম্মানীয় লোকটি একদিন আমাদের সকলকে ডেকে ভড়ো করলে। 'আমাদের কপাল খুলে গেছে', সে বললে, 'যেদিন থেকে স্টেপান আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।' ওই কথাগুলো আমার চৈতন্যোদয় ঘটিয়ে দিলে। আমার পুরানো চিন্তায় ফিরে এলাম—যে উত্তেজনার জীবন কাটাচ্ছিলাম তাতে কিছু দিনের জন্য ওটা বিদায় হয়েছিল বটে। সবিস্ময়ে আমি ভাবলাম: এখন কি করা যায়? আমি কি খুন করবো?

"এই চিন্তা একটা কাঁটার মতো আমার মনের মধ্যে কাজ করতে লাগল। আমি তার থেকে রেহাই পেলাম না; ওটা যেন আমার ভেতরে বিঁধে গেছে এবং আমাকে বিষিয়ে তুলছে। আমি রাত্রে বিছানায় বসে থাকতাম, হাঁটুর দুপাশে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে ভাবতাম 'এ সম্পর্কে কি বলতে চাও ঈশ্বর? কেমন করে জীবন কাটাই এ তুমি পরোয়াও করো না। এই যে আমি, তৈরী হচ্ছি একটা মানুষকে মারবার জন্য—আমারি মত একটা মানুষ। এটা খুব সহজই হবে।'

"কিন্তু ঈশ্বর কোনো উত্তর দিলেন না।"

বৃদ্ধ প্রোখোরফ গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে এবং রুটিতে জ্যাম মাখাতে লাগল।

"তুমি অহংকারী মানুষ।" আমি বললাম।

আবার তার মোটা মোটা লোমশ ভুরু তুলে গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে

---

* Steppes: সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী বিরাট বিরাট প্রান্তরবহুল দেশ।

তাকিয়ে রইল। তার পুতুলের মতো চোখ দুটো মনে হলো শূন্যতায় ভরে গেল, তবু একটা কুৎসিত দীপ্তি যেন তাতে ঝলকে উঠল।

"না কেন আমি অহংকারী হব ?" জাম যাতে না লাগে, সাবধানে তার দাড়ি সামলাতে সামলাতে সে জবাব দিল। "আমার মনে হয়—মানুষের গর্ব করার কিছুই নেই

তার সেই লালশ মুখের ভেতরে সাবধানে ছোট ছোট রুটির টুকরো কয়েকটা ফেলে দিয়ে, মৃদুকণ্ঠে আগের মতো বলে চললো। যার কথা সে বলছে সে যেন অচেনা কোনো একটা মানুষ, যার সম্পর্কে তার কোনো পরোয়া করার নেই।

"হাঁ,..." সে বললে, "ঈশ্বর তো নীরব রইলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক সুযোগ এসে গেল। রাত্রিতে এক গ্রামের বাড়িতে আমরা ঢুকে পড়লাম এবং কাজে লেগে গেলাম, এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে কোথা থেকে একটা ঘুম জড়ানো মিহি গলার শব্দ শুনতে পেলাম। 'কাকু, ওখানে কি তুমি ?' সে চেঁচিয়ে উঠল। আমার বন্ধু বাইরের বারান্দায় লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এবং একটা দরজা দেখতে পেলাম—তার পেছনে কে যেন নড়া চড়া করছে। দরজাটা অল্প একটু খুললাম এবং দেখতে পেলাম—এক কোণায় বছর বারো বয়সের একটা ছেলে বিছানায় শুয়ে আছে এবং মাথা চুলকোচ্ছে—এত লম্বা লম্বা চুল তার। আবার সে জিজ্ঞেস করলে : 'কাকু—ওখানে কি তুমি ?' আমি তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং অনুভব করলাম—আমার হাত-পা কাঁপছে, আমার বুক ধড়ফড় করছে। এই আমার সুযোগ !

"নিজেকে আমি বললাম, 'এবার—স্টেপান, এইবার—কাজ শেষ করো।' কিন্তু সময় মতো নিজেকে দমন করলাম। ভাবলাম, না—সে চেষ্টা আমি করব না, নিশ্চয়ই না। বোধ হয় ঈশ্বর সৌভাগ্যের সমস্ত বছরগুলো ধরে এই পাপের জন্যই আমাকে লোভ দেখিয়ে আসছে। একটা নিরীহ বাচ্চাকে খুন ! আমার পথ যেখানে এসে শেষ হয়েছে—সেই গর্তে আমাকে তুমি টেনে এনেছ ঈশ্বর। না, না, না !

"এই ধারণাটা আমাকে এমন প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলল যে, কখন আমি সেই বাড়িটা থেকে চলে এলাম, এবং কখন আবার বনের ধারে ফিরে এলাম—

জানতেই পারি নি। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা গাছের তলায় বসে আছি এবং আমার বন্ধু আমার পাশে বসে বসে সিগারেট টানছে আর নিজের মনে মৃদুকণ্ঠে দিব্যি গাইছে। ঝির্‌ঝিরে একটু বৃষ্টি পড়তে লাগল মাথার ওপরে, গাছপালায় তীব্র ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ। এবং যেন দেখতে পেলাম চোখের সামনে, অন্ধকারে, সেই ঘুম জড়ানো বাচ্চাটা—একেবারে অসহায়, আমার মুঠোর মধ্যে। কয়েকটা মুহূর্ত আর···এবং ছেলেটা আর থাকতো না। উঃ!···

"ওই চিন্তাটা আমাকে এমন জোরে আঘাত করল যে আমার মনে হলো আমিই যেন সেই অসহায় ছেলেটা। মনে মনে বললাম নিজেকে, এই যে তুমি বসে আছ চুপচাপ, একটা মুহূর্তে কি তুমি করতে পারতে জানোনা এবং তেমনি জানোনা—কি তুমি করতে পার নি। হঠাৎ, ওই রকম সব অদ্ভুত চিন্তা ভিড় করে এল—আসে না ওই রকম?—হঠাৎ আসা সব চিন্তা···তুমি চলবে আমার জন্যে, আমি চলব তোমার জন্যে। পরস্পরের একি অসহায়তা! আর তাছাড়া—আমাদের কাজকর্ম কে নিয়ন্ত্রিত করে?

"সকালে আমি শহরে ফিরলাম এবং সোজা চলে গেলাম জজসাহেব মিঃ স্‌ভিয়াতুখিনের কাছে।

"'দয়া করে আমাকে বন্দী করুন স্যার'—আমি তাঁকে বললাম। 'আমি একটা চোর।' লোকটি ভালো মানুষ বলে জানে সবাই, খুব শান্ত এবং রোগা রোগা, শুধু একটু বোকা বোকা মনে হয় অবশ্য।

"'কেন তুমি ধরা দিচ্ছ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি? বোধ করি ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোল?'

"'আমার কোনো সঙ্গী ছিল না।' আমি বললাম। 'আমি একাই কাজ করতাম।' খুব বোকার মতই আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী বললাম তাঁকে—এই যেমন তোমাকেও এখন বলছি। কী নিষ্ঠুর খেলা ঈশ্বর আমার সঙ্গে খেলেছেন বললাম তাঁকে।"

"কিন্তু ঈশ্বর কেন স্টেপান ইলিচ," আমি বাধা দিয়ে বললাম, "শয়তান নয় কেন?"

প্রশান্ত আস্থার সঙ্গে বৃদ্ধ প্রোখোরফ ব্যাখ্যা করে বললে:

"শয়তান বলে কিছু নেই, শয়তান হলো ধূর্ত মনের আবিষ্কার—নিজেদের নীচতার সাফাই গাইবার জন্যই মানুষই তাকে সৃষ্টি করেছে; কিছুটা ঈশ্বরের

সুবিধের জন্যও বটে—কারণ তাঁকে আর দুর্নামের ভাগী হতে হবে না। শুধু আছেন ঈশ্বর—এবং মানুষ—আর কিছু নেই। শয়তানের সমতুল্য আর যত আছে—যিশুর বিশ্বাসঘাতক জুডা, ভ্রাতৃহন্তা, জার, আইভান দি টেরিবল—এরা সবাই মানুষের আবিষ্কার,—সহস্রের সঞ্চিত পাশবতা ও পাপ যাতে একটা লোকের উপর চাপানো যায় তার জন্যেই সৃষ্টি। বিশ্বাস করো—এটা তাই। হ্যাঁ, আমরা শয়তান পাপীর দল আমাদের পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, এবং পরে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি আমাদের চেয়ে আরও খারাপ কে আছে—অল্প কথায়, শয়তান। আমরা খারাপ—এটা বুঝতে পারি কিন্তু খুব বেশী খারাপ নয়; আমাদের চেয়ে আরও খারাপ লোক আছে।···

"কিন্তু তোমাকে আমি জজসাহেবের কথা বলছিলাম। তাঁর ঘরের দেয়ালে কয়েকটি ছবি ঝুলছিল এবং ঘরটিও বেশ রুচিসম্মত এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে সাজানো। মুখে দয়ার ভাব, যদিও ওতে কিছুই বোঝায় না—কারণ পচা মাল ভালো বিজ্ঞাপনে বিকিয়ে যায়। যাই হোক, আমি যখন তাঁকে আমার কাহিনী বলে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের মাথার ওপরে, ওপরতলায় কেউ বুঝি জোরে জোরে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। শব্দটা কর্কশভাবে কানে এসে লাগছিল। মনে মনে বললাম, 'ওই দেখ, ঈশ্বর, সব কিছু নিয়ে কি তালগোল তুমি পাকিয়েছ!'

"অনেকক্ষণ ধরে আমি কথা বলছিলাম এবং গীর্জায় বুড়িরা যেমন পাদ্রীর কথা শোনে জজসাহেবও তেমনি আমার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু বুঝতে তিনি পারলেন না কিছুই।

"'অবশ্যই তোমাকে গ্রেপ্তার করবো,' তিনি বললেন। 'এবং তোমার বিচার হবে। কিন্তু তুমি আমাকে যা সব বললে সে সব জুরিদের কাছে বললে তুমি যে খালাস পাবে—এমন কথা তোমাকে দিতে পারি না।' তিনি আরও বললেন, 'তোমার সামনে জেল দেখছি না, দেখছি মঠ।'

"মনে আঘাত পেলাম। 'আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।' আমি তাঁকে বললাম, 'এবং আর একটি কথাও আমার বলার ইচ্ছে নেই।'

"ভাল রে ভাল! তার পর তিনি আমাকে থানায় পাঠালেন এবং সেখানে গোয়েন্দারা আমাকে ছেঁকে ধরলে। 'আমরা জানি,' তারা বললে, 'যে সব চুরি তুমি স্বীকার করেছ সেগুলো তোমার একার দ্বারা হয় নি।

আমাদের বল—কারা তোমার সঙ্গী ছিল ? তার পর এস, আমাদের সঙ্গে কাজ কর।'

"বলা বাহুল্য, আমি কোনোটাই করতে রাজি হলাম না—তখন তারা আরম্ভ করলে ধোলাই। আমাকে তারা কিছুই খেতে দিলে না। উপবাসে ফেলে রেখে দিলে। এতে কিছুটা আমি কষ্ট পেয়েছিলাম একথা সত্যি।

"তার পর এল বিচার। আমার ওটা ভাল লাগে নি এবং কোনো কথা বলতে আমি স্বীকার করলাম না। জুরিরা গেল চটে এবং পাঠিয়ে দিলে জেলে। সেখানে এমন সব লোকদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম যারা পোকা বা পশুর চেয়ে কিছুটা উন্নত।

"আবার আমি ভাবতে বসলাম, 'হায় ঈশ্বর, সব কিছু নিয়ে কি বিশ্রী তালগোল তুমি পাকিয়ে তুলছো!' ওই চিন্তা আমার বারে বারে ফিরে ফিরে আসে। একটা মানুষের কি করতে পারা উচিত—এটা যেন আমার ধর্তব্য বলে মনে হলো না—যেহেতু একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই তার জীবনের ভোগ সীমাবদ্ধ।

"ওই জেলখানাটা সম্পর্কে ভাল কিছু বলতে পারি না। ওখান থেকে যেদিন বেরিয়ে এলাম—তাকালাম আমার চারদিকে, এখানে ওখানে, জগতের এদিক ওদিক একটু ঘুরে বেড়ালাম, লোহার এক কারখানায় কাজ করলাম কিছুদিন—কিন্তু ছেড়ে দিলাম চটপট। ওখানে বড্ড গরম। তাছাড়া, লোহা বা অন্য যে কোনো ধাতু আমার ভালো লাগে না—জীবনের সমস্ত উপদ্রব আসে ওদের থেকে - সমস্ত দুঃখ, নোংরামি এবং মালিন্য। ধাতু ছাড়াই মানুষ আরও সরল এবং সহজ ভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

"সব রকমের কাজ আমি করলুম—এমন কি পায়খানা সাফ করার কাজ পর্যন্ত। আমি স্বীকার করি, সবচেয়ে নোংরা সাফের কাজগুলো যেন আমাকে বেশী আকর্ষণ করতো। তারপর এই স্নানাগারের কাজে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করব বলে ঠিক করলাম। আজ সতের বছর ধরে মানুষ জনকে আমি সাফ করছি এবং তাদের বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করছি না। মানুষকে বিপর্যস্ত করে কি লাভ ? ওতে ফয়দা কি—যদি তুমি অবশ্য ঠিকভাবে দেখ। ঈশ্বর ছাড়াই আমি বেঁচে আছি। মানুষের প্রতি আমার করুণা হয়—কারণ তারা বড় পরিত্যক্ত। এবং মোটমাট জীবনটাকে আমার বড় একঘেয়েই মনে হয়।..."

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

কিরিল শিরিনায়া

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর যুগসৃষ্টিকারী ভূমিকার উপাদানসমূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরগুলিকে এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, পুঁজিবাদী সমাজে তার প্রকৃত অবস্থানের কারণে প্রলেতারিয়েতই হল একমাত্র সুস্থির বিপ্লবী শ্রেণী : এটি একটি শোষিত শ্রেণী যার উৎপাদনের কোনো উপাদান নেই এবং এরা বাঁচতে পারে কেবলমাত্র তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে, যার মাধ্যমে এরা নিজের কাজের দ্বারা পুঁজিকে বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈর অবস্থানে রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, যেমন যেমন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে সে কৃষকদের স্তরভাগ করে এবং শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও অন্যান্য মধ্যবর্তী শ্রেণীর সঙ্গে একসাথে সংখ্যাক্ষয়ের অবস্থায় নিয়ে যায় এবং এইভাবে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। ফলতঃ, পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

তৃতীয়তঃ, পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েত আরো বেশী মাত্রায় বড় বড় কলকারখানায় ঘনীভূত হতে থাকে এবং বড় বড় দলের মধ্যে সংগঠিত হয়। জনগণের সকল অংশের মধ্যে প্রলেতারিয়েতই অনৈক্য দূর করতে সবচেয়ে সক্ষম এবং উচ্চ পর্যায়ের সংগঠনের সবচেয়ে বেশী উপযোগী।

চতুর্থতঃ, প্রলেতারিয়েত হচ্ছে এমন একটি শ্রেণী যে শ্রেণীসংগ্রামের ধারায় শিক্ষিত, যে তার তাত্ত্বিকদের মতবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে—নিজ শ্রেণীস্বার্থ ও লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়নের পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করতে অন্য যে কোন শোষিত অংশের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম। শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মসহ

'সোশ্যালিজম থিওরী অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস' পত্রিকার ১৯৭৩ এর ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'লিডিং ফোর্স ইন্ দ্য ষ্ট্রাগল্ ফর ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম'-এর অনুবাদ।

ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মসমূহের জ্ঞানে সমৃদ্ধ নিজস্ব পার্টি তৈরি করতে পারে প্রলেতারিয়েত।

কমিউনিজম বিরোধীরা দাবী করে যে নতুন সমাজের নির্মাতার ভূমিকায় প্রলেতারিয়েতকে স্থাপন করে মার্কস ও এঙ্গেলস খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় কিংবদন্তীকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন মাত্র এবং এ কাজ করতে গিয়ে তারা মানব সমাজকে রক্ষাকারী শক্তি বা হেগেলীয় 'বিশ্বচেতনা' (World spirit)র স্থানে প্রলেতারিয়েতকে বেছে নিয়েছেন। বস্তুর সঙ্গে দেবত্ব আরোপনের কোনো সম্পর্ক নেই এবং ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা নয় পরন্তু বিকাশের বিষয়গত উপাদানসমূহই প্রলেতারিয়েতকে সামাজিক সংগ্রামের আবর্তে নিয়ে এসেছে এই তথ্যের প্রতি নির্দেশ করে মার্কস ও এঙ্গেলস **দ্য হোলি ফ্যামিলী**তে এই অভিযোগ অপ্রমাণ করেছিলেন। তারা লিখেছেন: "প্রশ্নটা হচ্ছে প্রলেতারিয়েত কি, এবং, সেই প্রকৃতি (being)র ফলে, সে কি করতে বাধ্য হবে।"

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হল যে, উৎপাদিকা শক্তি এবং বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এই সম্পর্কের অবসানের দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং, প্রলেতারিয়েতের বিকাশ ও তার স্বার্থ উৎপাদিকা শক্তি এবং সামাজিক প্রগতির বিকাশের প্রবণতার সঙ্গে বিষয়গতভাবে মিলিত হয়। এটা হচ্ছে ইতিহাসে প্রলেতারিয়েতের ভূমিকার বস্তুগত বৈজ্ঞানিক বিবৃতি।

ম্যানিফেস্টো লেখা হতে হতে মার্কস ও এঙ্গেলস খুব সাধারণভাবে হলেও, আরেকটি অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেন—তা হল প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির দিকে চালিত জনগণের অন্যান্য অংশের আন্দোলনের সম্পর্ক। **দ্য কমিউনিস্টস্ অ্যাণ্ড কার্ল হাইনজেন্** এবং **প্রিন্সিপল্স্ অব্ কমিউনিজম্** (১৮৪৭) প্রমুখ প্রবন্ধে এঙ্গেলস্ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বামপন্থী ধারাটিকে নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের সম্ভাব্যতাকে বর্ণনা করেছেন।

ম্যানিফেস্টো এই ঘটনাটির ওপর জোর দিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত অন্যান্য সকল শোষিত জনগণের স্বার্থে কাজ করে। সঙ্গে সঙ্গে, ম্যানিফেস্টো, পেটি বুর্জোয়া স্তরের অনিবার্য দোদুল্যমানতা সম্পর্কে নির্দেশ

দিয়েছে এবং সাবধান করে দিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার সংগ্রামে প্রতি-বিপ্লব নিজের স্বার্থে এই স্তরটিকে কাজে লাগাতে পারে।

পুঁজিবাদী শ্রেণীসমাজের উৎখাতের জন্য সংগ্রামে শহুরে ও গ্রামীন পেটি-বুর্জোয়ার নেতা ও মিত্র হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা সম্পর্কিত এই সব বক্তব্য প্রলেতারিয় নেতৃত্ব, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা সম্পর্কিত তত্ত্বের মূল চিন্তা।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রলেতারিয়েত ও পেটিবুর্জোয়া স্তরের সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৭১এর পারী কমিউনের অভিজ্ঞতাকে খুঁটিনাটিভাবে আলোচনা করেন। প্রলেতারিয় ক্ষমতা অধিকার করার প্রথম বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র মালিকদের স্বার্থরক্ষার্থে শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে এই সমস্ত অংশের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে বা প্রকাশ পাবে প্রধানত এই দুই ভাবে : প্রথমতঃ, এই অংশসমূহকে পথনির্দেশ দেওয়ায় ও দ্বিতীয়তঃ, যা প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ-বিরোধী নয় এদের সেই সব স্বার্থকে পরিপুষ্ট করায়।

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের সম্পর্কে মার্ক্সীয় সিদ্ধান্তসমূহ সবচেয়ে সম্পূর্ণ একত্রিত হয়েছে এঙ্গেলস্-এর বিখ্যাত রচনা দ্য পেজান্ট কোয়েশ্চেন ইন ফ্রান্স অ্যাণ্ড জার্মানীতে (১৮৯৪)। এই রচনাটিতে এঙ্গেলস অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসেন, যার মধ্যে তিনটি বিশেষ তাৎপর্যময়।

এক, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির গ্রামাঞ্চলে প্রতিপত্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে (কেননা, ক্ষুদ্র চাষীদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সংগঠিত হলে কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই দৃঢ় হতে পারে না) এঙ্গেলস কৃষককে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখতে বলেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে রাজনৈতিক মৈত্রীর ধারণাকে এঙ্গেলস এইভাবে দেখেছিলেন।

দুই, স্তরবিন্যাসের ধারায় কৃষকদের বিভিন্ন অংশের সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে এঙ্গেলস সুপরিস্ফুট করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলের আধা-প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদ্র চাষীর বিপ্লবী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেন।

তিন, স্বেচ্ছা সংগঠিত সমবায়ের মধ্য দিয়ে কৃষকের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেন এঙ্গেলস। এইভাবে, তিনি কৃষকদের সামনে

তুলে ধরলেন এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত যার জন্য প্রয়োজন হল শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী।

এই সিদ্ধান্তসমূহের উৎপত্তি হয়েছে বৃহত্তর জনগণকে নিয়ে প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের সাধারণ বক্তব্য থেকে।

প্রলেতারিয় নেতৃত্বের (হেজিমণি) কারণ ও সার ঃ

সকল শ্রেণীর নিপীড়িত জনগণের আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস যে সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হয়েছিলেন এবং যেগুলিকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলির সংস্কারবাদী নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন বা বিকৃত করেছিলেন, নতুন যুগে লেনিন যে শুধু সেগুলিকে পুনর্জীবন দিলেন তাই নয়, তিনি তাকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রলেতারিয় নেতৃত্বের তত্ত্বে বিকশিত করেন।

লেনিনের মতে, প্রলেতারিয় নেতৃত্বের সার হল সকল মেহনতী গোষ্ঠী, অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ওপর প্রলেতারিয়েতের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও এদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন। সাম্রাজ্যবাদী যুগে, যখন সাধারণ গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহ আরোও বেশি কাছাকাছি আসে, তার জন্যে লেনিন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি সূত্রায়িত করেন: **সাম্রাজ্যবাদী যুগে যে কোন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে, গণবিপ্লবে প্রলেতারিয়েত প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে।**

বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে বুর্জোয়ারা শুধুমাত্র স্বার্থপরের ন্যায় নিজ লক্ষ্য-সমূহ অনুসরণ করে, শ্রমিকশ্রেণীকে শক্তিশালী করতে পারে এমন গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এরা সবসময়েই ভয় করে। লেনিন দেখিয়েছেন যে, একমাত্র প্রলেতারিয়েতই বিপ্লবকে শেষপর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম, কেননা তার সম্পূর্ণ শোষণাবসানের লক্ষ্যসমূহ গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের কাঠামোকে বহুদূর ছাড়িয়ে যায়। যদিও লেনিন মনে করতেন যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সফল সংগ্রাম করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে সংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ শক্তি হতে হবে, প্রলেতারিয়েত বিপ্লব একমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যখন

শ্রমিকশ্রেণী জাতির বৃহত্তম অংশে পরিণত হবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংস্কারবাদী নেতাদের এই মতান্ধ বক্তব্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।

এইভাবে, লেনিন দেখিয়েছেন যে মোট জনসংখ্যায় এর অনুপাতের তুলনায় প্রলেতারিয়েতের প্রভাব অনেক বেশি। একটা বিমূর্ত প্রলেতারিয়েত নয়, সর্বদাই বাস্তব বিপ্লবী শক্তি হিসেবে মনে রেখে, লেনিন বলেছেন যে, যদি শ্রমিকশ্রেণী জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশও হয়, তবু তার মিত্রদের জঙ্গী মনোভাবে সংগঠিত করে এবং নিজের চারপাশে সমবেত করে সে জয় নিশ্চিত করতে পারে। প্রলেতারিয় একনায়কত্ব সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনার জন্য লেনিন ১৯১৯এর শরতে যে খসড়া করেছিলেন তাতে নিম্নলিখিত হিসেবসমূহ উদ্ধৃত করেছিলেন—সেগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

য়োরোপে (উদাহরণ—ক) বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি তৈরি হতে পারে শ্রেণীসমূহ ও অংশগুলি নিয়ে যারা জনসমষ্টির নিম্নলিখিত অনুপাতে আছে: প্রলেতারিয়েত (অন্ততঃপক্ষে) শতকরা ৫১ ভাগ দরিদ্র অংশসমূহের শতকরা ১০ ভাগ (মধ্যবর্তী অংশগুলির শতকরা ৪০ ভাগের মধ্যে), অর্থাৎ জনসমষ্টির শতকরা ৬১ ভাগ মাত্র।

অপর একটি ক্ষেত্রে, রাশিয়াতে (উদাহরণ—খ) এই ভিত্তিকে অন্যরকম মনে হতে পারে: প্রলেতারিয়েত হল শতকরা ২০ ভাগ, যোগ দরিদ্র অংশের শতকরা ৩০ ভাগ যোগ শতকরা ১৫ ভাগ অর্থাৎ মধ্যবর্তী অংশের অর্ধেক, সমগ্র জনসমষ্টির মোট ৬৫ ভাগ। লেনিন এই হিসেবকে সংক্ষেপে এইভাবে বলেছিলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠতা ? প্রলেতারিয়েতের ৫১ শতাংশ (উদাহরণ—ক) প্রলেতারিয়েতের ২০ শতাংশের (উদাহরণ—খ) থেকে কম, যদি (ক) তে সাম্রাজ্যবাদী কলুষস্পর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়ার প্রতিরোধ বেশি হয়।"

অর্থাৎ, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত শক্তি ততটা নয়, বরং তার বিপ্লবী মানসিকতা এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনতাকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাই সংগ্রাম ও ঐতিহাসিক সংঘর্ষে তার প্রকৃত ভূমিকা নির্ধারণ করে।

লেনিন প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী চরিত্রের মার্কসীয় নির্ণায়ককে বিস্তৃত ও বিকশিত করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে শ্রমিকশ্রেণী প্রকৃতপক্ষেই বিপ্লবী শক্তি হয়ে উঠল যখন সে তার শ্রেণীস্বার্থসমূহকে, ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং

অবশিষ্ট শ্রমিকদের নেতা হিসেবে তার অবস্থানকে বাস্তবায়িত করল। তিনি লিখেছেন :

"মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী যতদিন পর্যন্ত নেতৃত্বের ধারণাকে বর্জন করে থাকে অথবা বুঝতে না পারে, সেটা শ্রেণী নয়, বা তখনও পর্যন্ত শ্রেণী হয়ে ওঠে নি, বরং একটা 'গিল্ড' অথবা অনেকগুলি গিল্ডের একটি সমষ্টি।" অতএব "প্রলেতারীয় নেতৃত্বের ধারণা সম্পর্কে সচেতন এবং তাকে কার্যকর করলেই তবে সে বিপ্লবী হয়।"

শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষায় ও সংগঠনে নতুন ধরনের প্রলেতারীয় পার্টির বিশিষ্ট ভূমিকা প্রকাশ করেন লেনিন। শ্রমিকদের নতুন নতুন অংশকে প্রশিক্ষণ দিতে ধৈর্যসহকারে তাদের চেতনায় স্তরকে উন্নীত করতে এবং তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা দিতে একমাত্র এই পার্টি সক্ষম। একমাত্র এই পার্টিই প্রলেতারিয়েতকে তাত্ত্বিক পরিপূর্ণতা দান করে। লক্ষ্যসমূহের স্বচ্ছ বাস্তবায়ন এবং এই লক্ষ্যসমূহকে সুনিশ্চিত করার পথ নির্ধারণ করে দেয়, বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সম্পদকে সঞ্চিত করে এবং অন্যান্য মেহনতী জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রলেতারিয়েতের সামর্থ্যকে প্রয়োগ করে।

লেনিন দেখিয়েছেন যে, 'অভিজাত শ্রমিক' (লেবার অ্যারিস্টোক্রেসী), সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে ভাগাভাগি এবং পুঁজিবাদী-মনোভাবাপন্ন ও সংস্কারবাদী মোহ ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশে সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধক খাড়া করে। এ প্রসঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দুটি প্রধান প্রবণতার উল্লেখ করেছেন লেনিন। তিনি লিখেছেন : "একদিকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে মোটামুটি সুখে স্থিতি লাভ করার প্রবণতা, যা সম্ভবপর হত কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ওপর তলার প্রলেতারিয়েতের পক্ষে। অন্যদিকে আরেকটি প্রবণতা ছিল, সমগ্র মেহনতী ও শোষিত জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লবের দিকে এবং সাধারণভাবে পুঁজির অবসানের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।"

পুঁজিবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতাটি, যার চর্চা করে এবং উৎসাহ দেয় বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদীরা, তা এখনও টিঁকে রয়েছে, কেননা তার কারণগুলি হাতের কাছেই রয়েছে। লেনিনবাদীরা, বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী প্রভাব এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ থেকে বেরিয়ে আসাকে

অপরিবর্তনীয় ভাবে প্রধান কাজ বলে দেখে থাকে, কেননা মিত্রদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা এই কাজের সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

প্রলেতারিয় নেতৃত্বের কার্য পদ্ধতি

তাঁর রচনাসমূহে লেনিন প্রলেতারিয় নেতৃত্বের (হেজিমনি) কার্যপদ্ধতি, এই নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করা এবং প্রয়োগ করার জন্য যেসব রূপ ও উপায় প্রয়োজন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে :

—রণনৈতিক লক্ষ্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং একে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় মিত্রশক্তিসমূহ ;

—কেবলমাত্র অগ্রসর বাহিনীর নয়, পরন্তু বৃহত্তর জনগণের জরুরী দাবী-সমূহকে প্রকৃতপক্ষেই প্রকাশ করে এমন স্লোগান তৈরী ;

—অন্যান্য অংশগুলিকে জয় করার জন্য তাদের সামনে দৃষ্টান্ত খাড়া করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অবিচলভাবে কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে ;

—প্রলেতারিয়েত কর্তৃক শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশসমূহের স্বার্থের অবিচলিত রক্ষা, এই অংশসমূহের কাছে যাবার ক্ষমতা এবং প্রলেতারিয় একনায়কত্বের অধীনে ক্ষুদ্র-মালিক জনতার সঙ্গে এক সাথে থাকার ক্ষমতা, দীর্ঘস্থায়ী, সাবধানী এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা চলিয়ে এদের পুনর্শিক্ষিত করার ক্ষমতা ;

—বাস্তব পরিস্থিতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী জনগণকে জাগিয়ে তুলবার এবং সংগ্রামে নিয়ে আসার জন্য উপায়সমূহের প্রয়োগ যার মধ্যে থাকবে অর্থ-নৈতিক ষ্ট্রাইক থেকে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান পর্যন্ত এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড ;

—মিত্রদের সামনে প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্ঘাটন করা এবং মিত্রদের মধ্যেই যে সব দোদুল্যমানতা এবং চঞ্চলতা রয়েছে তার সমালোচনা।

পেটি-বুর্জোয়া অংশের দোদুল্যমানতা, স্তরভেদ এবং ছড়িয়ে যাওয়ার থেকে উদ্ভূত তাদের পশ্চাদপদতা এবং পূর্ব সংস্কারসমূহকে জয় করার জন্য ও শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের যে সাম্য রয়েছে তা তাদের বোঝাবার জন্য প্রলেতারিয়েত এই কার্যপদ্ধতিকে কাজে লাগাতে পারে।

মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকের রাজনৈতিক মৈত্রীর তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, পক্ষান্তরে, নতুন পরিস্থিতিতে লেনিন প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া অংশগুলির রাজনৈতিক মৈত্রীর এক বিস্তৃত তত্ত্ব উপস্থিত করেন।

লেনিনের প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের স্লোগান গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকের রাজনৈতিক মৈত্রীর ধারণার একটি ঘন সংবদ্ধ প্রকাশ। প্রলেতারীয় রণনীতির এক নতুন সামঞ্জস্য এই স্লোগান নির্দেশ করে যে কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া অংশগুলি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহকে দৃঢ়তাসহকারে পূর্ণ করার ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করার জন্য সরকারী কাজেকর্মে অংশগ্রহণ করবে (প্রলেতারিয়েত সেখানে প্রধান ভূমিকায় থাকবে)। এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে লেনিন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় এবং তার প্রলেতারীয় বিপ্লবে উত্তরণের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রলেতারিয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বেশির ভাগ তত্ত্বই, যে হত্ব অনুযায়ে প্রলেতারিয়েত একলাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ নেবে, একটা মতান্ধ দৃষ্টিকোণ নিয়েছিল। লেনিন প্রমাণ করেছিলেন যে পেটি-বুর্জোয়ারাও বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। তিনি লিখেছিলেন যে···"ঐ ধরণের অংশগ্রহণ ছাড়া, গণ সংগ্রাম অসম্ভব, এ ছাড়া কোনো বিপ্লবই সম্ভব নয়।"

লেনিন এই থিসিস প্রমাণ করেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের অ-প্রলেতারীয় অংশের মৈত্রী প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরী করে। তিনি বলেছেন যে এই ধরণের মৈত্রী ছাড়া প্রলেতারীয় ক্ষমতা স্থায়ী হতে পারে না। প্রলেতারীয় নেতৃত্ব, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয় শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে অটল মৈত্রীর মাধ্যমে—এটাই হল লেনিনবাদের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

লেনিন মনে করতেন যে এই রাজনৈতিক মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে প্রলেতারিয়েতকে তার মিত্রদের স্বার্থকে সতর্কতার সঙ্গে গণ্য করতে হবে তাদের ইচ্ছেকে পূরণ করতে হবে এবং তাদের ছাড়িয়ে বহুদূর "এগিয়ে" যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা তা মৈত্রী এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ভূমিকাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।

জনগণের আধা প্রলেতারিয়েত ও পেটি-বুর্জোয়া অংশের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য এমন একটি পথ প্রস্তুত করা প্রলেতারীয় নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন :

প্রলেতারীয় নেতৃত্ব (হেজিমনি) সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব হচ্ছে উপনিবেশবাদী দেশের প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে উপনিবেশ ও অন্যান্য পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর চিন্তার বিকাশে একটি নতুন পদক্ষেপ।

১৯১৬ সালে লেনিন লিখেছিলেন যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হতে পারে একমাত্র"....একটা যুগের রূপে যার মধ্যে যুক্ত হবে অগ্রসর দেশসমূহে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের গৃহযুদ্ধের সঙ্গে উন্নয়নশীল, পশ্চাদপদ এবং নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী আন্দোলনের এক সমগ্র পারম্পর্য।"

এই কথাগুলির অর্থ শুধুমাত্র এই আন্দোলনসমূহের মিলনই নয়। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে যখন উপনিবেশবাদের সঙ্কট শুরু হল, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে লেনিন দেখেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে বৃহত্তর কৃষক এবং পেটি-বুর্জোয়া জনতার ও উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের সকল নিপীড়িত জনগণের বিশ্বব্যাপী মৈত্রী হিসেবে।

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে লেনিন নির্দেশ করেছিলেন যে এই মৈত্রীতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী নেতা হিসেবে কাজ করবে। এই নেতৃত্ব, যা সর্বোপরি জয়ী প্রলেতারিয়েত কর্তৃক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সর্ববিধ সাহায্যের রূপ নিয়েছে, পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের কাছে পুঁজিবাদী স্তরকে এড়িয়ে বিকাশের অন্য পথ অনুসরণ করার নতুন ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে।

বিশ্বের একটা অংশ জুড়ে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদের চরম দুর্বলতা, একমাত্র জয়ী প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ বস্তুগত, রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জয় সহজ করে,

এইসব ঘটনা থেকেই আন্তর্জাতিক, সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর শাসনাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রলেতারিয়েতের প্রধান ভূমিকা উদ্ভূত হচ্ছে।

বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অংশে প্রযুক্ত হয়ে, প্রলেতারিয় নেতৃত্বের (হল্লিমনী) তত্ত্ব বিশ্ব বিপ্লবের লেনিনীয় ধারণার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে ওঠে।

মার্কস ও লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইতিহাসের বিকাশ ঘটছে ঃ

আমাদের যুগের ঐতিহাসিক বিকাশ ; যার সূচনা হল ১৯১৭র রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, সমস্তশ্রমজীবী মানুষের, সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ভূমিকাকে প্রমাণ করেছে। জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে, তিরিশের দশকে ফাসি-বিরোধী গণফ্রন্ট গঠনের সংগ্রামে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে নাৎসী দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইতে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহকে মিলিত করেছে জাতীয় ফ্রন্টসমূহে, এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে নতুন সমাজ নির্মাণে।

আজকের দিনে প্রলেতারিয়েতের উত্তুঙ্গ সংগ্রাম বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রমাণ করেছে যে চলতি যুগের গতিশীল বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনায় শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশঃই আরোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

একটা বিশিষ্ট দিক যে সম্পর্কে বর্তমানের অনেক বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ও 'বামপন্থী' চরম মতাবলম্বী তত্ত্বগুলি অনুরূপ ধারণা পোষণ করে তাহল অধুনাতম প্রবণতাগুলি বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বিকাশকে তারা ব্যাখ্যা করে এমন কারণ হিসেবে যা শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষয় করে অথবা তাকে এক ধরণের 'মধ্যবর্তী শ্রেণী'তে রূপান্তরিত করে।

যে তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলমাত্র শিল্প-শ্রমিক বা কায়িক শ্রমিক হিসেবে দেখে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সেইসব তত্ত্বকে দুর্বল বলে বিরোধিতা করেন, কেননা এই ধরণের সীমিতকরণ শ্রমিকশ্রেণীর ভিত্তি সংকীর্ণ হয়ে আসছে এমনতরো চিন্তার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে।

১৯৭২এর মার্চে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চদশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভাষণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেন : "যদিও প্রচলিত মার্কসবাদ বিরোধী তত্ত্বসমূহ মনে করে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করছে এবং ক্রমে ক্রমে একে দেউলিয়া করে দেবে, পরন্তু তথ্য এর উল্টোটাই বলে : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটায় কেননা, অন্যান্য আরোও অনেক কিছুর সঙ্গে, এ নতুন কাজের সৃষ্টি করে।"

বস্তুতঃ, সত্যকে ঢেকে না রেখে কিভাবে বলা যেতে পারে যে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব কমছে? যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখা হয় সমগ্র পৃথিবীর প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ছিল খুব বেশি হলে ১০০ লক্ষ। আজ, কেবলমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০০০ লক্ষ।

যখন অজস্র সহস্র তথ্য প্রতিদিনই প্রমাণ করছে—আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি—বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিশাল প্রভাবের কথা—বিশ্বশক্তি সাম্যের পরিবর্তনের ওপর—অন্যান্য বিশ্ব বিপ্লবী শক্তিসমূহের উপর—এবং এমনকি পুঁজিবাদী বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিকাশের নিয়মের ওপর—তখন কিভাবে বলা যেতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণী তার প্রধান ভূমিকা হারিয়ে ফেলছে? অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শ্রমজীবী মানুষের সমগ্র গঠনমূলক কাজ, যার মধ্যে বিপ্লবী পরিবর্তনসমূহ ঘটে যাচ্ছে, সেগুলি বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে মুক্ত। এটা আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বের নতুন স্তরের একটা সূচক।

আজকের মতাদর্শগত সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুঁজিবাদের দুর্গগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে তীব্র লড়াই। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিলসমূহ রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বপ্রকার প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, একদিকে জনগণের বিভিন্ন অংশের স্বার্থ ও অপর দিকে, পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়াদের স্বার্থ, এই উভয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণ লড়াই-এর ফলে একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তি ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে এবং একচেটিয়া-বিরোধী গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণী যে সব শক্তিকে মিত্র হিসেবে নেতৃত্ব দিতে পারে

তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। একচেটিয়ার বর্ধমান অত্যাচার বুদ্ধিজীবী, কৃষক এবং শহরে মধ্যবর্তী শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের স্বার্থকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সমীপবর্তী করছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ভবিষ্যৎ রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, কেননা, এই সব দেশে, উৎপাদনের সর্বাধিক উন্নত রূপ সমাজের নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গঠনের ভিত্তি তৈরী করছে। পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে একটি বিপ্লবী শ্রেণী, কেননা, যেমন ম্যানিফেস্টো লেখার সময়ে তেমনি এখনও, সে এখনও সেই ধরণের একটি শ্রেণীই রয়েছে যে তার অস্তিত্ব রাখতে পারে কেবলমাত্র শ্রমশক্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে। তাকে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিচালনায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নি। পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী একটি ক্রমবর্ধনশীল সামাজিক শক্তি। বর্তমানে তারা অর্থকরী কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এবং বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমগ্র মজুরি শ্রমশক্তির ৮০-৯০ শতাংশ তারাই।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পরিপক্কতা লাভের এবং একটি প্রধান শক্তি হিসেবে এর রূপান্তরের প্রক্রিয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও এক্ষেত্রে সে তার বিকাশের প্রথম যুগে। বিশ্বের এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিসমূহের পরিসর বিরাট বিস্তৃত এবং সামাজিক গঠনেও তারা অসমসত্ত্ব। ফলতঃ সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা। কিন্তু, এখানেও, শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে মৈত্রীতে কাজ করে চলেছে। এসব দেশে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রদানকারী ভূমিকা সম্পর্কিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব—গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে এর নেতৃত্ব (হেজিমণি)—বিপ্লবী নীতির এক মহাশক্তিধর আয়ুধ। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো হচ্ছে এই তত্ত্বের মূল উৎস, যা আজও, কমিউনিস্টদের শান্তি, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পরিষ্কার দিকনির্দেশ করছে।

অনুবাদ : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সোভিয়েত বিরোধিতার এক বিপজ্জনক দিক

সাম্রাজ্যবাদ সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ কখনও তার প্রকৃতি বদলায় না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শই তার কৌশল বদলায়।

এই সাধারণ সূত্রটি মনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের একটি নতুন কৌশল সম্পর্কে মার্কসবাদীদের সচেতন করাই এই ছোট্ট প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সোভিয়েত বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদের স্বভাব-ধর্ম। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সোভিয়েত রাশিয়া হল সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রধান দুর্গ। তাই জন্মের দিন থেকে সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল। এমন কোনো অস্ত্র নেই যা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করে নি। যেমন: প্রত্যক্ষ আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধে উস্কানি দান, প্রতি-বিপ্লব রপ্তানী, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, সোভিয়েত সম্পর্কে নির্জলা বা স্থূল মিথ্যা প্রচার ইত্যাদি। কিন্তু এত সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া দৃঢ়মূলে অবস্থান করছে। সোভিয়েতের শক্তি আজ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই দিন গত যখন পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র অধিষ্ঠিত ছিল। এখন পৃথিবীতে চৌদ্দটি দেশে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র এখন ধনতন্ত্রের মুখোমুখি একটি পাল্টা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। শক্তি-পরীক্ষায় ধনতন্ত্র পিছু হটছে, সমাজতন্ত্র এগিয়ে চলেছে। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা নিয়ামকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ধনতন্ত্র সম্পর্কে ঘৃণা এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আকর্ষণ আজ পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ এখন আশু কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি ধনতন্ত্রকে পরিহার করে অ-ধনতান্ত্রিক পথের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রার জন্যে নিত্য নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করেছে।

এই অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদকেও তার কৌশল পরিবর্তন করতে হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের সম্মুখগতি রোধ করার ক্ষমতা তার আর নেই। তাই সে এখন পুরানো কায়দার পাশাপাশি নতুন কৌশল নিচ্ছে। সে আজ খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে আদর্শগত অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম (ideological subversion) চালাতে চায়। নানা চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আদর্শগত সংহতি বিনষ্ট করতে সে বিশেষ সচেষ্ট।

লেনিন এক সময়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে মার্কসবাদ-বিরোধিরা মার্কসবাদের নামাবলি গায়ে দিয়ে মার্কসবাদের শিবিরে ঢুকে ভিতর থেকে মার্কসবাদকে আক্রমণ করছে (Lenin—Marxism and Revisionism)। আজ লেনিনের সেই সতর্কবাণী সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ হবার প্রয়োজন। কেননা, সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিযুক্ত একদল মার্কিন, পশ্চিম জার্মানী ও ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবী আজ ঠিক সেই কৌশল ব্যাপক আকারে গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

আমেরিকায় আজ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী প্রচেষ্টায় মার্কসবাদের 'চর্চা' আরম্ভ হয়েছে। যারা এই 'চর্চা' করছেন তাঁদের বলা হয় 'মার্কসোলজিস্ট'। এঁরা মার্কসবাদ নিয়ে এত চর্চায় মেতে উঠেছেন কেন? উদ্দেশ্য হল মার্কসবাদী শিবিরে আদর্শগত বিষয়ে যে বিতর্ক চলছে তার খবর সংগ্রহ করা এবং এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে মত-বিরোধকে নিজেদের মতলব সিদ্ধিতে কাজে লাগানো। শত শত বই এই-সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এই বইগুলিতে আলোচিত কয়েকটি বিষয়ের নাম করলেই যথেষ্ট হবে: যেমন পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টি-গুলিতে সংশোধনবাদের বিস্তারের চেষ্টা, পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টি-গুলিতে বহুকেন্দ্রীকতার প্রভাব (polycentrism), চীনে মার্কসবাদের 'পবিত্রতা' রক্ষার সংগ্রাম, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে দেখা যায় মার্কসোলজিস্টরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে মতভেদ কোন্ কোন্ বিষয়ে সেই দিকে তাঁদের গবেষণার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ভিন্নমত (dissidence) কোন্ কোন্ সূত্র ধরে দেখা দিচ্ছে সেই দিকে তাঁদের বিশেষ

নজর। যাঁরা তাঁদের মতে ভিন্নমতাবলম্বী (dissidents) তাঁদের প্রশংসায় এই মার্কসোলজিস্টরা পঞ্চমুখ। এঁদের উদ্দেশ্য হল আদর্শের ক্ষেত্রে মত-বিরোধের উস্কানি দিয়ে ভিতর থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। ভিতর থেকে আদর্শগত বিরোধ বাড়িয়ে তুলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি বিনষ্ট করে দেওয়া, কমিউনিস্ট পার্টিকে পরস্পরবিরোধী মতপ্রকাশের মঞ্চে পরিণত করে একটি ডিবেটিং সোসাইটিতে রূপান্তরিত করা।

মার্কসোলজিস্টরা মার্কিন সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট। সি-আই-এর সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সরকারী মহলে এঁদের এত কদর এইজন্যে যে এঁরা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভেদে উস্কানি দিতে বেশ কিছুটা সাফল্য দেখিয়েছেন। চেকোস্লোভেকিয়ার ঘটনাবলীতে এই মার্কসোলজিস্টদের একটা ভূমিকা ছিল। চেক পার্টিতে যাঁরা 'ডিসিডেন্ট' ছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডুবচেকের আমলে যখন 'ডিসিডেন্টরা' পার্টির মধ্যে সাময়িকভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল, তখন তারা চেকোস্লোভেকিয়ায় বক্তৃতা দেবার জন্যে মার্কসোলজিস্টদের বড় বড় মহারথীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এই বক্তাদের বক্তৃতার আসল লক্ষ্য ছিল—এই কথা প্রমাণ করা যে চেকোস্লোভেকিয়া শিল্পে উন্নত দেশ। লেনিনের চিন্তাধারা যা কৃষিপ্রধান রাশিয়াকে পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছে তা এখানে চলবে না—এখানে লেনিনীয় শিক্ষা একেবারে অচল। একজন বক্তার বক্তৃতার বিষয় ছিল—'লেনিনবাদের অন্তিমকাল' (End of Leninism)—অর্থাৎ লেনিনবাদের দিন শেষ হয়েছে। মার্কসোলজিস্টরা চেকোস্লোভেকিয়ার ঘটনা-বলীকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করার জন্যে এইভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে ছিল।

ফ্রান্সেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৭ সালে ফ্রান্সে যখন শ্রমিক বিদ্রোহ ও ছাত্র বিদ্রোহ দেখা দেয় তখন এই বিদ্রোহ পরিচালনার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি এবং ট্রটস্কীপন্থী-মাওপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেয়। এই সময়ে মার্কসোলজিস্টরা ট্রটস্কীপন্থী, মাওপন্থীদের সাচ্চা বিপ্লবী বলে চিত্রিত করেছিল। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিকে তারা সংশোধনবাদী, বিপ্লব-বিরোধী বলে প্রচার করতে অগ্রসর হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ট্রটস্কীপন্থী-মাওপন্থীদের বিভেদপন্থী কৌশলে উৎসাহ দিয়ে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটিকে ভিতর থেকে ছুরিকাঘাত করা।

এবারে চীনের ব্যাপারে আসা যাক। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে, বিশেষ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতবিরোধের খবর যখন তাঁরা বিভিন্ন গোপন সূত্রে জানতে পারলেন তখন থেকেই তাঁরা উঠে-পড়ে লাগলেন এই মতবিরোধে কি ভাবে উস্কানি দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। এই বিরোধে তাঁরা চীনের পক্ষ বেছে নিলেন। চীনকে 'খাঁটি মার্কসবাদী' বলে অভিহিত করে মার্কসোলজিস্টরা বিরাট বিরাট বই লিখতে আরম্ভ করলেন। চীন ও সোভিয়েতের মধ্যে বিরোধকে তাঁরা দুই কমিউনিস্ট দানবের মধ্যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' বলে চিত্রিত করলেন। ক্রমে ক্রমে চীনের সোভিয়েত বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পট পরিবর্তনের চেষ্টা করতে লাগলেন। চীন যখন সোভিয়েতকে তার প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি হল একসঙ্গে চলার। সেই কৌশল আজ এতদূরে অগ্রসর হয়েছে যে মার্কিন সেনেটর জ্যাকসন সম্প্রতি চীন বিহার সেরে ওয়াশিংটনে গিয়ে ঘোষণা করেছেন যে—চীন এখন ইওরোপে ন্যাটো জোটকে সমর্থন করছে। এশিয়া থেকে মার্কিন সৈন্যের অপসারণের বিপক্ষে সে মত জ্ঞাপন করেছে।

চিলির ঘটনাও আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে সেখানেও সাম্রাজ্যবাদের অনুচরেরা অতি-বামপন্থী, টটস্কীপন্থী প্রভৃতিদের কাজে লাগাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং কিছুটা সাফল্যলাভ করেছে। এই অতি বাম-পন্থীরা যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত না করে আলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন্দ্রীভূত করে তখন সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা তাদের সে কাজের তারিফ করেছিল এবং মার্কিন সরকারের আলেন্দে বিরোধী পরিকল্পনা হাসিল করার কাজে তারা এই অতি বামপন্থী আন্দোলনকে ব্যবহার করেছিল।

এর থেকে দেখা যায় সম্প্রতিকালে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যখনই কোন একটি জরুরী পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছে তখনই মার্কসোলজিস্টরা তাতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে। কখনও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ, কখনও বামপন্থী সংশোধনবাদ, যখন যেটি তাদের কাছে সুবিধাজনক তখনই তারা সেটির সুযোগ গ্রহণ করেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের অনুচরেরা প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর চোখ রেখেছে। প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে কিভাবে ভিন্নমত (dissidence) প্রকাশ পাচ্ছে তার খবর সংগ্রহ করছে। মার্কিন সরকারী সাহায্যপুষ্ট Problems of Communism নামক পত্রিকা পাঠ করলেই বোঝা যায় মার্কসোলজিস্টদের জাল কত বড় ও কত ব্যাপক। এমন কোনো কমিউনিস্ট পার্টি নেই যার ভিতরের খবর তারা রাখে না। রজার গারোদি, আর্নস্ট ফিশার প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী-দের বহুগুলি এই উদ্দেশ্যে তারা লক্ষ লক্ষ কপি ছাপার ব্যবস্থা ক'রে পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রির আয়োজন করেছে। লাতিন আমেরিকার পার্টিগুলিতে অতি-বামপন্থী গ্রুপগুলির কার্যকলাপের কাহিনী নানা বইয়ের মারফৎ তারা পৃথিবীর বিভিন্ন সদ্য স্বাধীন দেশে লাখে লাখে বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। বামপন্থী সংশোধনবাদী ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীরা যেখানে একত্রে সোভিয়েত-বিরোধিতায় হাত মেলাচ্ছে সেই খবর তারা নানা পত্র-পুস্তিকার মারফৎ অতি উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশন করছে।

এই পটভূমিতে স্থাপন করে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের আদর্শগত ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যলাপের বিচার করতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ভাঙন (split) সাম্রাজ্যবাদকে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সি.পি.আই., সি.পি.এম., সি.পি.এম. এল-এর বিভিন্ন গ্রুপ—প্রত্যেকটির মধ্যে কোথায় কোথায় ভিন্ন মত সেদিকে তা বিশেষ নজর রয়েছে।

মার্কসোলজিস্টরা লক্ষ্য করে দেখছে যে সি. পি. আই. ও সি. পি. এম-এর মধ্যে আদর্শগত বিরোধ যথেষ্ট গভীর। এক্ষেত্রে তারা সি. পি. আই-এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে। সি. পি. এম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দো-লনের সাধারণ লাইনটি মানছে না দেখে তারা খুসী। তারা সি. পি. এম কর্তৃক অনুসৃত সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে সমদূরত্বের নীতিটিকে উৎসাহ দিতে চায়। সি. পি. এম-এর জাতীয়তাবাদী ঝোঁককে উস্কানি দিতে চায়। কিছু-দিন পূর্বে Problems of Communism পত্রিকায় (March-April, 1974) সি. পি. এম-এর এই ভিন্নমতের ঝোঁককে প্রকারন্তরে প্রশংসা করা হয়েছে।

ভারতের নকশাল আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ

মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। নক্সাল আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অধিকতর আগ্রহের কারণ এই অতি বামপন্থী গ্রুপগুলির অন্ধ সোভিয়েত-বিরোধিতা। তাদের সোভিয়েত-বিরোধিতা এমন পর্যায়ে যে তাদের মতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতই, এমন কি তার চেয়ে বেশি, মারাত্মক হল সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। যেহেতু মাওবাদ এদের আদর্শস্থল এবং যেহেতু চীনের মাওবাদী নেতৃত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে বড় শত্রু বলে মনে করে তাই ভারতের এই মাওবাদী গ্রুপগুলির চোখেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও সোভিয়েত বড় শত্রু বলে বিবেচিত হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় ব্যাঙের ছাতার মত আমাদের দেশে বহু কমিটি, বহু সেন্টার, বহু গ্রুপ গজিয়ে উঠেছে, যারা পুস্তিকা লিখছে, ইস্তাহার বিলি করছে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে, থিয়েটারের মঞ্চ ব্যবহার করছে, যাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে এক সঙ্গে রেখে আক্রমণ করা হচ্ছে। এটি বুঝতে কষ্ট হয় না যে এরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে একই ব্র্যাকেটে স্থাপন করছে, এদের আসল কথা, এটাই বোঝানো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বড় শত্রু রাশিয়া। বলাই বাহুল্য, এই ধরনের প্রচার সাম্রাজ্যবাদের খুবই কাজে লাগছে। এই সব গ্রুপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সাম্রাজ্যবাদের চরেরা এই সোভিয়েত-বিরোধী মঞ্চগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে—এতে সন্দেহ কি?

সি. পি. আই-এর মধ্যেও আদর্শগত ক্ষেত্রে এই অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করা থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরত আছে ভাবলে ভুল হবে। তারা লক্ষ্য করছে, সি. পি. আই-এর মধ্যে এই ধরনের অন্ধ সোভিয়েত-বিরোধিতা ব্যাপক নয় বটে, তবে এই পার্টিতেও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধিতার প্রভাব রয়েছে। সম্প্রতি একখানি বই বেরিয়েছে। যার লেখক হলেন একজন মার্কিন 'গবেষক'। তিনি খুঁজে বের করেছেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি ছোট গ্রুপ আছে, যাদের তিনি বলেছেন সোভিয়েত সমালোচক দল (Soviet critics), এদের নামধামও ঐ বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। (Frunda-Radical Politics in West

Bengal) উপরোক্ত 'গবেষক' লক্ষ্য করেছেন যে এঁরা চেকোস্লোভেকিয়ার ঘটনার সময়ে সোভিয়েত-বিরোধিতায় উন্মত্ত হয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেন। এই সোভিয়েত সমালোচকেরা মনে করেন রাশিয়ায় আবার স্তালিনবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটছে, সেখানে ডেমোক্রেসির জায়গায় আবার বুরোক্রেসির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ইত্যাদি।

সি.পি. আই-এর মধ্যে কেউ কেউ অতি-বিপ্লবের ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে যদি নক্সালপন্থীদের ফাঁদে পা দেয় তাহ'লে তার পুরো সুযোগ নিতেও সাম্রাজ্যবাদ পিছপা হবে না—এটাও মনে রাখা প্রয়োজন। তাদের চোখে নাটক আরও জমে ওঠে যদি দেখা যায়, চেক ঘটনার সময়ে সোভিয়েত সমালোচনায় মুখর ছিলেন এমন বুদ্ধিজীবী অতি-বামপন্থীদের সঙ্গে এক আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এখানে পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে সোভিয়েত-বিরোধী মাত্রেই সাম্রাজ্যবাদের অনুচর নয়। সোভিয়েত বিরোধিতার উৎস নানা ধরনের। কখনও কখনও অজ্ঞানতা থেকে সোভিয়েত বিরোধিতা জন্ম নেয়। কখনও অতি-বিপ্লবের ঝোঁক থেকে, কখনও মতান্ধতা থেকে, কখনও উপদলীয় চক্রান্ত থেকে। কাজেই সোভিয়েত বিরোধিদের মধ্যে অনেকে থাকতে পারেন যাঁরা বিভ্রান্ত, তাঁদের মধ্যে সৎ মানুষও আছেন, কাজেই সোভিয়েতবিরোধী মাত্রকেই বিচার না করে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বলে ঘোষণা করার মত মূর্খতা আর হয় না। সাধারণভাবে সোভিয়েত-বিরোধিতা নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য বামপন্থী আন্দোলনের ভিতরকার সোভিয়েত-বিরোধিতাকে সাম্রাজ্যবাদ আজ কিভাবে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। সাম্রাজ্যবাদ যে বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে আদর্শগত বিভ্রান্তি বিস্তারের বহু বিস্তৃত জাল বুনছে, সেই সম্পর্কে বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে অবহিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এটি আরও প্রয়োজন আমাদের দেশে, যেখানে মার্কসবাদী মহলে এই বিষয়ে সচেতনতা একেবারেই নেই বললেই চলে।

সুবিনয় সেন

কমিউনিস্ট পার্টি ও পি-ডি-এ

রণধীর দাশগুপ্ত

কমিউনিষ্ট পার্টি পি-ডি-এ থেকে বেরিয়ে আসার পরে মার্কসবাদী মহলে ও বুর্জোয়া সাংবাদিক মহলে এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে। এই প্রবন্ধে সেই সিদ্ধান্ত কেন সঠিক হয়েছে তার একটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা লেখক উপস্থিত করেছেন।—সম্পাদক।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের পরিপ্রেক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গ হল যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরীক্ষা ক্ষেত্র। এই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফ্রন্টের আবির্ভাব হয়েছে। বামপন্থী ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু সেই সরকারের পতন ঘটেছে, ফ্রন্টও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। (এক একটা ফ্রন্টের উত্থান ও পতন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।)

১৯৬৭ সালে এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস এবং ফরোয়ার্ড ব্লক মিলিত ভাবে ফ্রন্ট গঠন করেছিল। অপর পক্ষে সি. পি. এম-এর নেতৃত্বে এস. ইউ. সি., আর. এস. পি ইত্যাদি মিলিতভাবে ফ্রন্ট গঠন করেছিল। নির্বাচনের পর উভয় ফ্রন্টই একটি ফ্রন্টে পরিণত হয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৬৯ সালেও বামপন্থী ফ্রন্টের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ৮ পার্টির ফ্রন্ট গঠিত হয় এবং অপর পক্ষে সি. পি. এম-এর নেতৃত্বে একটা বিকল্প ফ্রন্ট তৈরি হয়। আর. এস. পি একক্ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে কোন ফ্রন্টই স্থায়ী হতে পারল না কোন ফ্রন্ট-সরকারই স্থিতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হল না।

১৯৭২ সালে ১৭ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের ফলে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা নির্বাচনে প্রভূত সাফল্য অর্জন করল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিরাট আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চারও পতন ঘটল। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বের কার্যকলাপের ফলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বাধ্য হয়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চাকে বর্জন করতে হয়েছে।

বিভিন্ন ফ্রন্টের প্রকৃতি, কার্যকলাপ, কর্মকৌশল, শ্রেণীভিত্তি এবং বিপ্লবের বর্তমান স্তরে বিপ্লবের শক্তি সমূহের প্রতি তাদের মনোভাব ও আচরণ অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করা এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কমিউনিস্টদের কর্তব্য। এই কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নি। অবশ্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়।

যুগের বৈশিষ্ট্য খেয়াল না রাখলে, বিপ্লবের বর্তমান স্তর বিচার না করলে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় না করলে যে কোন কর্মকৌশল ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক। বিপ্লবের বর্তমান স্তর বিবেচনা করে যে সব শ্রেণী ও শক্তি ঐতিহাসিক কারণে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবে, সেই সমস্ত শ্রেণী ও শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাই রণকৌশলের উদ্দেশ্য। এই কারণে রণকৌশল হল বিপ্লবের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের হাতিয়ার। বিপ্লবের বর্তমান স্তরে অংশগ্রহণে আগ্রহী যে কোন শক্তিকে বাদ দিয়ে রণকৌশল গ্রহণ করলে সেই কৌশল ব্যর্থ হয়; যতই শক্তিশালী ফ্রন্ট হোক না কেন তা বিভেদে বিদীর্ণ হয়ে প্রধান শত্রুকে আঘাত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আবার বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী বা বিপ্লবের শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রত্যেকটা শ্রেণীর স্বতন্ত্র ও বিশেষ ভূমিকাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হলে কর্মকৌশল বা রণকৌশলও ব্যর্থ হয়। বিপ্লবের বিশেষ স্তরে গণতান্ত্রিক উপাদানটা প্রধান অথবা শ্রেণীগত উপাদান বা সামাজিক বিরোধটা প্রধান তার সঠিক বিচারের উপর সঠিক রণকৌশল নির্ভরশীল। আবার বিপ্লবের মূল শক্তি এবং স্তম্ভের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে সহযোগী শক্তিকে প্রধান বিবেচনা করে রণকৌশল গ্রহণ করলে বিপ্লবের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বিপ্লবের শক্তি সমূহকে আর সমাবেশ করতে পারা যায় না। অন্যদিকে বিপ্লবের মূল শক্তি এবং স্তম্ভের (শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী) উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করেও সহযোগী বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মিত্র শক্তি, যারাও বিপ্লবের শক্তি, তাদের প্রতি হঠকারী ও মতান্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও রণকৌশল আপাতঃ দৃষ্টিতে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিভাত হলেও, সংকীর্ণতা-বাদে দুষ্ট হয়ে ব্যর্থ হয় এবং বিপ্লবের শক্তি সমূহের মধ্যে চরম বিভেদ সৃষ্টি

করে। এ ধরনের রণকৌশলের সঙ্গে বিপ্লবের স্তরেরও কোন সম্পর্ক থাকে না এবং রণনীতিরও সম্পর্ক থাকে না। যদি বিপ্লবে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে এমন সমস্ত শক্তিকে সমবেত করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে শ্রেণী সংগ্রামের অজুহাতে সহযোগীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা হয় তাহলে বিপ্লবের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হয় এবং বিপ্লবের শত্রুকেই সাহায্য করা হয়। অতএব বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটা শ্রেণীর সঠিক মূল্যায়ন রণকৌশল অবলম্বনের পক্ষে অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এককেটিয়া নয় এমন বুর্জোয়াদের বিরোধ, একচেটিয়া পুঁজি ও একচেটিয়া নয় এমন পুঁজির বিরোধ, বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পৃথকীকরণ, আবার শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরোধ, এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখলে, তবেই সেই রণকৌশল প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়, সংগ্রামী শ্রেণীগুলিকে সমবেত করা সম্ভব হয় এবং বিপ্লবের প্রধান শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। বিপ্লবের শক্তিসমূহের মধ্যে একচেটিয়া নয় অথচ বিপ্লবে অংশগ্রহণে আগ্রহী এমন বুর্জোয়াদের সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি এই রণকৌশলেরই অঙ্গীভূত।

মনে রাখা দরকার সোভিয়েত বিদ্বেষের শিকার হয়ে বা বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বিপ্লবের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না, এ পথে গণতন্ত্রের বিকাশও অসম্ভব এবং বিপ্লবের শক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্য সাধন প্রচেষ্টাও অবাস্তব। আমাদের বিপ্লব জাতীয় গণতান্ত্রিক হলেও তার আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে। বিপ্লবের শত্রুগুলি যেমন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত এবং নয়া উপনিবেশবাদের স্তম্ভ, তেমনই বিপ্লবী শক্তিগুলিও বিশ্ববিপ্লবী প্রবাহের অঙ্গীভূত। আমাদের বিপ্লব পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণেরই অংশ। অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র শক্তি, সহায়ক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে নির্ভরশীল বর্ম। অতএব সোভিয়েত বিদ্বেষী হয়ে বিপ্লবে সঠিক রণকৌশল গ্রহণ করা অসম্ভব।

মনে রাখা দরকার রণকৌশল চালাকির বিষয়বস্তু নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি যে রণকৌশল গ্রহণ করেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই রণকৌশলের পরিবর্তন হয়েছে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। লক্ষ্য

করা দরকার, ১৯৪৭ সালের আগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের রণকৌশল ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত স্বাধীনতাকামী শক্তিকে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে সমবেত করা। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশ করা তখন রণকৌশলের লক্ষ্য ছিল না।

বর্তমানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সীমিত থাকছে না। এই সংগ্রাম একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত এবং এর মধ্যে গণতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতা ক্রমেই পরিস্ফুট হচ্ছে। পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন, বিপ্লবের বর্তমান স্তরে অংশগ্রহণ করা যাদের বিষয়গত স্বার্থ তাদের বর্তমান ভূমিকার সঠিক বিশ্লেষণ এবং শত্রুর অবস্থান বিচারের ভিত্তিতে রণকৌশল নির্ধারিত হলে সেই রণকৌশল হয় সংগ্রামের হাতিয়ার।

পশ্চিমবঙ্গে বা সারা ভারতে যে ধরনের যুক্তফ্রন্টই হোক না কেন তাকে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সমীচীন।

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করার জন্য ১৭ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করেছিল। কংগ্রেস সরকারের ধারাবাহিক প্রগতিশীল পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠিত হয়েছিল এবং ১৭ দফা কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রগতিশীল পদক্ষেপকে আরও সম্প্রসারিত করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস ছিল জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার উত্থান ও পতনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত রূপ ও আচরণ

১৭ দফা কর্মসূচীভিত্তিক কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যকে অর্থাৎ পি. ডি. এ-কে কেউ কেউ বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতীক বলে ভুল করেছিলেন। তাঁরা ধরে নিলেন কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের ভিতরকার বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি এই হবে বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যের মূল শক্তি।

পি, ডি. এ-এর ধরনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপ পরিগ্রহ করবে। কেউ কেউ মনে করেন আলেন্দের ভূমিকা পালন না করলেও অন্ততঃ ইন্দিরা গান্ধী মিলরের প্রেসিডেন্ট নাসের-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

আবার কেউ কেউ এতদূর অগ্রসর না হলেও মনে করেছিলেন—পি.ডি.এ মূলও যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ সংগ্রামের হাতিয়ার। কেননা, ১৭ দফা কর্মসূচী ছিল সংগ্রামেরই কর্মসূচী। কংগ্রেস যখন সেই কর্মসূচী গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চায় তখন এই ফ্রন্ট সংগ্রামের হাতিয়ার ব্যতীত আর কী হতে পারে।

আবার কেউ ভেবেছিলেন পি. ডি. এ হল বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার সূচনা মাত্র। এই পি. ডি. এ-কে সম্প্রসারিত করে বাম ও গণ-তান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা এ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। ইতিহাসের গতিপথে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে যেতে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি প্রশ্নসমূহের উৎস সন্ধান না করলে সমস্যাবলীর পূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা কঠিন।

কংগ্রেসে ভাঙনের পর থেকে ১৯৭২ সালের নির্বাচন কালের মধ্যে, কংগ্রেস সরকার ধারাবাহিক ভাবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া, সামন্ততন্ত্র, একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংবিধান সংশোধন, রাজন্যবর্গের রাজকীয় সুবিধা বিলোপ, ব্যাংক ও অন্যান্য শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারত সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ কোন কোন মহলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে কংগ্রেস আর বুর্জোয়া সংগঠন নয়, কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁরা ভাবতে লাগলেন—কংগ্রেস এখন পেটিবুর্জোয়া সংগঠনে পরিণত হয়েছে, বিশেষত কংগ্রেসে ভাঙনের পরে নাকি একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও বৃহৎ বুর্জোয়ারা কংগ্রেস পরিত্যাগ করায় এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এক কথায়, এঁরা ধরে নিলেন যে কংগ্রেস যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল

পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তখন আর কংগ্রেস আগের কংগ্রেস নেই, এখন কংগ্রেস বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

এই ভ্রান্ত তত্ত্বকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে তার পরিণাম হয় কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যই হচ্ছে ভাবী কালের একমাত্র পথ, ভারতের ভবিষ্যৎ, নির্বাচনের মাধ্যমে এই পথ বলিষ্ঠরূপ ধারণ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে রূপান্তরিত হবে। অতএব তাঁদের মতে পি. ডি. এ হল যুক্ত-ফ্রন্ট এবং সংগ্রামের হাতিয়ার, কারণ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ১৭ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে।

অথচ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে—"There need be no illusion that congress rule is going to change its basic class character or abandon the capitalist path. "কংগ্রেস শাসন তার মূল শ্রেণী চরিত্র পরিবর্তন করবে বা পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করবে এই মোহ থাকা উচিত নয়।" অতএব কংগ্রেস বুর্জোয়া সংগঠনই আছে, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত হয় নি।

কংগ্রেসে ভেদ সৃষ্টি সম্পর্কে পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে—"After the split in the Congress there came into light two opposite wrong tendencies. There was the tendency to over-estimate the possibilities created by the split on the one hand and also was an underestimation of the same on the other. The question of left and democratic unity tends to be understood as almost something like CPI-Congress unity and this leads to the neglect of the work for winning over other left and democratic forces to the cause of unity and united struggles. In some cases our contacts with these forces have weakened. Also there is the tendency to underestimate the possibility of drawing the democratic forces within the Congress into such unity." (Documents of the 9th Congress of the Communist Party of India, Political Report. pp. 193-94)

"কংগ্রেস ভাঙনের পর দুটো বিপরীত ভুল প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এক-দিকে ভাঙনের ফলে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়ার প্রবণতা আর অন্যদিকে একে অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা। বাম ও গণতান্ত্রিক

ঐক্য বলতে যেন সি. পি. আই-কংগ্রেস ঐক্য বোঝাচ্ছে এমন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে আর এটা ঐক্য ও মিলিত সংগ্রামের লক্ষ্যে অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে জয় করে নেওয়ার কাজকে অবহেলা করার দিকে নিয়ে চলেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সব শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার কংগ্রেসের ভেতরের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐ ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসার সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখা হচ্ছে।" (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের দলিল—রাজনৈতিক রিপোর্ট, পৃঃ ১১৩-১৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস ভাঙনের পরে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দলে রূপান্তরিত হয় নি। একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়ারাও বিপ্লবী গণতন্ত্রীতে রূপান্তরিত হয় নি। মনে রাখা দরকার, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্য মানেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য—এই ধারণাটি একেবারে ভুল।

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা—যুক্তফ্রন্ট নয়

পি. ডি. এ যুক্তফ্রন্ট নয়, সংগ্রামের হাতিয়ারও নয়। কর্মসূচী ভিত্তিক ঐক্য হলেই সংগ্রামের হাতিয়ার হয় না। এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। কর্মসূচীর গুরুত্ব নিশ্চয় আছে কিন্তু দেখতে হবে কোন শ্রেণী সেই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে সক্ষম এবং মোর্চার মধ্যে সেই শ্রেণীর ক্ষমতা কতখানি। পি. ডি. এ-র মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগঠনের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি এবং গৃহীত কর্মসূচীর কোন কোন দাবি জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের অনুকূলে ছিল না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সঠিক ভাবে বলেছেন—"দুই শরিক, দুই উদ্দেশ্য: মোর্চার ১৭ দফা কর্মসূচী পশ্চিমবাংলার এক বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মনোভাবকে প্রতিফলিত করেছিল বলেই মোর্চার প্রার্থীরা নির্বাচনে আশাতীত সাফল্যলাভ করেছিল। নির্বাচনে এই সাফল্যলাভের পরে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার শক্তির উপর নির্ভর করে ১৭ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থের অবস্থান ক্রমাগত দুর্বল করে ব্যাপকতম বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভার

উদ্দেশ্য ছিল এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সি. পি. এম-কে মোকাবিলা করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। নির্বাচনে সংখ্যাধিক্য পেয়ে তাদের সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। এখন মোর্চা রক্ষা করা অথবা তাকে সক্রিয় করার বিশেষ কোন আগ্রহ তাদের আর রইল না।" (কালান্তর ২০শে জুলাই : মোর্চা রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সাধ্যায়ত্ত সব কিছু করেছিল—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পি. ডি. এ-র শরিক কংগ্রেস সংগঠনের প্রভাবশালী নেতৃত্ব ও মন্ত্রীত্বের প্রধান লক্ষ্য ছিল সি. পি. এম-কে মোকাবিলা করা—১৭ দফা কর্মসূচীকে কার্যকর করা মূল লক্ষ্য ছিল না। নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত রাখা। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে সারাভারত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী অংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলেছিল—মোর্চার মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন আন্দোলন করার কোন অধিকার দেওয়া চলবে না। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে যে বাংলা বন্ধ্ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের অমানুষিক দমননীতির কথা কেউ ভোলে নি, ভুলতে পারেনা।

পি ডি এ-র প্রধান শরিক কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃত্ব ও মন্ত্রীসভার লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। ১৭ দফা কর্মসূচী রূপায়নে তাঁদের অনীহা এবং কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে আপোষ করে চলার ঝোঁক তাঁদের প্রবল ছিল বলেই পি ডি এ সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বা যুক্তফ্রন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে নি। শ্রেণীস্বার্থ বিচারে এটাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসে ভাঙনের পর থেকে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল রূপটাই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল। নির্বাচনের পরবর্তীকালে, নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের পর তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা প্রধানত আত্মপ্রকাশ করছে। এটা হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বৈতরূপ। একটা ফ্রন্ট যখন জাতীয় বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় তখন সেই ফ্রন্ট জনস্বার্থে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। যুক্ত ফ্রন্টের লক্ষ্যই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান শত্রুদের পরাস্ত করে মূলগত সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করা।

আরও লক্ষ্য করা দরকার যে কংগ্রেসের ভিতরকার দক্ষিণপন্থী শক্তি পি ডি এ-কে তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবহার করছিল। তারা কেবল কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করে ক্ষান্ত থাকে নি, শেষ পর্যন্ত নিজের দলের মধ্যে প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধেও তারা আক্রমণ করতে দ্বিধা বোধ করে নি। এমন কি এরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চক্রান্ত করার অভিযোগে প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল।

অথচ পি ডি এ গঠন করার পূর্বে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ভার-সাম্যের রূপ ছিল ভিন্ন রকম। কংগ্রেস সরকারের ধারাবাহিক প্রগতিশীল পদক্ষেপের ফলে প্রগতিশীলেরা নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছিল, মধ্যপন্থীরা নির্বাচনে জেতার জন্য প্রগতিশীলদের সঙ্গী হয়েছিল, কংগ্রেস অনুগামী যুবশক্তিও একটা নতুন পরিবর্তনের আশায় কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থীরা এই শক্তির সরাসরি বিরোধিতা না করে সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তাদের প্রতিনিধিরা যাতে উপযুক্ত সংখ্যায় নির্বাচিত হতে পারে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে তারা ভুল করে নি।

নির্বাচনের পরে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত এবং ক্রমবর্ধমান হারে দক্ষিণমুখী ঝোঁক নেবার ফলে পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন হল। দক্ষিণপন্থীদের আক্রমনের কাছে মধ্যপন্থীরা আত্মসমর্পণ করল এবং প্রগতিশীলেরা অসহায় বোধ করতে লাগল। এই দক্ষিণপন্থীরা পি ডি এ কে একটি সাইন বোর্ডে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে কমিউনিস্ট পার্টিকে পি ডি এ-র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছে।

অতএব জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুলগ্ন পর্যন্ত পি ডি এ যুক্তফ্রন্ট বা শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারি নি। কোনো সময়েই এটি বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি হয়ে ওঠে নি! এবং এটা হওয়াটাও সম্ভব ছিল না।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি পি ডি এ থেকে সরে এলেও কি অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার পথ গ্রহণ করেছে? অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা সি পি এম এর পথ। যতদিন একচেটিয়া পুঁজিপতি নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা থাকবে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন থাকবে,

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে বিরোধ বজায় থাকবে, ততকাল কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার পথও উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু যে হেতু জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে এবং এটাই তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য—সেই কারণে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামের রণকৌশল অবলম্বন করবে। এই ঐক্য ও সংগ্রামের রণকৌশলই কংগ্রেসের প্রগতিকামীদের শ্রেণী সংগ্রামের পক্ষে নিয়ে আসার উপায়।

একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা নয়—বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এটাই হচ্ছে বামপন্থী বিচ্যুতি। এর অর্থ হচ্ছে এই বুর্জোয়ারা আর বিপ্লবের শক্তি নয়। এ ধরনের চিন্তাধারার পরিণাম হচ্ছে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি, যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অথচ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, তাদের নস্যাৎ করে দেওয়া, বিপ্লবে তাদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা। এর অর্থ হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের নীতিকে বর্জন করে কেবল বামপন্থী ঐক্যের নীতি অনুসরণ করা।

আবার কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যই হল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য—এমন সিদ্ধান্ত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে একচেটিয়া নয় এমন বুর্জোয়া শ্রেণীকে দ্বৈত চরিত্র সম্পন্ন মনে না করে একক চরিত্র সম্পন্ন সুস্থিত বিপ্লবী শক্তি বলে চিত্রিত করা হয়। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রীকে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করা অথবা শ্রেণীশক্তির বর্তমান ভারসাম্যকে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর অনুকূলে পরিবর্তন না করাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের ঐক্য হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তিকে বাদ দিয়ে যে ফ্রন্টই গঠন করা হোক না কেন তা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্তফ্রন্ট হতে পারে না, তা সংগ্রামের হাতিয়ারও হতে পারে না। অতএব বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামী প্রক্রিয়া।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের কর্মকৌশল

এই শ্রেণী ভিত্তির উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে বা এটাকে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলির অনুগামী জনতা এবং কংগ্রেস অনুগামী জনতার মধ্যে বিভেদ দূর করতেই হবে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট

পার্টি এবং বামপন্থী পার্টিগুলির দ্বারা পরিচালিত গণসংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। এর দ্বারা যেমন শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সম্ভব, তেমনই কৃষক সমাজের ঐক্যও সম্ভব। এই প্রক্রিয়াই কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের অঙ্গ সি. পি এম ও বামপন্থী পার্টির বিরোধিতা, আবার অপর দিকে বামপন্থী পার্টি সমূহের অঙ্গ কংগ্রেস বিরোধিতাকে ক্রমশই দুর্বল করবে এবং সংগ্রামের আবর্তে উভয় পক্ষের ব্যাধিকে নির্মূল করবে।

কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"শাসক কংগ্রেসের ভিতরের জনতা সমেত ব্যাপক জনতাকে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবী গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রে পরিবর্তন সমেত মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য যুক্ত গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম অগ্রসর করে নেওয়াই হবে নতুন পরিস্থিতিতে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের উদ্দেশ্য। শুধু বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করাই নয়, এই উদ্দেশ্যে শাসক কংগ্রেসের ভিতরের গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করা এবং যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলাকেও বাধ্যতামূলক করে।"

শাসক কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রগতিশীল শক্তি রয়েছে সেই শক্তি এখনও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত এবং শাসক শ্রেণীর দ্বারা অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথের প্রতি আস্থাবান, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক পথের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রী হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ধনতান্ত্রিক পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলেই কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল অংশকে ধনতান্ত্রিক পথের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের পক্ষে সমবেত করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে। এই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য অর্জন করার অর্থই হচ্ছে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির উন্মেষ সাধন করা। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সংগ্রাম যতই সাফল্য অর্জন করবে ততই কংগ্রেসের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল শক্তির বিপ্লবী গণতন্ত্রের দিকে পরিবর্তন সাধিত হতে থাকবে। কারণ ধনতান্ত্রিক পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্জন করে বিপ্লবী গণতন্ত্রী হওয়া যায় না। সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের মধ্যে যাদের প্রগতিশীল শক্তি বলে আমরা

চিহ্নিত করে থাকি তারা শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের সঙ্গে তাদের ঐক্যের বিষয়গত ভিত্তি। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে থাকায় এরা এখনও শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করলেও এদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ বিষয়গত নয়। এই বিরোধের প্রকৃতি হচ্ছে বিষয়ীগত। কিন্তু সরকারের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ হচ্ছে বিষয়গত অর্থাৎ বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ সম্পর্কের উপর এর ভিত্তি। সিপিএম মনে করে যেহেতু কংগ্রেসের প্রগতিশীলেরা এখনও শ্রেণী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নি বা বিরোধিতা করেছে, অতএব কংগ্রেসের মধ্যে কোন প্রগতিশীল শক্তি নেই। এই ধারণা অবৈজ্ঞানিক, কারণ বিপ্লবের বর্তমান স্তরে ঐতিহাসিক ভাবে এবং বিষয়গত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই কংগ্রেসী প্রগতিশীলেরা, যারা শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা হল বিপ্লবের শক্তি। অতএব শ্রেণীসংগ্রামে এখানে সেখানে এরা অংশ গ্রহণ করল কিনা—কেবল এই নিরিখ দিয়ে এদের ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকাকে বিচার করা যায় না।

কংগ্রেসের প্রগতিশীলদের ভূমিকাকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হল তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে একচেটিয়া পুঁজিপতি নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। এরাও বিপ্লবের শক্তি কিন্তু এরা হল শোষক শ্রেণী। আর যাদের আমরা সচরাচর কংগ্রেসী প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করে থাকি তারা শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তারা শোষিত। অতএব উভয়ের শ্রেণী অবস্থানে পার্থক্য আছে। উভয়েই বিপ্লবের শক্তি। কিন্তু একটার বিপ্লবী গণতন্ত্রীতে রূপান্তরিত হবার ঐতিহাসিক সম্ভাবনা প্রবল কারণ ধনতান্ত্রিক পথের বিরুদ্ধে এদের দাঁড়াতেই হবে। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা, যারাও বিপ্লবের শক্তি, ধনতান্ত্রিক পথ আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সেটি আঁকড়ে ধরেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বে। অতএব প্রগতিশীলতার নামে উভয়কে একবন্ধনীভুক্ত করা ভুল বা উভয়ের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য না দেখার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে।

বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যকে বাস্তব করে তুলতে হলে বামপন্থী শিবিরের মতান্ধ নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কোচিন কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"বামপন্থী ঐক্য ও তার ভূমিকাকে এই পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ীই দেখতে হবে। শুধু গণসংগ্রাম ও গণ-

আন্দোলন গড়ে তোলাই নয়' শাসক কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চাপ ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল কংগ্রেস সেবীদের এবং কংগ্রেস অনুগামী জনতাকে সংগ্রামী অবস্থানে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যও প্রয়োজন। কিন্তু কংগ্রেস বিরোধিতার কাছে আত্মসমর্পন করে অথবা বামপন্থী শিবিরের সংকীর্ণতাবাদ ও বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম না করে এই জাতীয় বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলা যায় না। এই ধরণের বিভেদপন্থীনীতি এক গভীর বিপদ সৃষ্টি করেছে—আগামীদিনে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।"

"বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামে বামপন্থী ঐক্যের ভূমিকাকে ছোট করে দেখলে চলবে না। কিন্তু সি. পি. এম ও এস-পির মত কয়েকটি বামপন্থী দল এ যাবৎ যে বামপন্থী সংকীর্ণতার নীতি অনুসরণ করে এসেছে—তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।"

এই সংগ্রাম অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করলে একটা সংকীর্ণ "বামপন্থী" ফ্রন্টের মধ্যে এই পার্টিগুলি আবদ্ধ থাকবে এবং এই পথে হঠকারিতারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। একচেটিয়া পুঁজিপতি নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়া এবং কংগ্রেসী প্রগতিশীলের ভূমিকাকে অস্বীকার করলে হঠকারী হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকে না। কংগ্রেসের যে এখনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা আছে তাকে অস্বীকার করার থেকে অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতা জন্মলাভ করে।

উপরন্তু এই বামপন্থী শিবিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সোভিয়েত বিরোধিতা। সোভিয়েত বিরোধিতা পোষন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না, দেশের সার্বভৌমত্বকে নিরাপদ করা যায় না এই বিরোধিতার ফলে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে বিভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে কোন দেশেই সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা যায় না —সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত' দূরের কথা। হঠকারী নীতির জন্য সি. পি. এম. যেমন বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন, তেমনই বিশ্বের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অনুরূপ ভাবে দেশের অন্য ও একই

অবস্থা। দেশের অভ্যন্তরে বিরাট গণতান্ত্রিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন 'বামপন্থা' শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না এবং শ্রমিক-কৃষক ঐক্যও গড়ে তুলতে পারে না। এই 'বামপন্থা' গণতান্ত্রিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আরও উগ্রতার শিকার হয়। ফলে বামপন্থী পার্টিগুলি নিজেদের মধ্যে স্থায়ী ঐক্যও গড়ে তুলতে পারে না। এই উগ্রতাই আবার সাম্রাজ্যবাদের হাতে বিভেদের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই বামপন্থী পার্টিগুলি আবার বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যেরই উপাদান।

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা

এই বামপন্থীরা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের হঠকারিতা ও ভেদপন্থা পরিত্যাগ করবে না, তেমনই কংগ্রেসের প্রগতিশীল শক্তিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবী গণতন্ত্রীতে পরিণত হবে না। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এটা কেবল মাত্র বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য নয়, যুগের বৈশিষ্ট্য বিচার করে বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হয়। এই ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টির একা চলার ভূমিকা নয়। মতাদর্শগত দিক থেকেও এটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা। এই ভূমিকা মূর্ত হয়ে ওঠে বিপ্লবের স্তর, রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ের মধ্যে। কেবল তা নয়, বিপ্লবের মূল শ্রেণী শক্তি ও তাদের মৈত্রী গড়ে তোলার সংগ্রামের মাধ্যমে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিপ্লবের প্রধান শত্রুকে কোন রণকৌশলের মাধ্যমে আক্রমণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী শক্তি সমাবেশের মাধ্যমে, শত্রুপক্ষের এবং মিত্রশক্তিরও বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে। মতাদর্শগত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে বাদ দিলে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন উদ্যোগ ও ভূমিকা থাকলে বাম ও দক্ষিনপন্থী কর্মকৌশল ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চলে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কে মোহ থাকলে বা বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী বিপ্লবে অংশগ্রহনে আগ্রহী বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে লঘু করে দেখলে বা এ সব বুর্জোয়ারা বিপ্লবের শক্তি নয়—একথা মনে করলে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা পালন করা যায় না অথবা দক্ষিন ও বামপন্থীদের চাপে পড়ে

কোন্ পক্ষের উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন তার পথ খুঁজতে হয়। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ছোট থাকে, শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে তাদের প্রভাব যখন সীমিত থাকে, মতাদর্শগত দিক থেকে যখন দুর্বল থাকে এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা যখন চিন্তায় ও প্রয়োগে একটা মামুলী ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন কমিউনিস্ট পার্টির একশিলা ঐক্য ব্যাহত হয়। তখন কমিউনিস্ট পার্টি আর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনের অর্থ হচ্ছে শ্রেণী সমবায় সংগঠিত করে, সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবের নেতৃত্ব গড়ে তোলা। অতএব নেতৃত্ব যেমন বিজ্ঞান ও কলা, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করা সেই নেতৃত্ব বিজ্ঞান ও কলা-র অঙ্গীভূত। কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকা একটা সামগ্রিক ধারণা। পূর্বেই বলেছি এটা একলা চলার পথ নয় বা শহীদ মিনারে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে এ সভা করাও নয়। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক জগতে কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্ত নিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হবে নতুবা বিপ্লবের শক্তিগুলিকে সঠিকভাবে এবং সঠিক পথে সংগঠিত ও পরিচালিত করা অসম্ভব।

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা কেবলমাত্র এক একটা দেশের জাতীয় পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এটা প্রধানত: প্রভাবিত ও পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিশ্ববিপ্লবের প্রক্রিয়া থেকে এবং এযুগের বৈশিষ্ট্য থেকে। যখন বলা হয় যে এ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, তখন এর অর্থ এই নয় পুঁজিবাদ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিলীন হয়ে যাবে এবং সমাজতন্ত্রও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠবে। অতএব পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার গুরুত্ব অসাধারণ। পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে যেমন সামগ্রিকভাবে নিজ দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ববিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে, তাদের পক্ষ কালে অবলম্বিত ধূর্ত কৌশল, বিভ্রান্তকারী মতাদর্শ, এবং সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিত্যনতুন ও নিপুন অস্ত্রবানকে খণ্ড বিখণ্ডিত করে দিতে হবে। কোন একটা কারখানার শ্রমিক বা কোন একটা অঞ্চলে কৃষকদের

অর্থনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করাকেও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বোঝায় না। কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা একটা সামগ্রিক ধারনা এবং নেতৃত্ব বিজ্ঞানের অংশ। এটা অর্থনৈতিক দাবির আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ নয় কিন্তু নিশ্চিতভাবে অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। কারণ অর্থনীতিবাদ বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার পথে অন্তরায়, বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতি আনুগত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখে এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধ্যান ধারণাকে প্রতিহত করে।

কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হলে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে হলে পার্টিকে নিশ্চয় গণপার্টিতে পরিণত করতে হবে। এটা একটা অপরিহার্য্য শর্ত। অতএব স্বাধীন ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজও সক্রিয় ও সচেতনভাবে চালাতে হবে এবং পার্টিতে শ্রমিক ও গরীব কৃষকের থেকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নেতৃত্বে উন্নীত করতে হবে। কেবল সংখ্যাতত্ত্বের উপর গণ পার্টি নির্ভরশীল নয়। তাদের মার্কসবাদ ও লেনিনবাদে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তুলতে হবে, বিপ্লবের স্তর, রণনীতি, রণকৌশল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিভিন্নমুখী আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং বৈপ্লবিক কর্মে উদ্দীপিত করে তুলতে হবে। এই কাজ খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা বিপ্লবের নেতৃত্ব বিজ্ঞান ও কলারই অন্তীভূত।

পিপল্‌স লিট্‌ল থিয়েটার অভিনীত : "টোটা"

"টোটা" : ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের নাট্যরূপ : খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আকর্ষণের কারণ ১৮৫৭ সালের ঘটনাটি ভারতের ইতিহাসের এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। এটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়ও বটে। হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহটি তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত করেছিল ভারতের প্রধান সমস্যাটি : এদেশের ও অন্যদেশের মানুষকে অবহিত করেছিল যে ভারত পরাধীন ; পরাধীনতা থেকে মুক্তি, স্বাধীনতা অর্জন : ভারতের সামনে ছিল সর্ব প্রধান প্রশ্ন। তদানীন্তন কালের অপরিণত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের যে নজির তুলে ধরেছিলেন তা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়। তখনকার দিনের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব-প্রতিনিধিদেরও এই বিদ্রোহ একই কারণে নাড়া দিয়েছিল ভীষণভাবে। নাড়া দিয়েছিল ইংলণ্ডের কবি আর্নেস্ট জোন্সকে। নাড়া দিয়েছিল রাশিয়ার মণীষী দস্তয়েভস্কিকে। নাড়া দিয়েছিল মহামণীষী কার্ল মার্কসকে, যিনি সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ না বলে 'জাতীয় বিদ্রোহ' বলে চিহ্নিত করেন, যিনি এর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চরিত্রটিকে বিশেষ জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন।

এই ধরনের এক অতি স্মরণীয় ঘটনাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে এবং সেটি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দেখানো হচ্ছে জেনে খুসী হয়েছিলাম। আরও আশা হয়েছিল এই খবর পেয়ে যে এই ঘটনার নাট্যরূপ দিয়েছেন, এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন পশ্চিমবাংলার একজন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীউৎপল দত্ত।

এই কারণে উৎসুক হয়ে টিকিট কিনলাম। আমার এক ইতিহাসরসিক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে সিটে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু নাটকটি

দেখার পর একেবারে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। শুধু নৈরাশ্য কেন, বিরক্তিতে মন ভরে উঠল।

যা দেখলাম তা ১৮৫৭ সালের ঘটনার চিত্ররূপ নয়। এই ঘটনার সত্যিই এক বিকৃতরূপ। দেখলাম ১৮৫৭ সালের ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে নাট্যকারের কল্পনাবিলাস। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নাট্যকার নিজের পছন্দমত কয়েকটি বিষয় বেছে নিয়েছেন। বিদ্রোহের তথ্যনিষ্ঠ রূপটি তুলে ধরার তিনি আদৌ চেষ্টা করেন নি।

নাট্যকার নিজের ক্ষেত্রের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি ঐতিহাসিক হবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। তিনি বিদ্রোহের একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন; এই ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহের তিনি একটি বিকৃত কল্পচিত্র অঙ্কিত করেছেন। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন এটি বিদ্রোহ নয়, প্রতিবিপ্লব; এটি ছিল রাজা-রাজরা, আমীর-ওমরাহদের তরফ থেকে ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র মাত্র। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সিপাইদের তারা ব্যবহার করেছিল তাদের ক্ষমতা দখলের মাধ্যম হিসাবে। জনৈক সিপাই-এর মুখ দিয়ে তিনি এই কথাই বলার চেষ্টা করেছেন যে এ লড়াই আমীর ওমরাহদের লড়াই, আমাদের শত্রু ইংরেজ নয়, ঐ আমীর ওমরাহরাই আমাদের শত্রু।

এইভাবে কথাকথিত এক "শ্রেণীসংগ্রাম"-এর আওয়াজ তুলে তিনি আমাদের জাতীয় বিদ্রোহের এক গৌরবময় অধ্যায়কে মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ভাষ্যকারেরা চিরদিন এই বিদ্রোহের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্যটি অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলতে চান—এটি ছিল "সিপাহী বিদ্রোহ" মাত্র, অর্থাৎ দেশপ্রেম বর্জিত, স্বার্থান্বেষী সিপাইদের এ ছিল অসন্তোষ প্রকাশের এক ব্যর্থ চেষ্টা, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির অসন্তোষ এর মধ্যে আদৌ প্রতিফলিত হয় নি। এইভাবে তাঁরা ইংরেজ শাসনের সাফাই গেয়েছেন। কার্যত, শ্রীউৎপল দত্ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি সিপাইদের স্বার্থ ও বিদ্রোহী আমীর-ওমরাহদের স্বার্থ ছিল পরস্পর-বিরোধী—এই যুক্তি খাড়া করে ১৮৫৭ সালের ঘটনার জাতীয় চরিত্রটি বিকৃত করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের এই বিকৃত নাট্যরূপ পরিবেশন করে তিনি কাদের খুশী করছেন আমি জানি না। বর্তমানে এক শ্রেণীর নাট্যকার ও নাট্য গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন একটি ফ্যাশন দেখা দিয়েছে। অতি বিপ্লবীর পোশাক পরে, তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের বুলি উচ্চারণ করে, তাঁরা আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যটি ক্ষুণ্ন করতে চান। তাঁরা জাতীয় আন্দোলনকে "উচ্চশ্রেণীর আন্দোলন" বলে চিহ্নিত করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি প্রচার করতে সচেষ্ট।

আমাদের দেশের সব নাট্যকার বা সব নাট্য গোষ্ঠীই যে ইতিহাস নিয়ে এমনি করে ছিনিমিনি খেলছেন তা নয়। কিছুদিন আগে মিনার্ভা থিয়েটারে আমার একটি নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নাটকটির নাম ছিল "শতেরো শো নিরানব্বুই"। এটি ছিল ১৭৯৯ সালে জঙ্গল মহলে যে 'চোয়ার বিদ্রোহ' (পাইক ও দিগবরদের বিদ্রোহ) সংগঠিত হয়েছিল তারই নাট্যরূপ। নাট্যকার এমন ভাবে কাহিনীটি তুলে ধরেছেন যাতে বিদ্রোহের চরিত্রটি সঠিকভাবে ফুটে ওঠে। বিদ্রোহের গৌরবময় দিকটি তিনি সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন, যদিও কোথাও তিনি এর দুর্বলতাগুলি ঢেকে রেখে এর ওপর 'আধুনিকতা' চাপাবার চেষ্টা করেন নি। নাটকটি খুবই উপভোগ্য এবং শিক্ষণীয়ও বটে।

এই প্রসঙ্গে একটি পেশাদার যাত্রা গোষ্ঠীর দ্বারা অভিনীত "কার্ল মার্কস" দেখার কথাও মনে পড়ে ('লেনিন' দেখার সৌভাগ্য আমার এখনও হয় নি)। এই নাটকটিতে কার্ল মার্কসকে যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে নাট্যকার বিশেষ প্রশংসা পাবার যোগ্য। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, এতে কার্ল মার্কস ও প্রথম আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ আরও গুরুত্ব সহকারে দেখালে ভালো হত। এই রকমের আরও অনেক সমালোচনা হয়তো তোলা যায়। কিন্তু এখানে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা নাট্যকার কার্ল মার্কসের ব্যক্তিত্বটি সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন কি না। আমার কাছে মনে হয়েছে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও "কার্ল মার্কস" মার্কস চরিত্রের একটি মোটামুটি সার্থক রূপায়ন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের সৌখীন নাট্য গোষ্ঠীগুলি এমন কি, পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীগুলি পর্যন্ত জীবনধর্মী, প্রগতিশীল বিষয়গুলিকে

নাটকের বিষয়ীভূত করার চেষ্টা করছেন। নাট্য আন্দোলনের এই দিক পরিবর্তন অভিনন্দনযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমাদের নাট্য আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান সুস্থ চেতনার পাশাপাশি পি. এল. টি বা এই মনোভাবাপন্ন নাট্যগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপকে এক অসুস্থ চিন্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে ইতিহাসকে ব্যবহার করার, তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের আওয়াজ তুলে জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যটি মসীলিপ্ত করার এই প্রচেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নরহরি কবিরাজ

পুস্তক পরিচয়

প্রারম্ভিক মার্ক্সীয় দর্শন (দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ)—সত্য ঘোষাল
পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য ২·০০ টাকা।

গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখেছেন—"যারা সমাজের ও বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তন চান তাঁদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত নন, তাঁদের জন্য সংক্ষেপে দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উদ্ভব ও তার মূল কথা কটি এখানে সহজভাবে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।"

ঠিক এই কারণেই বইটির বিশেষ মূল্য আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। আজকের দিনে, দুনিয়ার সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার আকর্ষণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে অল্প-শিক্ষিত শ্রমিক, কৃষক, এমন কি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ সমাজতন্ত্রের আদর্শের দিকে ঝুঁকছে। অথচ সমাজতন্ত্র বলতে ঠিক কি বোঝায় তা তাঁদের ধারনা নেই। আজ একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন পুস্তক-পুস্তিকার যা তাদের কৌতূহল মেটাতে পারে। সেই দিক থেকে বিচার করলে এই বইটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।

এই বইখানিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিচয় পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে প্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বস্তুবাদী দর্শনের বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস অতি সহজ ভঙ্গীতে তুলে ধরা হয়েছে। মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গে ভারতের বস্তুবাদী দর্শনের ঐতিহ্যটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের কয়েকটি অধ্যায়ে মার্কসীয় দর্শন, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলি বেশ সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই রকমের একটি দুরূহ বিষয় লেখক যেভাবে সাবলীল ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। যাদের জন্যে লেখা তারা যে এই বই পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ধরনের একখানি বইয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পুস্তক পরিচয়

লেখকের কাছে অনুরোধ আগামী সংস্করণে বইটির আরও পরিবর্ধন করুন, বিশেষ করে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নীতিগুলি আরও বিশদভাবে তুলে ধরা ও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী ঐতিহ্য নিয়ে একটি ছোট অধ্যায় যোগ করলে বইটির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, বইখানির ছাপা আরও ভালো হওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতিকালে আমাদের দেশে মার্কসীয় শিক্ষা অভিযান সংগঠিত করার চেষ্টা চলছে। সেই অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে সব সময়েই আমরা অনুভব করি যে সহজ ভাষায় লিখিত, সহজ বোধ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রয়োজন। এই বইখানি একটু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হলে সেই অভাব পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

নরহরি কবিরাজ

মূল্যায়ন নিয়মিত পেতে হলে :

ডাকযোগে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়াই ভালো।

চাঁদার হার—বার্ষিক ৯ টাকা।

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক হ'লে বিশেষ সংখ্যার জন্য বাড়তি দাম লাগে না।

মূল্যায়ন-এর এজেন্ট হতে গেলে—

: কমপক্ষে পাঁচ কপি পত্রিকা নিতে হবে।

: পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে।

: ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন।

: এজেন্সী কমিশন দেওয়া হবে শতকরা ২৫% ।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন

১০, বতেল রোড,

কলিকাতা-১৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

MULYAYAN—Vol. X No. 2
Asad Shravana, 1381 B.S.)
Regd. No.—W.B./SC-1
R. N. 13785/65

CALCUTTA
SENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

SEP 1974

দেশবাসীর জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধ
তৈরি করা—৩৭ বছর ধরে এই আমাদের লক্ষ্য

দেশের সামাজিক লক্ষ্য পূরণে এই আমাদের প্রাথমিক কাজ।
আমাদের জন্ম যে শুধু ভারতে, তাই নয়
মনে-প্রাণেও আমরা ষোল আনা ভারতীয়।

অসুখ-বিসুখ ঠেকিয়ে দেশবাসী যাতে নিরোগ জীবনযাপন করতে পারেন, সেজন্যে আমরা বানিয়ে চলেছি নানা ধরনের ওষুধ। আর নিতানতুন গবেষণার মাধ্যমে সমানে করে চলেছি রোগ নিরাময়ের কাজ।

আজ আমরা অনেক রকমের ওষুধ, ইঞ্জেকসন আর রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারক।
আমাদের প্রচেষ্টা যে বিফলে যায়নি,
গত সাঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের
শ্রীবৃদ্ধির খতিয়ান দেখলেই
তা বোঝা যাবে।
নিজের দেশবাসীর জন্যে কিছু
করতে পারা···এর চেয়ে
আনন্দের আর কী
হতে পারে!

ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস
কাজ করে চলেছে
আপনার জন্যে

EIPC/PR-9 BEN

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

মূল্যায়ন

★ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম : এ মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য

★ সি পি এম কোন পথে

★ কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বলতে কি বোঝায়

★ পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ

★ লালন ফকির

★ বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও আলকাপ

কার্তিক-অগ্রহায়ণ
১৩৮১

দেড় টাকা

মুখোমুখি একশৃঙ্গ গণ্ডার দেখতে হলে চলে আসুন

জলদাপাড়া

তোর্ষা নদীর তীরে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে দেখতে পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য একশৃঙ্গ গণ্ডার। শুধু গণ্ডারই নয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখবেন আরো কত কী। যেমন বাইসন, বাঘ, বন-মোরগ, বন্যবরাহ, বিভিন্ন ধরনের হরিণ এবং অন্যান্য জীবজন্তু।

শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরের এই অভয়ারণ্যে আপনি ট্রেনে বা মোটরে—যেমন খুশি যেতে পারেন। উপরন্তু, বাগডোগরা বিমানবন্দরও খুব বেশী দূরে নয়—মাত্র ৩ ঘণ্টার রাস্তা।

লজের সামনেই পোষা হাতি আপনাকে শুঁড় তুলে সাদর অভিবাদন জানাবে আর নিয়ে যাবে অরণ্য অভিযানে। অভয়ারণ্যের ভেতরেই সুসজ্জিত হলং ফরেস্ট লজে পাবেন আরামদায়ক আতিথ্য।

রিজার্ভেশনের জন্যে যোগাযোগ করুন :	ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার : কুচবিহার ডিভিশন, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ ফোন : ২৪৭ অথবা
ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ইউটিলাইজেশন ডিভিশন : ৮ লাটনস্ রেঞ্জ, কলিকাতা-১ ফোন : ২২-২৭৭৪ অথবা	ডেপুটি ডাইরেক্টর অব ট্যুরিজম অজিত ম্যানসনস্, নেহরু রোড, দার্জিলিং ফোন : ৫০ গ্রাম : DARTOUR

PCI/(TB 21/A)

ধন্যবাদী (পর্যটন) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

এক কদম আগে, দু'কদম পিছে—ভি. আই. লেনিন — দাম ৫·০০ টাকা
(নতুন করে বাংলা তর্জমা ও নোটসহ)

সাধারণ-সম্প্রদায়িকতার ধাপ্পাবাজি—
—গাস্ হল্ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক) — দাম ১·০০ টাকা

ধর্ম ও মার্কসবাদ—অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র — দাম ২·৫০ টাকা

স্মৃতি বিস্মৃতি দুঃস্মৃতি—পাবলো নেরুদা — দাম ১·০০ টাকা

আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার — দাম ১০·০০ টা

রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী—চিন্মোহন সেহানবীশ — দাম ১৮·০০ টাকা

★

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

With best compliments from

NAVA BHARAT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

NILHAT HOUSE ANNEXE

11 R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-1

Regd. Office :

"NAVA BHARAT HOUSE"
6-3-654 SOMAJIGUDA
HYDERABAD-500004.

Other Branches :

BOMBAY • COCHIN DELHI
MADRAS • GUNTUR • AGRA
MORADABAD • BANGALORE

With best compliments from :

BENGAL POTTERIES LIMITED

Makers of Fine Crockeries & Insulators

PROBLEMS OF NATIONAL LIBERATION

a journal of theoretical studies and research

In the 1st Issue

- ☐ Growth of Nepali Nationality
- ☐ Santhal Agitation on Rent—1861-81
- ☐ Structural Changes in Indian Agriculture
- ☐ Tanzania's Road to Socialism
- ☐ Boris Ponomaryov on *Communist Manifesto*

Discussion :

Non-Capitalist Path in India

Price Rs. 3/-

Available at :

Manisha Granthalaya (P.) Limited

4/3B, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-12

মূল্যায়ন

১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
কার্তিক-অগ্রহায়ণ
১৩৮১

সূচী

পৃষ্ঠা

লালন ফকির / গিরিন্দ্রনাথ দাস ১

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট :
আজকের দিনের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ সুকুমার মিত্র

বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও 'আলকাপ' / মানিক সরকার

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানসমূহ এবং
আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে
সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা / সি. রাজেশ্বর রাও
(অনুবাদ : অরণি ইন্দ্র)

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে সি পি এম কোন পক্ষে ? / নরহরি কবিরাজ ৪৮

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বলতে কি বোঝায় ? / রণধীর দাশগুপ্ত ৬২

আলোচনা : আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের
বিকৃত ব্যাখ্যা বন্ধ হোক / প্রভাত কুমার কামিলা

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এ মুহূর্তের প্রধান কাজ

বিয়োগপঞ্জী

রজনী পাম দত্ত

নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

প্রচ্ছদ : অমূল্য দাস

সম্পাদক :
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
নরহরি কবিরাজ

সবিতা রায় কর্তৃক ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত।

মূল্যায়ন নিয়মিত পেতে হলে :

ডাকযোগে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়াই ভালো

চাঁদার হার— বার্ষিক ৯ টাকা।

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক হ'লে বিশেষ সংখ্যার জন্য বাড়তি দাম লাগে না।

মূল্যায়ন-এর এজেন্ট হতে গেলে—

: কমপক্ষে পাঁচ কপি পত্রিকা নিতে হবে।

: পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে।

: ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন।

: এজেন্সী কমিশন দেওয়া হবে শতকরা ২৫%

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন

১০, বণ্ডেল রোড,

কলিকাতা-১৯

লালন ফকির

শ্রী গিরীন্দ্রনাথ দাস

লালন ফকির। লালন শাহ্। লালন ফকিরের নাম পল্লী বাংলার কে না জানে। পল্লী বাংলার কত লোকের গলায় যে লালন ফকিরের বাউল গান আজো ধ্বনিত হয় তার হিসাব কে রাখে। লালনের বাউল গান যে একবার শুনেছে, সে গানের সুর কানের মধ্য দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। গানের কথাগুলিই বা কিরূপ মনোমোহিনী। একটি নমুনা দিচ্ছি :—

ভবপারে যাওয়া আমার হ'ল না।
শুভযোগে দিলাম পাড়ি
আমার অসভ্য ভাব গেল না ॥
যখন আমি তরীর' পরে যাই,
সেই খানেতে এক রমণী
আমি দেখতে পাই,
এবার আর বাঁচাবাঁচি নাই
তাই আমি শঙ্কায় মরে যাই।
আমি কি কব রমনীর কথা
সে বেটির রূপের নাই তুলনা ॥
সে বেটির কোলে এক ছেলে
এল এক সন্ন্যাসী চলে
রমণী ঝাঁপ দিল জলে
গোসাঁই আমার ছেলে ধর
আহ্লাদের ছেলে আমার যেন কাঁদে না ॥॥
সেই যে ছেলে কাঁদে উভরায়
সন্ন্যাসী হস্ত দিল গায়
তবু তার হস্ত ধরে খায়,

খেতে খেতে খেয়ে ফেল্‌লে
দেয় সমুদয়।
অধীন লালন ভেবে বলে
এরূপ তিনজন কোন জনা
ভবপারে যাওয়া, আমার হল না ॥

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিনাকুণ্ডু থানার হরিষপুর নামক গ্রামে লালন ফকিরের জন্ম। তাঁর পিতার নাম দরীবুল্লাহ দেওয়ান, মাতার নাম আমিনা খাতুন, দাদার নাম গোলাম কাদির, গুরুর নাম পীর সিরাজ শাহ, পুত্রের নাম যথাক্রমে কলম, আলম, লালন ও চলম্‌।

লালন ফকিরের জন্ম ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের কোন এক তারিখে। আব্দুল ওয়ালী সাহেব হরিষপুর গ্রামের নিকটবর্তী সাব রেজিষ্টারী অফিসের সাব-রেজিষ্টার ছিলেন। লালন ফকিরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উক্ত অফিসে তিনি যোগদান করেন। সেই সময়ে জনৈক কারামতুল্লাহ শাহ্‌ লিখিত 'মনোরঞ্জন উচিত কথা' শীর্ষক বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করে আব্দুল ওয়ালীসাহেব যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে বলা হয়েছে যে, তার দশ বছর (আনুমানিক) আগে অর্থাৎ ১৮৯৮—১০ = ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লালন ফকিরের মৃত্যু হয়েছিল।

যশোহর জেলার আব্দুল লতিফ সাহেব লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু শাহের একখানি কলমী পুঁথিতে লালনের জন্ম-মৃত্যুর যে তারিখ উল্লেখ করেছেন, তা এইরূপ :—

জন্ম—১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৭২ সাল।
মৃত্যু—১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৮৮ সাল।

একমাত্র আপান শিষ্য দুদ্দু শাহের নিকট লালন শাহ্‌ আত্মপরিচয় দিয়ে যান বলে প্রকাশ। সুতরাং মতান্তরে উক্ত আনুমানিক সময়ই তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। অর্থাৎ হিতকরীতে প্রকাশিত মৃত্যুর তারিখ মোটামুটি দুই বছরের ব্যবধান সৃষ্টি করে। কেহ কেহ লালনের মৃত্যু তারিখ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর বলে উল্লেখ করেছেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। আবার কারো মতে তিনি ১২৫ বছর বেঁচে ছিলেন।

লালন ফকিরের বাল্য-জীবন বা শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে

পারা যায় না। তবু এটুকু জানা যায় যে তিনি অল্প বয়সেই মাতা-পিতাকে হারান। নিজে বয়সে যথেষ্ট ছোট হওয়ায় অগত্যা বড় ভাই-এর সংসারে লালিত-পালিত হতে থাকেন। ভাইদের সংসার তেমন সচ্ছল ছিল না, সুতরাং বেশ কষ্টেই তিনি দিন কাটান। লেখাপড়া শেখার তেমন কোন সুযোগ তাঁর হয় নি। ছোটবেলায় মাঠে মাঠে গরু চরানোই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল।

এমনি গরু চরানো কালে তাঁর যোগাযোগ হয় সিরাজ নামক পাল্কীবাহক এক বেহারার সাথে। সিরাজ বেহারার বাড়ীও ছিল উক্ত হরিষপুর গ্রামে। এই সিরাজ বেহারা সাধক প্রকৃতির ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে পীর সিরাজ শাহ্ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমান্বয়ে লালন ফকির পীর সিরাজ শাহের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বে দীক্ষা নেন। তাঁদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং লালন ফকির এমন গভীর ভাবে তাঁর অনুগত হন যে তিনি গুরুর পেশা পাল্কী বহন করাকে নিজের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, পীর সিরাজ শাহ্ ছিলেন ভারত বিখ্যাত সুফী পীর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যধারার নবম স্থানীয় শিষ্য।

লালন শাহ্ ছিলেন তাত্ত্বিক কবি। গান হল তাঁর তত্ত্ব প্রচারের বাহন মাত্র। কাব্য সৃষ্টি তাঁর মূল লক্ষ্য নয়। তাত্ত্বিক হলেও তিনি জীবন ও জগতের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জীবন রসের রসিক। নীরস তত্ত্বকথাও তাঁর প্রাণের স্পর্শে সরস সঙ্গীতের অমিয় ধারায় পর্যবসিত হয়েছে। নীরস কাষ্ঠখণ্ড সেতারের উপর করাঙ্গুলি পীড়ন করে সুরের কলসী ভরে নেওয়া আর কি।

পারসী সাহিত্যের অমর কাব্য-কোকিল রুমী, জামী, খইয়াম প্রমুখ যেমন এককালে অমর প্রেমের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন, সুফী লালন ফকির বুঝি সেই লুপ্ত ধারাটি উনিশ শতকের বাঙলার মাটিতে পুনরায় প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের রুমী ছিলেন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

লালন ফকির বা তাঁর অনুসারী ফকিরদের গানকে অনেকে বাউল সংগীত বলেছেন। বাউল গান মূলতঃ 'সিমা' নামক সংগীতের বিকৃত নাম বা বিকল্প নাম বলা যায়। নিযামী—চিশ্‌তী ফকির, যাঁদেরকে বলা হয় 'সিল-সিলা', তাঁরা সারা ভারতে গজল গানের ধারা চালু করেছিলেন। গান ছিল তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ বিশেষ। বৈষ্ণব, শক্তি প্রভৃতি অ-মুসলিম সাধকগণ বাউল

গানে আকৃষ্ট হয়ে এই গানকে ধর্ম সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাই কেউ কেউ এইরূপ বাউল বা বিকৃত 'সিমা' সংগীতকে বাউল গান না বলে ভাবগান বা মারেফতী গান নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে লালন ফকিরের গান হল বিশুদ্ধ সুফীবাদ অনুসারী গান।

বাউলেরা আসলে সুফী। তাঁরা নিজেদেরকে যখন বাউল বলেছেন তখন এও বলেছেন যে তাঁরা 'তালিবুল মাওলা'। তালিব অর্থে সন্ধানী। তালিবুল মাওলা অর্থে খুদাসন্ধানী। লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু শাহের একটি গানে তা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন এই সুফীবাদের আদি দিশারী ছিলেন হজরত দাতা গঞ্জ-ই-বশখ মুহম্মদ বিন হাসান (১০৭২ খৃষ্টাব্দে)। গঞ্জ-ই-বশখ মুহম্মদের শিষ্য আবুল হাসান আলীর 'কাশফুল মাহ্জুব' অর্থাৎ আবরণ উন্মোচন গ্রন্থখানি এদেশে সুফীবাদ প্রচারের আদি গ্রন্থ এবং দাতা—গঞ্জ-ইবশখই এদেশে হিন্দু-মুসলিম সুফী বা মরমিয়াদের আদি গুরু।

এঁদের সাধনা কোরান-হাদীসোক্ত ইসলামের পুরাপুরি অনুসারী না হলেও তার শিক্ষার পরিপন্থীও নয়। এঁরা ইসলামী সুফিবাদেরই অনুসারী। সুফীদের মতই তারা বিশ্বাস করেন আল্লাহ তায়ালাই সর্বশক্তিমান বটে তবে তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্তও। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, সবকিছুই তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লালন শাহী ফকিরদের সঙ্গে লালশশী বা লালচাঁদ অর্থাৎ কর্তাভজাদের আদি গুরু সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

তখন এদেশে বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগ। সাম্রাজ্য, ধনসম্পদ, মান-মর্যাদা হারিয়ে মুসলিমগণ তখন দিশেহারা। এই অধঃপতন রোধের জন্যই ফরায়েজী-ওয়াহাবী তথা শুদ্ধি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল। কবি বুরহান উল্লাহ্ রাজনৈতিক দিক বাদ দিয়ে প্রকাশ্যে এই আন্দোলনের মর্মকথা কাব্যের মারফতে প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। লালন শাহ্ও রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করেন নি। তবে ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে তিনি বরদাস্ত করেন নি। ফলে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মোল্লাদের হাতে একদিকে যেমন তাঁকে নির্যাতিত হতে হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সংস্কারকামী ও শাস্ত্রীয় শাসনের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী ফারায়েজী—ওয়াহাবীদের বিষ-নজরে পড়তে হয়েছে।

লালন-ফকির ও তাঁর সম্প্রদায়কে সাধারণতঃ কেউ কেউ বে-শরা বা ভণ্ড ফকির বলে থাকেন। অথচ তিনি ছিলেন ভণ্ড ফকিরদের বৈরী। ধর্মক্ষেত্রেই

হোক আর সংসার ক্ষেত্রেই হোক কোন রকমের ভণ্ডামিকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই ভণ্ড ফকিরদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন,—

নৈবেদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা
সিন্নি বেলা দরগাতলা
তাও দেখে মন খাবলায়।

শুধু তাই নয়, সংসার বিরাগী ফকির বা পুণ্য লোভাতুর তীর্থযাত্রী কেউই তাঁর তীব্র শ্লেষ থেকে বাদ পড়ে নি,—

কোন দেশে যাবি মুনা
চল দেখি যাই,
কোথা পীর তুমি হওরে—
তীর্থে যাবি সেখানে কি
পাপী নাইরে ॥
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়
স্বপ্ন দোষ কি হয় না সেথায় ?
আপন মনের বাঘে যারে খায়
কে ঠেকায় রে ॥

তবে কি ধর্ম-কর্মের প্রতি তাঁর আস্থা নেই ? তিনি বলেন,—

না হলে মন সরলা কি ফল মেলে
কোথা ধুঁড়ে,
হাতে হাতে বেড়াই মিছে তওবা পড়ে।
মক্কা-মদিনা যাবি, ধাক্কা খাবি, মন না মুড়ে।
হাজী নাম পড়ছে লোকে তাই দেখি রে ॥
মুখে যে পড়ে কালাম, তারই সুনাম হুজুর বাড়ে।
মন খাঁটি নয় বললে কি হয় নামাজ পড়ে ॥
মন যার হয়েছে খাঁটি মুখে যদি গলদ পড়ে।
খোদা তাতে নারাজ নয়রে, লালন ভেড়ে ॥

হাদিসের সঙ্গে নিম্নলিখিত বাণীটি তুলনীয় :—

আসল নির্ভর করে তার নিয়েতের উপর।
(নিয়েত অর্থে মনন)

তিনি ভণ্ড তপস্বীকে আরো বলেছেন ;—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই ॥
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই।

লালন চরিত্র ও তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ-খবর রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে লালন ও তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার পরিশুদ্ধপন্থী মুসলিমদের সঙ্গে সর্বাংশে না মিললেও তাঁদের ধর্মমত অতি উদার এবং আচার-ব্যবহার উন্নত। তবে তাঁর বর্তমান উত্তরাধিকারের চাল-চলন, হাব-ভাব দেখে তাঁর বা তাঁর সম্প্রদায়ের বিচার করা উচিত হবে না।

মুসলমানিত্বকে নিয়ে তিনি কোনদিন গর্ববোধ করেন নি। বরং তাঁর জাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি যে জবাব দিতেন তাতে তাঁকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক বলে নির্দিষ্ট করা দুরূহ হত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের জবাবে তিনি নিম্নলিখিত গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন,—

সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জেতের কিরূপ দেখলাম না নজরে ॥
জগত বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা তথা
লালন বলে জেতের কথা, বিকাইছি সাধ বাজারে ॥

সেকালে এসব নিয়ে বিশেষভাবে কেউ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁর ভক্তরা তাঁকে "সাঁইজী" বলেই জানতেন। লালন বলেন যে, মানুষের গায়ে যখন জাতিত্বের ছাপ নেই, চেহারা দেখেই যখন তাকে চেনা যায় না, তখন জাতির ভেদ নিয়ে লড়াই করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তাই বলে এ প্রশ্নের জবাব যে তিনি একেবারেই দেন নি তা নয়। তিনি শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছেন,—

লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।
একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥
বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা যার নেই সেও বামনী

বোঝরে ভাই দিব্য-জ্ঞানী
লালন তেমন খাত্‌নার জাত একখান ॥

খাত্‌নার জাত অর্থাৎ মুসলিম। এই যে আত্মপরিচিতি একে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তিনি যে নিজেকে খাত্‌নার জাত বলেছেন,—এ কথার মধ্যে গভীর বেদনা লুক্কায়িত আছে। খাত্‌না দিলেই কি মুসলমান হওয়া যায়? মুসলমান হওয়া কি এতই সোজা? লালন ফকির তাই প্রশ্ন তুলেছেন :—

যদি খাত্‌না দিলেই হয় মুসলমান,
নারী লোকের কি হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে?

সুফী ফকির লালন শাহ্‌জী তাই মুসলিম সন্তান হয়েও পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতেন। এই লজ্জার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত মুসলমানিত্ব। এক কথায় তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের কথাই বলেছেন।

কোরান শরীফে আছে—হে ইমানদার বা ধার্মিক ব্যক্তিগণ, তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হওয়ার আগে মরো না। প্রকৃত মুসলমান অর্থে পূর্ণ মনুষ্যত্বের কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ লালন নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য যে পূর্ণাঙ্গ মুসলমানিত্ব বা মনুষ্যত্ব অর্জন,—এ কথা তাঁর বহু গানে ব্যক্ত হয়েছে।

আজকের মতন লালন ফকিরের পরিচিতি এককালে তেমন ছিল না। পারস্য কবি রুমী যেমন এককালে 'মস্‌নভী শরীফ' লিখে অনেকের চোখে 'কাফের'-শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন,—লালনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী-কবি জামী বলেছিলেন যে 'মস্‌নভী' পড়া তো দূরের কথা, তা শুনলেও কাফির হতে হবে। চারিদিকে ছিঃ ছিঃ ধ্বনি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জামী 'মস্‌নভীর' সমালোচনা করে রুমীর বিরুদ্ধে কড়া জবাব দেওয়ার সংকল্প নিয়ে বইখানি তিনি যত গভীর মনোযোগে পড়তে লাগ্‌লেন তত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে ঘেমে উঠতে লাগ্‌লেন। শেষে তিনি অতি উৎসাহে চীৎকার করে বলে উঠলেন,—মৌলভী রুমীর মস্‌নভী হল পারস্য ভাষার কোরান শরীফ। অর্থাৎ কোরানের মর্মকথা মস্‌নভীতে ভরে দেওয়া হয়েছে। রুমীও তাই বলেছিলেন যে,

তিনি কোরানের মগজ নিংড়ে নিয়ে মস্-ভী লিখেছেন এবং নীরস অংশ রূপ হাড়গুলি কুকুরদের সামনে ফেলে ছিয়েছেন।

আজকের দুনী-সমাজে লালন ফকিরের বিশেষ পরিচিতির মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নবীন বয়সে কলকাতায় বসে শিলাইদহ অঞ্চলের এক বাউলের একতারা সহযোগে গাওয়া যে গানটি শুনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেটির উল্লেখ আছে,—

কোথায় পাব তারে—
আমার মনের মানুষ যে রে,
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

লালন ফকিরের গান রবীন্দ্রনাথকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল তা তাঁর উক্তির অংশবিশেষ থেকেও বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন,—"বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"

লালন ফকিরের আর একটি গান—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতাম পাখীর পায়।
চিরদিন পুষলেম পাখী
বুঝলেম না তার ফাঁকি জুকি,
দুধ-কলা দিই খাঁচারে পাখী
তবু ভোলে না তায়॥

রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকিরের এই পাখীকে সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি কীটস ও শেলীর পাখীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলা বাহুল্য,—প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই লালন ফকিরকে বটতলা থেকে তে-তলা পর্যন্ত যাতায়াতের সরল পথ তৈরী করে গেছেন।

ভাবে বিহ্বল হয়ে ফকীর লালন শাহ্ যখন সংগীত রচনার প্রেরণা অনুভব করতেন, তখন তিনি প্রায়ই শিষ্যদেরকে ডেকে বলতেন,—"ওরে তোরা আয়। আমার পোনা মাছের ঝাঁক এসেছে।"

এই পোনা মাছের ঝাঁকই ছিল তাঁর ধর্মজীবনের প্রতীক। ব্যক্তিজীবনে যেমন রসিক ছিলেন, সাধারণ কথা-বার্তার মধ্যেও তাঁর সে পরিচয় পাওয়া যেত। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ছেঁউড়ে নামক গ্রামে তাঁর যে আস্তানা ছিল, সেখানে তিনি একটি পাঠশালা পরিচালনা করতেন দিনের বেলায় এবং রাত্রিতে গান রচনা করতেন। দিনের বেলায় শিষ্যদেরকে তিনি সে গানের তালিম দিতেন।

১৩৩৩ সালে প্রকাশিত "বাউল ধ্বংস ফতওয়া" থেকে জানা যায় যে—তখন সমগ্র বঙ্গে তাঁর শুধু মুসলিম ভক্তের সংখ্যা ষাট-সত্তর লাখের মতন। তাছাড়া হিন্দু ভক্ত এবং শিষ্যের সংখ্যা ছিল বহু। তাঁদের মধ্যে কুষ্টিয়ার ফকিরচাঁদ হরিনাথ মজুমদার (যাঁকে অনেকে বলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার) এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গঙ্গারাম বাউল, জগা কৈবর্ত, পদ্মলোচন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোক-কবিগুরু লালন ফকিরের জীবন-কথার সঙ্গে হিন্দী কবিগুরু দাদূদ ওরফে দাদূর আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য রয়েছে। দাদূর মতন লালনকে অনেকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। কখনও বা শোনা যায় তিনি কায়স্থের ঘরের সন্তান। বস্তুতঃ দাদূর ন্যায় লালনকে নিশ্চিতভাবে মুসলিম সন্তান বলে অনেকে দৃঢ় মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে দাদূর ন্যায় লালন ফকিরও জন্মগতভাবে মুসলিম সন্তান। উভয়েরই ছিল অসংখ্য হিন্দু শিষ্য। রামানন্দ স্বামীর শিষ্য কবীর এবং কবীরের শিষ্য দাদূর জীবনকথার ন্যায় লালন শাহের জীবন কথাও রহস্যপূর্ণ। দাদূর বাণীর সঙ্গেও লালন ফকিরের বাণীর অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়। দাদূ বলেছেন :—

দাদূ পুছেন, দেব তোমার জাতি কি।
বুড়া বলেন আমার না আছে জাতি, না আছে পাতি,
প্রীতিতে কেউ আমাকে পায়॥

লালন ফকির বলেছেন,—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কিরূপ দেখলাম না নজরে॥ ইত্যাদি

সুফী ফকির লালন শাহ্ যে কত গান রচনা করে গেছেন তার সঠিক হিসাব আজো পাওয়া যায় নি। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত লালন-গীতির সংখ্যা প্রায় সাড়ে

ছয় শত। হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে রবীন্দ্রনাথ যেমন একালের কবিগুরু,—সুফী পীর লালন শাহ্ তেমনি ছিলেন বাংলার বাউল কবিগুরু।

তাত্ত্বিক কবি, জীবন রসের রসিক কবি, পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের মরমিয়া গায়ক এবং সুফী ফকির পীর লালন শাহ্ কুষ্টিয়ার অন্তর্গত ছেঁউড়ে নামক গ্রামে দেহত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। মরনকালে তিনি নিম্নলিখিত গানটি গেয়ে পরপারে যাত্রা করেছিলেন বলে কথিত ;—

পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে।
ক্ষম হে আমার অপরাধ ভব কারাগারে॥
না হলে তোমার কৃপা
সাধন সিদ্ধি কে করিতে পারে?
আমি পাপী তাইতে ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে।
পাপী-তাপী জীব তোমার
না যদি করহে পার
দয়া প্রকার করে,
পতিত পাবন পাতক নাশা
বলবে কে আর তোমারে।
জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমারি সব কীর্ত্তিময়
ত্রিবিধ সংসারে।
না বুঝে অবোধ লালন
পড়ল বিষম ঘোরতরে॥

তথ্যপঞ্জী :—১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস . ডঃ সুকুমার সেন।
২, লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা : মুহম্মদ আবু তালিব।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট ঃ আজকের দিনের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ

সুকুমার মিত্র

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট বলতে সমগ্রভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে সংকটকে বোঝায়। যুদ্ধ ও বিপ্লব এবং মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ ও যৌবন-দৃপ্ত ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম এই সংকটের বিশেষ লক্ষণ।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিকেরই সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এর মূলে একদিকে আছে বিশ্ব পুঁজিবাদ ব্যবস্থার ক্রমেই আরও গভীর হয়ে-ওঠা ভাঙ্গন (ক্রমেই অধিক সংখ্যায় দেশগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে), আর অন্যদিকে আছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তির অবিরাম বৃদ্ধি।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি হল : দুনিয়া পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী এই দুই ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ভাগ হয়ে যাওয়া, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট এবং বাজারের সমস্যা তীব্রতর আকারে দেখা দেওয়া। এর ফলে শিল্পসংস্থাগুলিতে ক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদন হচ্ছে (undercapacity production) এবং এই অবস্থা স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বেকারি স্থায়ী হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট পুঁজিবাদের মধ্যে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই উদ্ভূত। উৎপাদনের শোষণমুখী প্রক্রিয়ার যতই বিকাশ ঘটে ততই পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধগুলি তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমান স্তরে সাম্রাজ্যবাদের সংকটের বিকাশ যেসব নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলি কেবলমাত্র বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি বাইরের উপাদানগুলিও পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের বিকাশের পন্থা ও নিয়মগুলির উপর আরও বেশি নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করছে। এই সব উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল : বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় ও তার সংহতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে মোকাবিলার তীব্রতা বৃদ্ধি, নতুন সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐতিহাসিক সাফল্য, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণীসংগ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর ঐ সব সাফল্যের বৈপ্লবিক প্রভাব এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত সমসাময়িক প্রগতিশীল শক্তির সংহতি।

২

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে পুঁজিবাদী দুনিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয় এবং পুঁজিবাদের শৃংখলের দুর্বলতম গ্রন্থী মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে রুশিয়ায় পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। দুনিয়ার ৭.৭ শতাংশ অধিবাসী এবং ১৬ শতাংশ ভূখণ্ড পুঁজিবাদী আওতার বাইরে চলে যায়।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের দ্বিতীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শ্রেণী-সংগ্রাম, বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারা-প্রতিক্রিয়া পুঁজিবাদী সমাজে আবার ভাঙ্গন ধরায় যার ফলে গড়ে ওঠে নব নব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। পৃথিবীর বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার পরস্পর সংযুক্ত শক্তিগুলির প্রধান পরিচালকরূপে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের ভূমিকা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অবিসংবাদিত জয়ের ফলে ৫০ এর দশকের মাঝামাঝি দুই সমাজব্যবস্থার শক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ তার আধিপত্য হারায় এবং মানব সমাজের ইতিহাসে এই প্রথম যুদ্ধকে চিরতরে পরিহার করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের তৃতীয় স্তর শুরু হয়।

এই স্তরে শ্রম বিভাগের বিশ্বব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রকে একঘরে করে রাখার ব্যর্থতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় এবং পৃথিবীর জাতিগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আন্তর্জাতীয়করণের নবোদ্ভূত রূপগুলির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমূহের নতুন ধাঁচ গড়ে তোলার ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের নির্ধারক ভূমিকা প্রবলতর হয়ে ওঠে।

এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরার ফলে ৭০টিরও বেশি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি সৃষ্ট নয়া-উপনিবেশবাদের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই সব রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম হয়েছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়ে তুলছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের রূপ লাভ করেছে। কোন কোন রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়ে অ-পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে মুক্তহস্তে সাহায্য দিচ্ছে। এই সব ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যবস্থায় আরও ভাঙ্গন ধরছে এবং তার প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অনেক দেশ থেকেই তাকে এখন হাত গুটোতে হচ্ছে। ...“জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম বহু দেশেই এখন প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় প্রকার শোষণমূলক সম্পর্ক সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে শুরু করেছে।”

এই স্তরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল অনুন্নত দেশগুলিতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি। এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে নতুন ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের আত্মপ্রকাশের মধ্যে। অতীতের ন্যায় এখনকার এই সংকটের মূলে শুধু অর্থনৈতিক সংকট নেই। এর অর্থ পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এই সময় সংকট তীব্রতর হয়ে উঠবে প্রধানতঃ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৃদ্ধি, অর্থ-নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশগুলির মেহনতি জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং পুঁজিবাদের প্রধান ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী অংশের আক্রমণের ফলে। শ্রমিকশ্রেণীর এই অংশ আধুনিক উৎপাদন শক্তিগুলি আয়ত্ত করতে এবং ন্যূনতম সামাজিক মূল্যে বিপ্লবের জয় সুনিশ্চয় করতে সমর্থ।

৩

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তার একচেটিয়া আধিপত্য চিরতরে হারিয়েছে। এই আধিপত্যের জোরেই সে মানবজাতির বিকাশের পথ ও ভবিতব্য নির্ধারণ করতে পারত। ১৯০০-১৯৭৩ সালের

মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত সারণিতে :

পৃথিবীর সামাজিক রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন, ১৯০০—১৯৭৩

(সারা দুনিয়ার শতাংশ)

বছর	সারা দুনিয়া	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ	অ-সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ	
			সব দেশ	সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের উপনিবেশগুলি
ভূখণ্ড—১৯০০	১০০	—	১০০	৮২.২
১৯২৩	১০০	১৬.০	৮৪.০	৫৪.৭
১৯৭৩	১০০	২৫.৯	৭৪.১	২৬.৮
জনসংখ্যা—১৯০০	১০০	—	১০০	৭০.৯
১৯২৩	১০০	৭.৭	৯২.৩	৫৯.০
১৯৭৩*	১০০	৩৩.৮	৬৬.২	১৯.৪

* আনুমানিক হিসাব : জাতিসংঘের মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ১৯৭৪ সালের মার্চ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আজকের দিনের পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটকে অনিবার্যভাবে তীব্রতর করে তুলছে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্রোতে সমস্ত প্রধান প্রধান বৈপ্লবিক শক্তির মিলন। এর ফলে একচেটিয়া পুঁজি শুধু যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গড়ে-ওঠা ও বেড়ে-ওঠা বন্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে তা নয়, এতদিন ধরে বিশ্ব পুঁজিবাদ কর্তৃক শোষিত তার কাঁচামাল সরবরাহকারী কৃষিপ্রধান দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল অভ্যুত্থানকেও সে রোধ করতে পারছে না।

যুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার ৩০.৬ শতাংশ উপনিবেশগুলির বাসিন্দা ছিল। আজ ০.৮ শতাংশেরও কম লোক প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন। বহু পরাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন দেশ আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক ফল হল সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজির গুরুত্বের আপেক্ষিক হ্রাস। আগে ঐসব দেশের প্রায় সব শিল্পই ছিল বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে এবং এসব দেশের অর্থনীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতিরই একটি অংশ। আজ পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। সদ্যস্বাধীন দেশগুলি নিজেদের স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলছে জাতীয়করণ, রাষ্ট্রায়ত্ত

ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য পাচ্ছে। এখন বিভিন্ন হিসাব ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, "তৃতীয় দুনিয়া"র শিল্পসামর্থ্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়েছে। সারা পৃথিবীর শিল্পোৎপাদনে "তৃতীয় দুনিয়া"র দান হল তিন থেকে চার শতাংশ।

সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে "তৃতীয় দুনিয়া"র মোট উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। মোট উৎপাদনের মধ্যে শিল্পজাত পণ্যাদির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ এবং কৃষিজাত পণ্যাদির উৎপাদন বেড়েছে দুই গুণের মত। অবশ্য বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে "তৃতীয় দুনিয়া"র দেশগুলি এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই সব দেশে অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক বাস করে কিন্তু ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার উৎপাদনে এই সব দেশের অংশ দাঁড়ায় ১৭ শতাংশেরও কম। এছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমলে এই সব দেশ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-বর্গের মধ্যে যে ব্যবধান ইতিহাসের গতিপথে সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ আরও বেড়ে গেছে। ৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে মাথাপিছু উৎপাদনের দিক থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে ফারাক ১ : ১০, ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে এই ফারাক বেড়ে দাঁড়িয়েছে মোটামুটি ভাবে ১ : ১৩।

বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি এখনও অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন না কোন ভাবে উন্নতিকামী দেশগুলিকে শোষণ করে চলেছে। এদিকে পুঁজিবাদ উন্নতি-কামী দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারছে না। এর ফলে অসন্তোষ বাড়ছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠছে এবং একাধিক দেশ অ-পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে।

উন্নতিকামী দেশগুলিতে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের জন্য যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চলেছে তা সমসাময়িক পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটকে গভীরতর করার অন্যতম মুখ্য উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় কথা হল এই যে, পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের বর্তমান স্তরে এইসব দেশের জনগণের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম সাধারণভাবে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় প্রকার শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে শুরু করেছে।

৪

আজ বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রভাবে অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে তা' অপ্রতিরোধ্য।

শেষপর্যন্ত এই সব পরিবর্তনই পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নতুন সমাজ-ব্যবস্থা যে অপরাজেয় তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে দিচ্ছে। কাজেই এই সব পরিবর্তন পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের গভীরতা ও ব্যাপ্তির চূড়ান্ত মানদণ্ড।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনৈতিক শক্তিসামর্থ্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের (সি এম ই এ) অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল বলে পরিগণিত। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়া ক্রমাগত হটে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান ক্রমাগত দুর্বল হয়ে-পড়া পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের একটি বিশেষ লক্ষণ হয়ে উঠছে। ৩০-এর দশকের শেষদিকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সারা দুনিয়ার শিল্পোৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত, আজ তারা ৫০ শতাংশের কিছু বেশি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ ৪০ শতাংশেরও বেশি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

১৯১৩-১৯৭৩ সালে বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে (শতকরা হিসাবে) কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অংশ

দেশ	১৯১৩	১৯৩৭	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭৩*
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫.৮	৩৭.১	৪৩.৭	২৯.৫	২৪.৬
ব্রিটেন	১৪.০	১৪.০	৯.৩	৫.৩	৩.৫
ফ্রান্স	৬.৪	৪.৫	৩.৫	৩.২	৩.১
পশ্চিম জার্মানী	১৫.৭[১]	৭.৯[১]	৫.৩	৫.৬	৫.১
জাপান	১.২	৪.০	১.৩	২.৮	৬.০
ইতালী	২.৭	৩.১	২.০	২.০	১.৯
বেলজিয়াম	২.১	১.৭	১.০	০.৬	০.৫
হল্যাণ্ড	১.২	১.১	০.৯	০.৮	০.৮
প্রত্যেক দেশের মোট	৭১.১	৭৩.৪	৬৭.০	৪৮.৮	৪৫.৫

* আনুমানিক হিসাব
[১] অবিভক্ত জার্মানী

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট : আজকের দিনের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে যে সর্বব্যাপী সংকট বর্তমান তার সবচেয়ে নির্ধারক ধারাগুলির একটি হল এই যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নয়, শ্রমিক-শ্রেণী ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমসাময়িক বিশ্ব বিকাশের মূল লক্ষণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করতে শুরু করেছে। উপরের পরিসংখ্যানে এই ধারাটিই প্রকাশ পেয়েছে।

৫

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বব্যাপী সংকট গভীরতর হয়ে উঠছে, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-শক্তিসমূহের চাকাগুলি আটকে যাচ্ছে বা সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বরং উল্টো। আগের তুলনায় পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি আরও বেড়ে উঠছে। ১৮৪৮ সালে বিশ্ববিখ্যাত "কমিউনিস্ট ইশতেহারে" কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির অবিরত বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটিয়ে এবং তদ্দ্বারা উৎপাদনের সম্পর্কসমূহের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও তারই সঙ্গে সমাজের সমগ্র সম্পর্কের পরিবর্তন না ঘটিয়ে বণিকশ্রেণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। উৎপাদনের অবিরত বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিরাম আলোড়ন, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও চাঞ্চল্য অতীতের সমস্ত যুগ থেকে বণিক যুগকে স্বতন্ত্র করেছে।"

বণিক শ্রেণীকে এগিয়ে যেতে হয়, উৎপাদন শক্তির আরও বিকাশ ঘটাতে হয়, কিন্তু তার ফলে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না, বরং অনিবার্যভাবে তার এই অগ্রগতি পুঁজিবাদের ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই আরও অগ্রগামী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলে।

মার্কস বলেছেন : "ইতিহাসের বণিক যুগকে নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করতে হয়—একদিকে, মানবজাতির পরস্পর নির্ভরতার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সেই যোগাযোগের উপায়গুলি সৃষ্টি করতে হয়। অন্যদিকে, মানুষের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশ ঘটাতে ও বৈষয়িক উৎপাদনকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যে রূপান্তরিত করতে হয়। বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্য ভূতাত্ত্বিক বিপ্লব যেভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ সৃষ্টি করেছে সেই ভাবেই বণিক নতুন জগতের এইসব প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।"

মার্কস এর এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। মার্কস এর জীবন-

কালে যে নতুন জগৎ গড়ে উঠেছিল তা আজ পুরাতন জগতে পরিণত হয়ে 'শেষের সে দিনের' অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তার জীবন-তৃষ্ণা আজও অতৃপ্ত, তাই আত্মরক্ষার জন্য সেদিনের নতুন জগতের স্রষ্টা পুঁজিবাদ আজ রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদ (স্টেট মনোপলি ক্যাপিটালিজম) রূপে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রের সাহায্যে পুঁজিবাদ আজ আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে এবং এর জন্য প্রকাশ্যেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতে একচেটিয়া পুঁজি কোন দ্বিধা বা সংকোচবোধ করছে না।

রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদের শক্তিকে সংহত করতে সাহায্য করেছে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনক্ষমতা অভূতপূর্ব ভাবে বাড়াতে পেরেছে। এর ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের অ-সমান ও থেকে থেকে বিকাশলাভ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও শেষ স্তর এবং এই স্তরে সমাজের উৎপাদন শক্তিগুলির অধোগতি ও বৃদ্ধি—উভয় দিকেই প্রবণতার প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়। লেনিন এটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন :

"অধোগতির প্রবণতা পুঁজিবাদের দ্রুত বৃদ্ধিতে বাধা দিচ্ছে একথা মনে করা ভুল। তা দিচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শিল্পের কোন কোন শাখা, ধনিকশ্রেণীর কোন কোন স্তর এবং কোন কোন দেশ কম-বেশি পরিমাণে এই প্রবণতাগুলির কখনও একটি, কখনও অপরটির পরিচয় দেয়। মোটের উপর পুঁজিবাদ আগের চাইতে আরও অনেক দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এই বৃদ্ধি সাধারণতঃ অধিক থেকে অধিকতর অ-সমান হয়ে উঠছে।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দেশগুলির অ-সমান বিকাশের নিয়ম বিশেষ প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং এর ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শক্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। অপর পৃষ্ঠার সারণি থেকে এর সংশয়াতীত প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুঁজিবাদের অ-সমান বিকাশ ঘটার ফলে অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ১৯১৩ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে মোট উৎপাদন মোটামুটিভাবে ৬.১ গুণ বেড়েছে। এই মধ্যে ধরা শিল্পোৎপাদন বেড়েছে ১১.৪ গুণ। এই সময়, বিশেষ করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মূলতঃ নতুন নতুন শাখা দ্রুত

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শিল্পোৎপাদনে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশের অনুপাত (শতকরা)

	১৯৫৩	১৯৬০	১৯৭০	১৯৭৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫২.৬	৪৫.৭	৪০.৮	৩৯.৮
জাপান	২.৪	৪.৪	৯.০	৯.২
পশ্চিম জার্মানী	৬.৬	৮.৮	৮.৬	৮.১
ব্রিটেন	৮.৯	৮.৩	৬.১	৫.৫
ফ্রান্স	৪.৫	৫.১	৫.০	৫.০
ইতালী	২.৪	৩.২	৩.৫	৩.২

গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের আন্তর্জাতীয়করণের প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত ও প্রবলতর হয়েছে। ১৯১৩ সালের তুলনায় বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারে বাণিজ্যের পরিমাণ ৭.১ গুণ বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বুনিয়াদী উৎপাদনকারী শক্তি শ্রমিকদের সংখ্যাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে গেছে।

১৮৮১-১৯৭৩ সালে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার :

	১৮৮১-১৯১৩	১৯১৩-১৯৪৮	১৯৪৯-১৯৭৩
শিল্পোৎপাদন	৪.১৫	২.৪	৫.৭
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	২.৬	০.৬	৭.৩

লীগ অব নেশনস ও জাতিসংঘের পরিসংখ্যান পুস্তকাদি অবলম্বনে।

কিন্তু পুঁজিবাদের এই অগ্রগতি তার সংকটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আধুনিক পুঁজিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় গুরুত্বর গুণগত পরিবর্তনগুলি সহজে চোখে পড়ে না, অথচ এই পরিবর্তনগুলির চূড়ান্ত পরিণতি হল পুঁজিবাদের মূল বিরোধগুলির অভূতপূর্ব তীব্রতা বৃদ্ধি। এই বিরোধ ঘটে উৎপাদনের ক্রমে বেড়ে-ওঠা সামাজিক প্রকৃতি এবং সামাজিক শ্রমের ফলগুলি আত্মসাৎ করার পুঁজিবাদী শোষণাত্মক রূপগুলির মধ্যে। এই বিরোধের ভিত্তিতেই আজকের দিনের পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সমস্ত বিরোধ, সর্বোপরি পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ, গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের সমাধানের অযোগ্য এই বিরোধগুলিকে

তুলে ধরেছিলেন। এঙ্গেলস এই বিরোধের ছবিটিকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেরেছিলেন, তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে "অ্যান্টিডুরিং" গ্রন্থে আধুনিক বৃহদাকার শিল্প যে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়েছে সেই শ্রমিক ও ধনিক-শ্রেণীর উল্লেখ করে তিনি লেখেন: "...অন্যদিকে এই একই বৃহদাকার শিল্প ধনিকশ্রেণী রূপে এক শ্রেণী সৃষ্টি করেছে যার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার ও জীবনধারনের সমস্ত উপায়ের উপর, কিন্তু যে শ্রেণী প্রত্যেক জোয়ারের সময় এবং তার পরেই সংঘটিত প্রত্যেক সংকটের সময় প্রমাণ করছে যে তার ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া উৎপাদন শক্তিগুলিকে আর সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যে শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে সমাজ একটি ইঞ্জিনের মত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে যে ইঞ্জিনের আটকে-যাওয়া সেফটি ভালভ খোলার শক্তি ড্রাইভারের নেই।"

তবে কি পুঁজিবাদী সমাজ আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে? পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট কি ধনিকশ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটাবে? উত্তরে জোরের সঙ্গেই বলতে হবে 'না'।

এঙ্গেলস লিখেছিলেন: ..."সমগ্র আধুনিক সমাজকে যদি ধ্বংস না হতে হয় তাহলে উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির বিপ্লব সংঘটিত হতেই হবে যে-বিপ্লব সমস্ত শ্রেণী বিভাগের অবসান ঘটাবে।" (অ্যান্টিডুরিং)

এই বিপ্লব কে ঘটাবে? ঘটাবে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী—একথা বলে গেছেন এঙ্গেলস বহুকাল আগে।

তারপর দিনে দিনে শ্রমিকশ্রেণী আরও সংগঠিত, আরও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী রুশিয়ায় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, প্রথম কৃষক-মজুর রাজ স্থাপন করেছে। লেনিন লিখেছেন: "পুঁজিবাদ তার নিজের কবর খননকারীদের সৃষ্টি করে, নিজে থেকেই সৃষ্টি করে এক নতুন ব্যবস্থার উপাদানসমূহ, তবু, সঙ্গে সঙ্গে একটা 'লাফ দেওয়া' ছাড়া এই সব বিশেষ বিশেষ উপাদান সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না এবং পুঁজির শাসনকে ক্ষুণ্ণ করে না। অক্টোবর মহাবিপ্লব এই রকমই একটি গুণগত "লাফ"।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই "লাফ" দেওয়ার পালা চলেছে, গড়ে উঠেছে বিশ্ব সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যার কাছে পুঁজিবাদী দুনিয়া হেরে যাচ্ছে। আর এরই সঙ্গে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়ে অভূতপূর্ব রকমের তীব্র

শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়েছে। ১৯৬১-১৯৭২ সালের মধ্যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন ৫৫ কোটি মানুষ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল বন্যায় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেসে গেছে। আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ এবং পুঁজিবাদী শক্তিবর্গ ও উন্নতিকামী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠছে। মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকট, তৈল-সংকট ও চক্রাবর্তিত সংকট বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টলিয়ে দিচ্ছে।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যে এই সব ঘটনা পুঁজিবাদী দুনিয়াকে দ্রুত ঠেলে নিয়ে চলেছে নতুন জীবন, নতুন সভ্যতার পথে যে পথ অনুসরণ না করে সংকটের সমাধান করা সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় অর্থ-নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত "ইণ্টার ন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স" পত্রিকার সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যার প্রবন্ধাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

পরিভাষা ও তার ব্যাখ্যা

সংকট দুই প্রকার। পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকট এবং পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট। চক্রাবর্তিত একটি সংকটের সূচনা থেকে পরবর্তী আর একটি সংকটের সূচনা পর্যন্ত কালকে বলা হয় চক্র (সাইক্‌ল্‌)। একটি চক্রের চারটি পর্যায় থাকে :

সংকট, মন্দা, পুনর্জীবন এবং জোয়ার। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন চক্রের সংকট পর্যায়ে উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও কার্যকর চাহিদার আপেক্ষিক হ্রাসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তীব্র ও বিধ্বংসী রূপে। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল পণ্যসমূহের অতি-উৎপাদন। এই সব পণ্যের বাজার মেলে না, দর পড়ে যায়, অর্থের তীব্র অভাব ঘটে এবং লেনদেনের বাজারে বিপর্যয় ঘটে। এর ফলে ব্যাপক আকারে ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়। উৎপাদন দারুণভাবে হ্রাস পায়, বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং মজুরী কমে যায়। এক কথায় সমাজের উৎপাদন শক্তিগুলির বিরাট অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। সংকটের পরেই মন্দা (ডিপ্রেসন) দেখা দেয়। মন্দার পর্যায়ে শিল্পোৎপাদন স্থাণু হয়ে থাকে, পণ্য-সমূহের দর কম থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্য চলে মন্দগতিতে এবং বাড়তি পুঁজির (অর্থ) প্রাচুর্য দেখা যায়। এই পর্যায়েই পুনর্জীবন ও জোয়ারের পূর্ব উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়।

জমে-ওঠা পণ্যসমূহের কিছু অংশ নষ্ট করে ফেলা হয় এবং কিছু অংশ কম দরে বিক্রি করা হয়। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে এবং তাদের বেশি করে খাটিয়ে, নতুন ও উন্নত ধরনের যন্ত্রাদি প্রবর্তন করে, উন্নত কারিগরীর আশ্রয় নিয়ে উৎপাদনের খরচা কমানোর চেষ্টা করে। উৎপাদনের স্থাণু অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের এবং সংকটকালের কম দরে পণ্য বিক্রয় করেও মুনাফা লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে পুঁজিবাদীদের এই চেষ্টা অর্থ-নীতিতে আবার প্রাণসঞ্চার করে।

পুনর্জীবনের (রিকভারি) পর্যায়ে শিল্পসংস্থাগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

উৎপাদন বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দর বাড়ে, মুনাফা বাড়ে এবং জোয়ারের (বুম) সূচনা হয়। জোয়ার পর্যায়ে উৎপাদন পূর্ববর্তী চক্রের তুঙ্গে পৌঁছায়। নতুন নতুন শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠে, রেলপথ প্রভৃতি স্থাপিত হয়। দর বাড়তে থাকে। ভবিষ্যতে আরও দর বাড়বে এই আশায় বণিকরা রাশি রাশি মাল কিনতে থাকে, ফলে উৎপাদন আরও বেড়ে যায়। ব্যাঙ্কগুলি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মুক্তহস্তে অর্থ যোগাতে থাকে। সব মিলে উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য এখন সম্প্রসারণ ঘটে যা কার্যকর চাহিদার (এফেকটিভ ডিম্যাণ্ড) সীমা ছাড়িয়ে যায়। এইভাবে আবার অতি-উৎপাদনের সংকটের আবির্ভাবের অবস্থাগুলি সৃষ্টি করা হয়।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট বলতে বোঝায় সমগ্রভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে সংকট। যুদ্ধ ও বিপ্লব এবং মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ ও ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম এই সংকটের বিশেষ লক্ষণ। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিকেরই, সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে এর মূলে থাকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমেই আরও গভীর হয়ে-ওঠা ভাঙন (ক্রমেই অধিক সংখ্যায় দেশগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে)। আর একদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তি বেড়ে চলেছে।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

দুনিয়া পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী এই দুই ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় ভাগ হয়ে যাওয়া, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট এবং বাজারের সমস্যা তীব্রতর হয়ে-ওঠা, যার ফলে শিল্পসংস্থাগুলিতে ক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদনের ব্যবস্থা স্থায়ী হয় এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক আকারে সমস্যা দেখা দেয়।

রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদ (স্টেট মনোপলি ক্যাপিটালিজম) শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। রাষ্ট্র শাসকশ্রেণীর নিপীড়ন-যন্ত্র, এই যন্ত্রের সাহায্যেই শাসকশ্রেণী অপর শ্রেণীগুলিকে দমন করে এবং নিজের ক্ষমতা বজায় রাখে। বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, গোষ্ঠীতান্ত্রিক, সামরিক যে রকমই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই তা পুঁজিপতি শ্রেণীর একনায়কত্ব। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণীই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পুঁজিবাদের ক্রমাবর্তনে ঘটে একচেটিয়া পুঁজি-

বাদে। এই স্তরেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় যা পুঁজিবাদের শেষ স্তর। পুঁজিবাদের অবিরোধ, রাজনৈতিক শক্তিরূপে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়, উপনিবেশগুলিতে দুর্বার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে উপনিবেশগুলির অভ্যুদয় সাম্রাজ্যবাদের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিরা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য করতে থাকে। রাষ্ট্র তাদের ধারণ করে না থাকলে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই কারণেই স্টেট মনোপলি ক্যাপিটালিজমের বাংলা পরিভাষারূপে "রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদ" কথাগুলিই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

লগ্নী পুঁজি (ফিনান্স ক্যাপিটাল)—ব্যাঙ্কের পুঁজি ও শিল্পের পুঁজির মধ্যে যখন মিলন ঘটে অর্থাৎ সোজা কথায় যখন মহাবিত্তশালী পুঁজিপতিরা একধারে শিল্প ও ব্যাঙ্কের মালিক হয়ে দাঁড়ায় তখনই ফিনান্স ক্যাপিটালের উদ্ভব হয়। বাংলায় লগ্নীর ভিন্ন অর্থ (ইংরাজী ইনভেস্টমেন্ট) থাকলেও এখানে তাকে পুঁজি কথাটির আগে বসিয়ে স্বতন্ত্র অর্থের একটি পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

ধনপতিচক্র কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে ফিনান্স অলিগার্কির বাংলা পরিভাষা রূপে।

সাময়িক মন্দা (রিসেশন)—ব্যাপক আকারে মন্দা দেখা দিলে, কিন্তু তা স্বল্পস্থায়ী হলে তাকে রিসেশন বা সাময়িক মন্দা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য, অনেক সময় সংকট কথাটি ব্যবহার না করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা ও পুঁজিপতিরা সাময়িক মন্দা কথাটি ব্যবহার করেন।

বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও 'আলকাপ'

ধানিক সরকার

নাটক বলতে শহুরে মানুষেরা যা মনে করেন, লোকনাট্য ঠিক তা, নয়। তবে নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি লোকনাট্যে শিথিল ভাবে থাকলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। বিশেষ ভাবভঙ্গির দ্বারা কাহিনী অবলম্বিত চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি, ঘটনার বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য, কাহিনীর সূচনা—বিকাশ ও পরিণতি প্রভৃতি নিয়ে যে-নাটক তা লোকনাট্যে অল্পবিস্তর থাকে। ঘটনার বৈপরীত্য, দর্শকগণের নাট্যোৎকণ্ঠা, কৌতূহল ও উত্তেজনা এবং তার অবসান লোকনাট্যের মধ্যে বিরল নয়। এ সব সত্ত্বেও লোকনাট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশারদগণ বিশেষ আলোচনা করেন নি, এমন কি বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে লোকনাট্য বিশেষ মর্যাদা পায় নি। এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতিবিদগণের উপেক্ষা কম দুঃখজনক নয়। লোকনাট্যের লিখিত রূপ নেই, (আধুনিক কালে কিছু কিছু হচ্ছে) লিখিত নেই বলেই তা অস্তিত্বহীন বলা চলে না। প্রাথমিক ভাবে বিভিন্ন জেলায় অনুসন্ধান করে দেখা গেছে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে বাংলা লোকনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। গ্রামে গ্রামে এখনও যা ছড়িয়ে আছে তা সংগ্রহ করলে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। লোক-সাহিত্য সচল, মুখে মুখে চলে বেড়ায়। লোকনাট্যও তাই। আমরা লোক-গীতিকে যেভাবে ধরে রাখতে চেষ্টা করছি, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদিকে গেঁথে রাখছি, অনুরূপ ভাবে বাংলার লোকনাট্যকে ধরে রাখতে ক্ষতি কি! ক্ষতি নেই, লাভ আছে। বাংলার লোকনাট্যকে ধরে রাখতে পারলে দেশীয় নাট্যধারার যথার্থ মূল্যায়ন একদিন সম্ভব হবে। নাটকের জন্যেও দেশের দিকে চোখ ঘোরাতে হবে, আর সে দেশ বাংলার গ্রামে গ্রামে পড়ে রয়েছে। গ্রামের উপর দাঁড়িয়ে থেকে, গ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যকে অন্ধ অনুকরণের ঝোঁকটে এবং ব্রিটিশ প্রবর্তিত খণ্ডিত শিক্ষার উন্নাসিকতায় আমাদের গ্রামগুলিকে স্থবির মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই গ্রাম কখনো স্থবির নয়, সে তার ভাষায় সচল, তার ঢংয়ে সে সক্রিয়। তার সেই সামগ্রিক সচলতার মধ্যেই লোক-

নাট্যের উদ্ভব। বাংলার লোকনাট্যগুলিই বছরের পর বছর গ্রামের মানুষের নাট্যরস পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করে এসেছে। তা আজও অব্যাহত আছে। আমাদের 'পাণ্ডিত্যের' মূঢ়তা এই ধারাকে উপেক্ষা করতে জানে, কিন্তু অস্বীকার করতে পারে না।

বাংলার পালাগানগুলিকে সাধারণভাবে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যাত্রা তারই সংহত এবং উন্নতরূপ। পালা গানগুলির মধ্যে বনবিবি, আলকাপ, চার ইয়ারি, কুষাণে, বিষহরি, রসিয়া, চোর-চুন্নী, রূপবান কন্যা ইত্যাদি রয়েছে। এগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র, কিন্তু ফর্ম-এ মোটামুটিভাবে অভিন্ন। একটি মূল কাহিনীকে আশ্রয় করে পালা বিশেষে একাধিক উপকাহিনী সৃষ্টি করে অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য-গীত, চরিত্র, বাদ্যযন্ত্র, সাজসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শক সমাজের সামনে আসরে এ পালাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গীতের প্রাধান্য আছে, সংলাপ গীতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও মূল গায়েন চরিত্রগুলির ভূমিকা পালন করেন। আবার আলকাপ, চার ইয়ারি, চোর-চুন্নী, রসিয়া, প্রভৃতি পালাগুলিতে একাধিক চরিত্র আসরে উপস্থিত হয়। এতে গান থাকে, সংলাপ থাকে, কোন কোনটিতে সূত্রধরের মতো একটি চরিত্র দেখা যায়।

লোকনাট্যের সাতটি সাধারণ লক্ষণ বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ মহাশয় উল্লেখ করেছেন। যথা—

"১। লোকনাট্য সাধারণ লোকদের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছেই পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা, শিল্পীগোষ্ঠী ও দর্শক—সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ।

"২। শহর এবং বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ থেকে দূরে গ্রামের মাটিতে মাঠ, ঘাট ও বারোয়ারীতলায় এই নাটকের উদ্ভব ও অভিনয় দেখা যায়।

"৩। খোলা আকাশের নীচে মুক্ত ও অবারিত আঙ্গিনায় লোকনাট্যের অভিনয় হয়···।

"৪। ···লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্প-শাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার আকার ও আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল, দর্শকদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাতে নতুন নতুন উপাদান কেবলই প্রবেশ করতে থাকে।

"৫। লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মমূলক। যে সব ক্ষেত্রে মানবিক বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয় সে সব জায়গাতেই ধর্ম ও নীতির সর্বজনমান্য আদর্শ জোরাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকনাট্য চিরকাল লোকশিক্ষার বাহন

রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সনাতন ভাবধারা ও ঐতিহ্য লোকনাট্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে এসেছে।

"৬। লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা সঙ্গীতেরই প্রাধান্য···

"৭। লোকনাট্যের অভিনয়ে আবৃত্তি এবং সুরের প্রাধান্য আসা স্বাভাবিক। সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তি অপেক্ষা জোরাল ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনই সেখানে বেশি। অতিশয়িত ভাব প্রকাশের জন্য সেই অভিনয়ে বহু জায়গায় মুখোস ব্যবহার হয়" ('পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি'—তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১২৯-৩০)।

উল্লিখিত সাধারণ লক্ষণগুলির সঙ্গে আরও তিনটি লক্ষণ সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। যথা—

১। লোকনাট্যের একটি বিশিষ্ট অংশ লোকনৃত্য। অভিনেতাদের সাজ-সজ্জা অতি সাধারণ। লোকনাট্যে লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

২। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্যকৌতুক (কখনও কখনও তা অশ্লীলতাত্মক) প্রভৃতির আধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ লোকনাট্য হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শকদের রিলিফ দিয়ে থাকে। কখনও আবার ব্যঙ্গের কষাঘাতে দর্শকদের পুলকিত করে থাকে।

৩। লোকনাট্যগুলি প্রধানতঃ অলিখিত। চরিত্রগুলি লিখিত সংলাপের অনুশাসনের মধ্যে থাকে না। আসরের মধ্যে অনুষ্ঠান চলাকালে কি গানে, কি সংলাপে নতুন নতুন বাক্যের সংযোজন নিত্য হয়ে থাকে। লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান বা সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন যথেচ্ছ নয়। একটা অলিখিত কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত নাটকের শৃঙ্খলা মেনে চলে। এক ধরনের স্বাভাবিক, সহজ শৃঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে, দর্শকদের মনকেও সে টেনে রাখে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, লোক নাট্যের অধিকাংশ বিষয়বস্তু ধর্মমূলক; কিন্তু তা একান্তভাবেই লৌকধর্ম। শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রাধান্য লোকনাট্যে নেই বললেই চলে। তার জন্যে লোকনাট্যে ধর্মীয় হীনমন্যতা বা সাম্প্রদায়িক উগ্রতা নেই। বরঞ্চ তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধরে রাখা হয়েছে। আলকাপ ও বনবিবির গান এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই আলোচনার পটভূমিতে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার 'বুলবুল' দলের অধিকারি জনাব মোহাম্মদ মৈনুদ্দিন মণ্ডল মহাশয়ের নিকট থেকে সংগৃহীত

একটি আলকাপের বহু ধরনের পালার মধ্যে একটি পালা এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে।

আসর বন্দনা

প্রথম দৃশ্য—একজন গায়ক আসরে প্রবেশ করে সরস্বতী বন্দনার জন্য গান আরম্ভ করলেন।

বিপদে ডাকি মা বিপদ নাসিনী
কোথাই গো মা বীণাপানি।
পোড়ে মোরা সমরে,
ডাকি মা তোমারে,
আমার ওগো জ্ঞানদায়িনী।
শুনেছি পুরানে তুমি মা জ্ঞান দাও,
জানিনা পুজিতে,
তুমি মা বন্দনা নাও।
দাও মা শক্তি, করি মা মিনতি,
তব পদে ভক্তি থাকে গো জননী।

(গায়কের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য— (রক্তবীজের প্রবেশ) রণমূর্তি ধারণ করে রক্তবীজের নৃত্য আরম্ভ হয়। রক্তবীজ অর্থে কালি এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গগণ আসরে মুখোস পরে রণনৃত্য করে থাকে। যুদ্ধের বাদ্য বাজতে থাকে। নৃত্য করতে করতে রক্তবীজের প্রস্থান হয়।

তৃতীয় দৃশ্য—(নারীর প্রবেশ) গান আরম্ভ হয়—

শুনগো পিসিমা, শুনগো মাসিমা
বেঁধে দিই খোঁপা কাটা বোনানি,
আসবে তোদের নতুন জামাই লয়ে যাবে এখুনি
দে পিসিমা সোনার বায়না
নাকে কানে নিব গয়না
হায় আমি টিয়া ময়না
বলবো মধুর বাণী।

(নারীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য— ছড়া ও গান

হায়গো, সোনার বাংলায় আমরা সবাই মানুষ ক্যান হলাম না ?
মোদের শস্যেভরা জন্মভূমি অভাব কিছুই রবে না।

মোরা নয়গো হিন্দু, নয় মোসলমান, জাতিতে সবাই গো সুমান,
শুধু ধর্মেতে হিন্দু মোসলমান গো খোদা হরি একজন।

দূর কর ভাই মনের হিংসা, অকাল মৃত্যুর এই যে নেশা,
সবে আপন বেঁধে গো কর্মে ধর্মে এগিয়ে চলুন না।

এই হিংসার জন্যে কুরুবংশ সবংশে হল গো ধ্বংস,
ধর্মের জন্য ভগবান কৃষ্ণ গো করেন পাণ্ডবের রথ চালনা।

মোদের ভারত বিশ্বের সেরা,
নয়গো দুর্বল বিশ্বে মোরা,
শুধু শান্তি সাম্য থাকলে মোদের গো,
মোদের দৃশ্য দেখবে গোটা বিশ্বখানা।

(গায়কদলের প্রস্থান)

সূত্রধরের আগমন এবং ভাষণ : আমরা সুদীর্ঘ দু'শ বছর ব্রিটিশের খাঁচায় আবদ্ধ থাকার পর ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট আবদ্ধ খাঁচা থেকে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে পড়লাম। অর্থাৎ আমরা স্বাধীন হলাম। তারপর মনের মত সরকার গঠন করলাম। সরকার আমাদের জনকল্যাণ করবেন। আমরা সবে উদ্যমে দেশের কাজ এগিয়ে যাব, উন্নতির পথ ধরে চলব। কিন্তু হায় সেই উন্নতির অবনতি করে ফেলেছি, আমাদের হিংসা বিদ্বেষের জন্যে। নারী পুরুষকে হিংসা করে, হিন্দু মোসলমানকে হিংসা করে। মোসলমান হিন্দুকে হিংসা করে। কে বড় তা নিয়ে ঝগড়া করে, মারামারি করে। ভাইসকল, আমাদের স্বাধীনতার ফলভোগ করতে হলে সর্বপ্রকার হিংসা বিদ্বেষকে দূর করে হিন্দু মোসলমানে ভ্রাতৃভাব আনতে হবে, নারীপুরুষের মিলন ঘটাতে হবে। ঝগড়া ঝাটি ত্যাগ করতে হবে।

(সূত্রধরের প্রস্থান)

(গায়ক দলের প্রবেশ) গান আরম্ভ :

বলরে ভারতবাসী মন কেন উচাটন,
হুজুগের বাতাস পেয়ে নিত্য শুধুই চাও নতুন।

একবার উমিচাঁদের হুজুগ পেয়ে এনেছিলে নতুন দল,
দুশো বছর ইঁদুর পুষে কি লাভ তোরা করলি বল।
বারে বারে রব বদলে কাজ কি হবে ঢোল মাদলে,
ওরে কুয়াশা আর ঝড়-বাদলে অন্ধ করলে দুই নয়ন।
ভাখ ব্রিটিশের গুলিতে যাঁরা বুক পেতে দিয়েছেন প্রাণ,
মোরে মোরে মারল তাঁরা বন্ধ করলেন তোপ কামান।
তারা সর্বগ্রাসী জলধিতে আজও পারে ডুবিয়ে দিতে
যেদিন ভারতে উঠল পতাকা দেখরে দিল্লীর দরবারে।
ভারতবাসী ভেঙ্গে দিল শিকল সিংহের পরাক্রম ধরে।
ম্লান মুখে ছিল ভারত জননী ক'দিন জগৎ মাঝে।
মুছে গেল তার বন্ধন জ্বালা স্বাধীনের ভেরী বাজে॥
মোগল পাঠান ইংরেজ জাতি হাজার বছর ধরি।
করেছিল তারা ভারত শাসন সত্য স্বীকার করি॥
শাসন করিয়া শোষণ করেছে দস্তে কেঁদেছে দেশ।
কেঁদেছ আমার ভারতমাতা পাষান করুনার লিশ॥
যেদিন ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে দুলে ভারতে পড়ল শোক।
ভুলেনি ভুলেনি সেই মহাবীরে আজিও ভারতের লোক॥
যতীন্দ্রনাথ হলরে শহীদ ভাব ভাই তিলে তিলে।
মেদিনীপুরের নারী মাতঙ্গিনী গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে॥
তারপর এল গান্ধীর যুগ আন্দোলন হ'ল সুরু।
বিশ্ব আন্দোলনে ব্রিটিশের বুক কেঁপে উঠল দুরু দুরু॥
তখন ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ লাঠির গুতোয় মেরে পিঠে শাসন করি।
দলে দলে বীর বন্দী হয়ে যায় জেলখানার ঘরে॥
সেই রক্তদানের শুভ্র স্বাধীনতা ব্যর্থ যাতে না হয়।
তাই পঞ্চান্ন কোটি মায়ের সন্তান ভাই ভাই হওয়া চাই॥
আমরা গলে গলে মিশিব তবে স্বাধীনের স্বাদ পাইব—
ভাই গলে গলে মিশিব। (ধুয়া)
আমরা হিংসা দ্বেষকে দূর করিব
ভাই গলে গলে মিশিব। (ধুয়া)

দেশের কাজে এগিয়ে যাব
ভাই গলে গলে মিশিব। (ধুয়া)
অধম নৈমুদ্দিনের এই মন্তব্য গো
বর্ষে ধর্মে এগিয়ে চল
ভাই গলে গলে মিশিব।
হায়রে সোনার বাংলা আমরা সবাই কেন মানুষ হব না।

(গায়কের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—(পুরুষের প্রবেশ) গান

ও বাঙ্গালী, ও কৃষক দল,
এগিয়ে চল ভাই মাঠের কাজে।
মোদের দেহে আছে বল,
ক্ষেতে আছে জল,
ধর চেপে হাল সকাল সাঁজে।
মোদের হাতে ক্ষুধার অন্ন,
নয় ভাই মোরা নগন্য,
আদর্শতে হয়ে গণ্য
মিশব মোরা বিশ্ব মাঝে।

নারীর প্রবেশ। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি গান করছ? আগে গান থামাও

পুরুষ। কেন গান থামাব?

নারী। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। সেই কবে প্রশ্ন করেছি, এখনও তার উত্তর দিলে না কেন?

পুরুষ। কি প্রশ্ন করেছিলে?

নারী। প্রশ্নটাই ভুলে গেলে? তোমরা কেমন গো?

পুরুষ। আহা, রাগ কর না। এবার ঠিক উত্তর দেব। কি প্রশ্ন বলত?

নারী। জগতে কে বড়? পুরুষ বড় না নারী বড়?

পুরুষ। কেন? এত ঠিকই হয়ে আছে। জগতে পুরুষ বড়।

নারী। না। মোড়লকে ডেকে প্রমাণ কর—বড় কে।

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল। তোমাদের ঝগড়ায় কি গ্রামে থাকা যাবে না? সকাল-সন্ধ্যায় সব

সময় ক্যাচর-ম্যাচর আর ঝগড়া ঝাটি। তোরা বড় হিংসুটে। কি হয়েছে? সব খুলে বল্। আগে শুনি।

নারী। মোড়ল মশাই। আমি ওকে প্রশ্ন করেছি—কে বড়। কি সে বড়?

পুরুষ। আমি বলেছি পুরুষ বড়। পুরুষের সঙ্গে কি তোরা পারবি? কখনও পারবি না।

নারী। নারী বিনে একদিন চলবে না। নারী ছাড়া সংসার চলে না। সব অচল। ওরে শ্যাম কেলে, তোদের খেটেখুটে আনার পর ঘরে রান্নাবান্না করে কে। কে তোদের মুখের অন্ন সামনে ধরে দেয়? হেসে কার পাশে বসবি?

মোড়ল। এটা ঠিক কথা। এটাই ঠিক।

পুরুষ। তোদের রান্না নলাম না। রান্না করব খাব। ঝাট-কাড়ু সন্ধ্যা বাতি নিজেই করব।

নারী হতে পুরুষ বড় ব্যক্ত আছে চরাচর
নারীর ক্ষমতা কি বল আমি জানাচ্ছি সকল।

মোড়ল। ঠিক বলেছ ভাই, পুরুষই বড়।

নারী। নারী না হলে সংসার বাড়বে বল কিসে?
পুরুষে-পুরুষে সন্তান কোন জায়গায় হয়েছে।
নারীর গর্ভে সন্তান হয়েছে বলে জানাই দশের কাছে।

মোড়ল। এটাই ঠিক। ঠিক বলেছ।

পুরুষ। বুধ রাজা নামে ছিল ঋটরাজ দেশেতে,
পুরুষে-পুরুষে সন্তান সেই জায়গায় হয়েছে,
নারী নারী সন্তান হইল,
হাড় তাহার নাহি ছিল,
শুধু মাংসপিণ্ড রয় আমি জানাচ্ছি সবাই।

মোড়ল। এটা তো ঠিক কথা। এটাই ঠিক।

নারী। শোনরে মরা-গুড়ার দল,
বলি জানাই তোরে
নারী না হইলে সংসার চলবে কেমন করে?
কাশীতে শিব অন্নপূর্ণা,
ধ্যানরূপে হয় জান না,
সে ভিক্ষা করেছিল। পুরুষের ক্ষমতা কি বল?

পুরুষ। তোরাই তো রাক্ষসী ধনী জানি সর্বজনা,
তোদের লাগি ত্রিশুলধারী করে আনাগোনা,
যাহার ঘরে অন্নপূর্ণা
সে যদি না ভিক্ষে করে
নারীর অহঙ্কার বেড়ে যেত,
আমি করলাম সমাপ্ত।

নারী। এবার স্বীকার করলাম পুরুষ বড়। (পুরুষের পদে মাথা নত করা হল) পুরুষের পদসেবায় নারীর স্বর্গ।

মোড়ল। হ'্যা, এটাই ঠিক সকলে মিলেমিশে সুখেশান্তিতে থাক।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানসমূহ এবং আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা

সি. রাজেশ্বর রাও

"আমাদের দেশে বিপ্লবের বিষয়গত উপাদানসমূহ কি পরিপক্ক ?"—আমাদের পার্টির অনুগামী এক তরুণ ছাত্র একদা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি বলেছিলাম—"এক কথায় 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। পরিস্থিতিটা খুবই জটিল। উপরন্তু, বিপ্লবের বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদান-সমূহকে তুমি যান্ত্রিকভাবে পৃথক করতে পারো না। সেগুলো পরস্পর সম্পর্কিত। এই সব কিছু দেখলে তোমরা 'বিপ্লব' থেকে এখনও বহু দূরে। একটি সঠিক কর্মসূচী, পরিপ্রেক্ষিত, স্লোগান এবং রণকৌশল সহযোগে জনতার তীব্র অসন্তোষকে যথাযথ খাতে প্রবাহিত করতে হলে তোমাদেরকে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে, যাতে করে জনতাকে সেই রকম অবস্থানে নিয়ে আসা যায় এবং সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, যা হল এরকম গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত।"

আমাদের দেশে বিপ্লবের প্রশ্নটি একটি প্রাণময় বিষয়, যা আজকে আমাদের দেশের বিভিন্ন ধারার বামমার্গীয় যুবকদের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট যুবকদের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। এই বিষয়ে তাদের সামনে সমুপস্থিত বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীতে তারা বিভ্রান্ত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আমার উপলব্ধির আলোয় এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে এটাই আমাকে চালিত করেছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার পূর্বে সফল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত, আমাদের শিক্ষক ও পথ-প্রদর্শক লেনিনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এই বিষয়ে লেনিন কী বলেছিলেন তা পাঠকবর্গ নিজেরাই পড়ুন—এটা যখন আমি চাই, তখন লেনিন থেকে দীর্ঘ

উদ্ধৃতি দিচ্ছি বলে তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন। তাঁর বিখ্যাত "বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা" (Left-wing Communism, an Infantile Disorder)-বইতে লেনিন বলেছেন :—"সমস্ত বিপ্লব এবং বিশেষভাবে বিংশশতাব্দীতে অনুষ্ঠিত তিনটি রুশ বিপ্লবের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন বিপ্লবের মৌলিক নিয়ম হল—পুরোনো কায়দায় বাঁচা অসম্ভব এইটুকু উপলব্ধি করা এবং পরিবর্তন দাবি করাই কেবল শোষিত ও নির্যাতিত জনতার পক্ষে বিপ্লবসাধনের জন্য যথেষ্ট নয় ; বিপ্লব সংঘটিত হবার জন্য এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় যে পুরোনো কায়দায় বাঁচতে এবং শাসন করতে শোষকরাও আর সক্ষম নয় কেবলমাত্র তখনই বিপ্লব জয়যুক্ত হবে যখন 'নিম্নশ্রেণীগুলি' পুরোনো কায়দায় বাঁচতে অনিচ্ছুক এবং 'উচ্চ শ্রেণীগুলি' পুরোনো কায়দা চালিয়ে যেতে অপারগ। এই সত্যটি অন্যভাবেও বলা যায় :—সমগ্র দেশব্যাপী এক সংকট (যা শোষিত ও শোষক উভয়কেই প্রভাবিত করবে) ব্যতীত বিপ্লব অসম্ভব। এর থেকেই আসে—বিপ্লব সংঘটনের জন্য সর্বপ্রথম যা আবশ্যিক তা হল, শ্রমিকশ্রেণীর বৃহদংশকে (অথবা অন্ততঃ শ্রেণীসচেতন, চিন্তাশীল এবং রাজনীতিগতভাবে সক্রিয় শ্রমিকশ্রেণীর বৃহদংশ) পূর্ণত উপলব্ধি করতে হবে যে বিপ্লব প্রয়োজনীয়, এবং তার জন্য তাঁদেরকে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত থাকতে হবে ; দ্বিতীয়ত—শাসকশ্রেণী এমন এক সংকটের মধ্যে পড়বে, যা এমনকি সবচেয়ে পশ্চাদপদ জনতাকেও রাজনীতিতে আকর্ষণ করবে (একটি প্রকৃত বিপ্লবের লক্ষণ ইতিপূর্বে সহানুভূতিহীন, এমন শ্রমজীবী ও শোষিত জনতার পরিমাণে দ্রুত দশ গুণ, এমনকি একশ' গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এক রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠনে সক্ষম হয়ে ওঠা), সরকারকে দুর্বল করবে, এবং বিপ্লবীদের দ্বারা তাকে দ্রুত ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব করে তুলবে।"

অন্য একটি রচনায়—**দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন (The Collapse of the Second International)**—লেনিন এই বিষয়টি আরও অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন :—

মার্কসবাদীর কাছে এটা তর্কাতীত যে বিপ্লবে উত্তরণক্ষম একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ব্যতীত বিপ্লব অসম্ভব। সাধারণভাবে সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণসমূহ কী ? আমরা নিশ্চয়ই ভুল করব না যদি নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান প্রধান লক্ষণসমূহের প্রতি আমরা অঙ্গুলিনির্দেশ করি: (১) যখন কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে শাসকশ্রেণীর পক্ষে তাদের শাসন কায়েম রাখা অসম্ভব,

যখন কোন না কোনভাবে 'উচ্চ শ্রেণীগুলির' মধ্যে, শাসকশ্রেণীর নীতির মধ্যে একটি সংকট সমুপস্থিত, যা থেকে এমন এক ফাটল তৈরী হয় যার মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণীসমূহের অসন্তোষ ও ক্রোধ তৎক্ষণাৎ ফেটে পড়ে। বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার জন্য নিম্ন শ্রেণীগুলির পুরোনো কায়দায় বাঁচতে অনিচ্ছা থাকাইসাধারণত যথেষ্ট নয়; 'উচ্চশ্রেণীগুলির' পক্ষেও পুরোনো কায়দায় বাঁচতে অক্ষম 'হওয়াটাও প্রয়োজনীয়'; (২) যখন নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের দুর্গতি ও অভাব সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি তীব্র হয়ে ওঠে। (৩) যখন উপরোক্ত কারণসমূহের ফল-স্বরূপ জনগণের সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে ওঠে, যে জনগণ 'শান্তির সময়ে' বিনা অভিযোগে নিজেদেরকে লুণ্ঠিত হতে দেয়, কিন্তু আলোড়নের সময়ে একযোগে সংকটের সমগ্র পরিস্থিতি এবং 'উচ্চশ্রেণীসমূহ'র নিজেদের দ্বারাই উপনীত হয় তাঁদের স্বাধীন ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে।

"কোনো ব্যক্তিসমষ্টি এবং পার্টি, এমনকি নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহের স্বাধীন-ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এই বিষয়গত পরিবর্তনসমূহ ব্যতিরেকে সাধারণতঃ বিপ্লব অসম্ভব। এই সমস্ত বিষয়গত পরিবর্তনসমূহের যোগফলকে বলা যায় একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। রুশিয়ায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং পাশ্চাত্যের সকল বিপ্লবগুলির কালসমূহে এইরকম পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল; গত শতাব্দীর ষাটের দশকে জর্মানিতে এবং ১৮৫৯-৬১ ও ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়াতেও এই পরিস্থিতি ছিল, যদিও এই সব ক্ষেত্রে কোনও বিপ্লব হয় নি। কেন হয় নি? কারণ প্রত্যেক বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই বিপ্লবের জন্ম দেয় না; বিপ্লব সংঘটিত হয় সেই রকম পরিস্থিতিতেই যখন উপরোক্ত বিষয়গত পরিবর্তনসমূহের সঙ্গে একটি বিষয়ীগত পরিবর্তনও যুক্ত থাকে, আর সেই বিষয়ীগত দিকটি হল—বিপ্লবী শ্রেণীর—যার কখনও, এমনকি সংকটের সময়ও পতন হয় না, যদি না তাকে উৎখাত করা হয় সেই পুরোনো সরকারকে ভেঙ্গে ফেলার (বা স্থানচ্যুত করার) মত যথেষ্ট শক্তিশালী বৈপ্লবিক গণকর্মোদ্যোগ গ্রহণ করবার মত ক্ষমতা।

"এ-ই হল বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী, যা বহু বহুবার বিকশিত হয়েছে এবং সকল মার্কসবাদীদের দ্বারা তর্কাতীতভাবে গৃহীত হয়েছে; আর আমাদের, রুশদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় রূপে প্রমাণিত হয়েছে" ১৯০৫-এর অভিজ্ঞতায়।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কর্তব্য শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশকে মতাদর্শগত-ভাবে জয় ক'রে আনা। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেনিন তাঁর Left-wing

Communism-এ সতর্ক করেছেন : "কেবলমাত্র অগ্রবাহিনীর দ্বারাই বিজয় অর্জন করা যাবে না। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী, ব্যাপক জনগণ অগ্রবাহিনীর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থনের অথবা একটি সহানুভূতিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও শত্রুর প্রতি সমর্থন-সহিত অবস্থান গ্রহণ করার পূর্বে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে একটা চূড়ান্ত লড়াই-এ ঠেলে দেওয়াটা শুধুমাত্র নির্বুদ্ধিতাই নয়, অপরাধ-জনকও। পুঁজির দ্বারা উৎপীড়িত একটি সমগ্র শ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক জনতার এই রকম অবস্থান গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র প্রচার আর বিক্ষোভ যথেষ্ট নয়। তার জন্য জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। সমস্ত মহান বিপ্লবগুলির এইটিই হল মৌলিক সূত্র, আর শুধুমাত্র রুশিয়ায় নয়—জার্মানিতেও এটাই সঞ্চালক শক্তি হিসেবে ও সজীবরূপে নিশ্চিত প্রতিপন্ন হয়েছে।"

লেনিনের মতে বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার জন্য নিশ্চিতরূপেই চাই 'এক দেশ-ব্যাপী সংকট' যার মধ্যে জনতা আর 'চাইবে না পুরোনো কায়দায় বাঁচতে' এবং উচ্চশ্রেণীগুলোও 'সক্ষম হবে না পুরোনো কায়দা চালিয়ে যেতে'। অর্থাৎ সমগ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই একটা গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে আবদ্ধ হবে; জনতা মরীয়া হয়ে উঠবে, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন আর যাপন করতে চাইবে না এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য এগিয়ে আসবে; আর শাসক শ্রেণীগুলি এমন চরম বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে যখন তাদের পক্ষে তাদের ইচ্ছা আর জনতার উপর চাপিয়ে দেবার মত অবস্থান থাকবে না।

এই সমস্ত বিষয়গত অবস্থা একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি গড়ে তোলে। কিন্তু প্রত্যেক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি থেকে আপনা-আপনিই বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায় না। যাকে বিষয়ীগত উপাদান বলে, সেই বিপ্লবী অগ্রগামী শ্রেণী ও তার পার্টির পক্ষেই কেবল বিপ্লবের সফলতায় আগ্রহী সকল শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ঘটানোর জন্য একটি যথাযথ কর্মসূচী, স্লোগান ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করা সম্ভব। নিজে বিচ্ছিন্ন না হয়ে বিপ্লবী অগ্রগামী শ্রেণী ও তার পার্টিকে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের নিজস্ব রাজনৈতিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে তাদেরকে বিপ্লবের অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের মহান শিক্ষক লেনিন-বর্ণিত বিপ্লবের সফল সমাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানসমূহের এ-ই হল সংমিশ্রণ।

লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি এই সমস্ত নীতি সমূহকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল নেতৃত্ব দিয়েছিল যা ১৯১৭-এর মার্চে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করে আবার ১৯১৭ এর নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করেছিল। যদি জানতে হয়, তৎকালীন রুশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যথাযথ স্লোগান ও কৌশল সমূহের মাধ্যমে কী অতুল-ভাবে শ্রমজীবী জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসাধনের অবস্থানে উপনীত করা গিয়েছিল তা জানতে, তাহলে এই দুই বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত অন্তর্বর্তীকালকে অনুধাবন করতে হবে। লেনিন ও বলশেভিক পার্টি যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে সেগুলির যান্ত্রিকভাবে অনুকরণ করা উচিত—এমন নয়, যেহেতু কোন দুটি বিপ্লবই একেবারে একরকম হয় না। তবে বৈপ্লবিক গণ আন্দোলনের সফল অগ্রগমনের স্বার্থে আমরা নিশ্চয়ই লেনিনের সূত্র-বিজ্ঞান অনুধাবন করতে পারি এবং আমাদের দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারি।

আমাদের দেশের পরিস্থিতির বিচারে এটা পরিস্কারভাবে বলা দরকার যে আমাদের দেশ এক অর্থনৈতিক সংকটে জড়িয়ে পড়েছে এবং এক রাজনৈতিক সংকটও সুরু হয়েছে। স্বাধীনতার সময় থেকে কংগ্রেসী শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথ-বিকাশ একেবারে প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে এবং এই পথে আর কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিই সম্ভব নয়। মূল্যমানের উর্ধ্বগতি, তীব্র বেকারসমস্যা এবং চরম দারিদ্র্য জনতার দুর্দশা এবং অসন্তোষকে চরম সীমায় এনে ফেলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজতন্ত্রের দিকে চালিত জাতীয় গণ-তন্ত্রের পথে চূড়ান্তভাবে সংস্থাপন করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানও করা যাবে না বা দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করাও যাবে না। এটা খুবই সুলক্ষণ যে আমাদের জনগণের বামমুখীন ঝোঁক রয়েছে এবং তাঁরা এটাও চান যে দেশটা বামদিকে চলুক। এই জন্যেই ১৯৭১-এর লোকসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর আজকাল প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলিও জনতার অসন্তোষকে ভ্রান্তপথে চালিত করতে বাকসর্বস্ব স্লোগান ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে।

অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, গুজরাটের ঘটনাবলী এবং গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণ পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের মতই যে কোন প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের মুখে শাসকদল কংগ্রেস

কেবলই বিকল হয়ে পড়ছে। আমাদের দেশের প্রগতিশীল নীতিসমূহকে উল্টে দিয়ে অন্য কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল অংশও বাইরের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাত মেলায়।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও আঞ্চলিক উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলি এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ গত পাঁচ বৎসরাধিককাল ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে আমাদের দেশের প্রগতিশীল বিকাশ-সমূহকে স্তব্ধ করা যায় এবং ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণ এবং প্রকৃত বামপন্থী শক্তিগুলির দ্বারা—যার মধ্যে আমাদের পার্টি একটা খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে—তাদের ষড়যন্ত্রগুলি একের পর এক ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি অনেক বেশি মরীয়া হয়ে উঠেছে। বাকসর্বস্বতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, ভাষাগত ও আঞ্চলিক উগ্রতা—ইষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কোনও অস্ত্রই তারা বাদ দিচ্ছে না।

একথা সত্য যে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক উগ্রতার অস্ত্রগুলির ব্যবহার সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলি উগ্র আঞ্চলিকতাবাদীদের খোলাখুলি দাবীগুলিকে সরাসরি সমর্থন জানাতে পারে না। একইরকমভাবে অসাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলিও জনসংঘ ও আর এস এস-এর উলঙ্গ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করতে পারে না। তবু একথাটা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলির চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবাদী দলগুলি অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার চেলা-চামুণ্ডারা এই সমস্ত প্রতিক্রিশীল ও উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে সর্বতোভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ভারত যাতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার কোলে ঢলে পড়ে এবং তাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মধ্যে আনীত হয়, তার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা স্থিতপ্রতিজ্ঞ।

বর্তমান পরিস্থিতির সর্ববৃহৎ নেতিবাচক উপাদানটি হল, বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির এবং কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশসমূহের অনৈক্যবদ্ধ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে রাজনৈতিক হতাশা ও অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতার বশবর্তী হয়ে সি. পি. এম ও সোস্যালিস্ট পার্টির মত বামপন্থী দলগুলি

বামপন্থী সুবিধাবাদের রাজনীতি গ্রহণ করেছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া ও উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলির সঙ্গে একই লক্ষ্যাভিমুখী বা যুক্ত কর্মকাণ্ডে হাত মেলাচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে সোস্যালিস্ট পার্টির নেতারা যখন প্রতিক্রিয়া ও উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলির সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলাচ্ছে, তখন সি. পি. এম-নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে সমলক্ষ্যাভিমুখ কর্মসূচী পরিচালনায় হাত পাকাচ্ছে। এই কারণে সকল পার্টির নেতারা কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশসমূহকে লালন করতে অস্বীকার করে এবং এমনকি প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

মাওবাদী চক্রগুলি—সাধারণভাবে যারা নকশালপন্থী নামে অভিহিত—দেশের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে একেবারেই খাপছাড়া। এটাও যেমন সত্য যে শ্রমজীবী জনতার চরম দারিদ্র ও দুর্দশা তাদেরকে উদ্বেল করে তোলে, তেমনি লুট, অগ্নি-সংযোগ, গুলিবর্ষণ এই ধরনের যেকোন সরকার-বিরোধী আন্দোলন এমনকি তা প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, তাদের কাছে বিপ্লবী। কাজেই অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের মত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন—যার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি নেতৃত্বের ভূমিকায় আছে—এমনকি সেগুলিতেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে নকশালপন্থী যুবকরা তাদের গেরিলাযুদ্ধ ও আদর্শবাদের জন্য সোৎসাহে জঙ্গলে গিয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই তারা মোহমুক্ত হল এবং শহরে ফিরে এল। বর্তমানে নকশালপন্থী আন্দোলন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশকে নিয়ে কলেজগুলিতে সীমাবদ্ধ আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, মাওবাদী পত্রিকাগুলি তাদের প্রধান আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, আর সেটা দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রসমূহ যেভাবে কুৎসা করে থাকে সেইভাবেই অর্থাৎ অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি ভাবে ভারত ও অন্যান্য পশ্চাদপদ দেশগুলিকে শোষণ করছে, ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়গুলিতে ও উপরোক্ত দক্ষিণপন্থী আন্দোলনগুলিতে অতি দক্ষিণ ও অতি বাম শক্তিগুলি এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও অতি বাম ও অতি দক্ষিণ শক্তিগুলির মধ্যে সমীকরণ করা অসমিচীন হবে এবং সেটা শুধু এইজন্যই নয় যে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের যাত্রা শুরু, বরং এই কারণেও যে এই দুই বিপরীত শক্তির শ্রেণীগত উৎপত্তি ও গঠন বিভিন্ন।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার মত অপর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, কংগ্রেস অনুগামী

শ্রমজীবী জনতা তাদের দুঃখদুর্দশা উপশমের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী বা ঘনিষ্ঠতা, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ও এই ধরনের ক্ষেত্রে বামমার্গীয় কংগ্রেসীরা প্রগতিশীল অবস্থান গ্রহণ করলেও তারা গণ আন্দোলনে আসে না। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সাধারণভাবে মিলিত হবার কোন মঞ্চ না থাকায় এই সেদিন পর্যন্ত তারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। সুখের কথা যে, তাদের সাম্প্রতিক কনভেনশনের পর তারা এইরকম একটা সাধারণ মঞ্চ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। গণ আন্দোলন ও সংগ্রামে অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে তাদেরকে শামিল করানো দরকার। একবার তারা আন্দোলনে শামিল হলে তখন মধ্যপন্থী কংগ্রেসীদেরও বামদিকে প্রাগ্রসর করানো সম্ভব হবে, যেটা বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বর্তমান সময়ে একত্রীভূত বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি মিলিতভাবেও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সক্ষম নয়। দেশে বিশাল বিশাল অঞ্চল আছে, যে সব জায়গায় বামপন্থী পার্টিগুলির হয় অস্তিত্বই নেই, নয় থাকলেও খুব দুর্বল। প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সংযুক্ত এবং জয় করে একবার শামিল করতে পারলে এই ন্যূনতা পূরণ করা যায়। এটা স্মরণে রাখা উচিত যে, বাম ও মধ্যপন্থী কংগ্রেসীরা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে সম্মিলিত হয়েছিল বলেই বিগত পাঁচ বছরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রগুলিকে পরাস্ত করা গিয়েছিল। আজকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে এখানেই বামমার্গীয় কংগ্রেসীদের গুরুত্ব, আর এখানেই তাদের দুর্বলতাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে গণ-সংগ্রাম ও গণ আন্দোলনে তাদেরকে শামিল করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীদের সহ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সর্বব্যাপী ঐক্য এই মুহূর্তের প্রয়োজন।

সফল বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য যে কোনো দেশে অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় উপাদান হল বিপ্লবের নেতৃত্বদায়ী সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী ও তার দল কমিউনিস্ট পার্টি।

আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের দেশ বেশ কিছুটা শিল্পোন্নত এবং আমাদের একটা বিরাট শ্রমিকশ্রেণী আছে। এটা সত্য যে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের খুব জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে বড় বড় সংগ্রাম এবং কখনও কখনও রাজনৈতিক

সংগ্রামেও অবতীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অনৈক্য আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে গুরুতর দুর্বলতা। এটা সুবিদিত যে আমাদের শ্রমিকশ্রেণী যেমন বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে তেমনি কংগ্রেসের মধ্যে এবং জনসঙ্ঘের মত প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মধ্যেও বিভক্ত। সাম্প্রদায়িকতা-বর্ণবৈষম্যবাদ, ভাষাগত ও আঞ্চলিক উগ্রতার মত ক্ষতিকর এবং অনৈক্যের প্রবণতাগুলির প্রভাবও এদের উপর আছে। এই কারণে শ্রমিকশ্রেণী গুরুতর সীমাবদ্ধতায় ভুগছে, যেটা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে বাধা

শ্রমিকশ্রেণীর উপর আমাদের পার্টির যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু সেই শ্রেণীর মধ্যে এখনও তা নিয়ামক উপাদানে পরিণত হয় নি। শ্রমিকশ্রেণী এগোচ্ছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত অবস্থানে এখনও তাদের গরিষ্ঠ অংশকে আনা যায় নি।

১৯৬৪ সালে পার্টি বিভক্ত হওয়ার সময় থেকে গত দশকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং বামপন্থী সুবিধাবাদ ও হঠকারিতা এই উভয়ের বিরুদ্ধেই সি. পি. আই-কে তীব্র লড়াই চালাতে হয়েছে। এটা আমাদের পার্টির কৃতিত্ব যে মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহের প্রতি আমাদের আনুগত্য, আমাদের পার্টির নির্ভুল কর্মসূচী, নীতি ও কৌশলসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নগুলিতে তার নীতিনিষ্ঠ অবস্থান এবং আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থ রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা—এই সমস্ত কারণে এই কঠিন সময়েও আমরা আমাদের মাথা উঁচু রাখতে পেরেছি। যদি আরও বেশি কিছু না করা গিয়ে থাকে, তাহলে তা হল কতকগুলো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতা, যা এই দীর্ঘ সংসদীয় গণতন্ত্রের আমলে আমাদের পার্টির ভেতরে পুঞ্জীভূত হয়ে গভীর শিকড় রোপণ করেছে, তারই জন্য। যদিও আমাদের পার্টি স্থিরচিত্তে জনগণের উপর প্রভাব ও সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছে এবং এক রাজনৈতিক সম্মান অর্জন করেছে, তথাপি এটা স্বীকার করতে হবে যে দেশের বিপুলতার তুলনায় আমাদের পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পার্টির প্রভাবও সুসমবিস্তৃত নয়। কতকগুলো রাজ্যে আমাদের পার্টি দুর্বল এবং এমনকি অনেকগুলি রাজ্যের বহু অঞ্চলে আমাদের পার্টির আদৌ অস্তিত্ব নেই। মাওবাদী গ্রুপগুলি এবং কোন কোন বামপন্থী সুবিধাবাদীদের দ্বারা উত্থাপিত ছদ্ম-বিপ্লবী স্লোগান প্রসঙ্গে আমাদের দেশের

পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়নের সময় যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হবে।

পরিস্থিতির খুব ইতিবাচক উপাদানগুলির অন্যতম হল অত্যন্ত সহায়ক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। এটা একটা স্বীকৃত ব্যাপার যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন গভীর সংকটে বিজড়িত, অমোচনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব শিকার ও ক্ষীয়মান, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিজয়গর্বে অগ্রসরমান। এটাও সহায়ক ব্যাপার যে, আমাদের দেশের অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের একটা ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও শক্তি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আর আহরণ করতে পারছে না। যদি সোভিয়েত-বিরোধিতার শিকার না হয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তারা বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার জন্য বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কাছ থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে।

এক কথায়, আমাদের দেশের পরিস্থিতি একটা জটিল ব্যাপার। এর উপাদানগুলি হল: সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার সংকট, জনতার তীব্র অসন্তোষ, যা গণসংগ্রামে ফেটে পড়ছে, শাসক কংগ্রেস দলে তীব্র সংকট, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর ষড়যন্ত্রসমূহ, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য, সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অনৈক্য, কমিউনিস্ট পার্টির তুলনামূলক দুর্বলতা এবং অত্যন্ত সহায়ক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।

আমাদের দেশের এই রাজনৈতিক চিত্র থেকে কোনও নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমীচীনতা নেই। ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বিধ উপাদানই বিদ্যমান। জনতার বামমুখীন ঝোঁক ও গণ-উত্থান এবং অত্যন্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মত ইতিবাচক উপাদানগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অনৈক্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অনৈক্যের মত নেতিবাচক উপাদানগুলিকে অতিক্রম করা যায়। মহান লেনিন যেমন বলেছেন, তেমনি জনগণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাদেরকে ধাপে ধাপে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অগ্রগমনের পথে নিয়ে যাওয়া যায়। মতাদর্শগতভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের অবস্থানে নিয়ে আসা,

বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামগ্রিক ঐক্য এবং কমিউনিস্ট পার্টি যাতে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাকে শক্তিশালী করার মত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ীগত উপাদান-সমূহ অর্জনের উপায় এই বৈপ্লবিক অগ্রগমনের পথে নির্মাণ করা যাবে। লেনিন সতর্ক করেছেন যে, যদি কোন তড়িঘড়ি ও হঠকারী রাস্তা গ্রহণ করা হয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানসমূহের পরিপূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে তা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিনাশ রচনার পথ প্রশস্ত করবে। এই ধরনের অবিমৃষ্যকারী কাজ কেবল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চূর্ণ এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকে সহায়তা করবে, আর এই ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে দক্ষিণপন্থীরা গত পাঁচ বছরে চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে।

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আজকের দিনে বিপ্লব সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

পশ্চিমবাংলায় একটি বা দুটি বামপন্থী পার্টি ব্যতীত আর সকল বামপন্থী পার্টি মনে করে যে বর্তমানের স্তরটি হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, যার পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। পশ্চিমবাংলার কোন কোন বামপন্থী পার্টি মনে করে যে এটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। এই মতটিকে আমাদের খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এটা একটি খুব ক্ষুদ্র অংশের ঝোঁক।

মাওবাদীরা বর্তমান বিপ্লবের স্তরটিকে 'নয়া গণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করে। তারা বলে যে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ প্রস্তুত। তারা মনে করে যে, চীনে যেমনটি হয়েছিল সেই ভাবে এখানে বিপ্লব সংঘটিত হবে, অর্থাৎ প্রথমে কৃষকদের পার্টিজান যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের ভিত্তি গড়ে উঠবে, পরে শহরগুলি ঘেরাও হবে এবং লড়াই-এর শেষ ধাপে সেগুলি দখল হবে। এই ধারণা অনুযায়ী, শ্রমিকশ্রেণী হবে দর্শক এবং তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার থাকবে না। এই ধারণার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের অব্যবহিত পরে আমাদের পার্টির অন্ধ্র কমিটি এই রকম একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিল, আর জীবনই একে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দিয়েছে। উক্ত চিন্তাধারার অনুবর্তী হয়ে মাওবাদী গ্রুপগুলি

ইদানীংকালে যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল, তা ব্যক্তি সন্ত্রাস ও ডাকাতির মত কাজের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনের কোন ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

সি পি আই (এম)-নেতৃত্ব মাওবাদীদের এই লাইন বর্জন করেছে। কিন্তু ক্রমগভীর সংকট, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং এই সব ব্যাপারে তারা নানা রকম বামপন্থী বাকসর্বস্বতায় কালাতিপাত করে। আমাদের বিপ্লবের পথের প্রশ্নে তারা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫১ সালের দলিলকে এখনও আঁকড়ে আছে। সেই দলিলের সারমর্ম হল—গ্রামাঞ্চলে পার্টিজান যুদ্ধ এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন যৌথভাবে বিপ্লব করবে। সি পি আই (এম)-এর এর্নাকুলাম কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত দলিলের মর্মার্থ, লড়াই-এর এই দুই উপাদানের মধ্যে কোনটি প্রধান হয়ে দাঁড়াবে, বর্তমানে তা বলা যায় না; আর এটা কেবল বিপ্লবের সময়েই জানা যাবে।

সি পি আই এবং সি পি আই (এম) তাদের কর্মসূচীতে বলেছে যে বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ে না এমন, অথচ অবশ্যই বিপ্লবী গণ-সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে তারা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি অর্জন করার প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু উভয় কর্মসূচীতেই সতর্ক করা হয়েছে যে শাসক শ্রেণীগুলি অত সহজে ক্ষমতা ত্যাগ করতে নাও পারে। কাজেই বিপ্লবী শক্তিগুলির এমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত বা কাজকর্ম পরিচালনা করা উচিত যাতে করে তারা সকল রকম অনিশ্চিত ভবিতব্যের মুখোমুখি হতে পারে।

কিন্তু বিপ্লবী শক্তিসমূহের উপর শাসক শ্রেণীগুলি কর্তৃক অশান্তিপূর্ণ পথ চাপিয়ে দেওয়ার মত ঘটনা যদি ঘটেও, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই মত পোষণ করে যে, আমাদের মত মাঝামাঝি ধরনের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে, যেখানে অসংখ্য এবং বিকশিত শ্রমিকশ্রেণী আছে, সেখানে কৃষক-আন্দোলনের সাহায্য পুষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট এবং তার সঙ্গে হয়তো পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক-কৃষকের এই কর্মকাণ্ডগুলির পরিপূরক হিসেবে পার্টিজান কৃষক সংগ্রাম-এর পথ ধরে বিপ্লব আসবে। গ্রামাঞ্চলের পার্টিজান যুদ্ধকে প্রধান অঙ্গ হিসেবে নিয়ে বর্তমানে এমনকি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চালানো সম্ভব, যেমন সোভিয়েত অস্ত্রপুষ্ট এঙ্গোলা ও মোজাম্বিক-এর পর্তুগীজ উপনিবেশ দুটিতে হচ্ছে। প্রধানত সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায় সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে এই সেদিন গিনি বিসাউ পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করল।

ভারতবর্ষের মত একটি দেশ, যেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছে, সেখানে এটা সফল হতে পারে না। আমার ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানা আন্দোলন (The Historic Telengana Movement) বইটিতে বলা হয়েছে :—

"নিজাম-শাসন অবসানের পরও সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার যদি কোন যাথার্থ্য থেকেও থাকে, তবু শ্রীকাকুলামে এই পথ চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। গত ২৫ বছরে আমাদের দেশের শিল্প, যান-বাহন, বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে একটি প্রকাণ্ড, আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী। আমাদের দেশে যদি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে, তাহলে তা চীনের পথ ধরে ঘটবে না, যে চীনে বড় বড় গণ আন্দোলনে শামিল হবার মত শক্তি সর্বহারা শ্রেণীর ছিল না। ভারতের সর্বহারাশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান যেভাবে হবে, সেই হবে বিপ্লবের পথ। চীনের মত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সক্রিয় অংশগ্রহণ না করে, বলতে গেলে, শুধু নেপথ্যে থেকে তারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে না।" আবার—

"আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, আমাদের দেশে এখন বা এখন যে পরিস্থিতি বিদ্যমান, তাতে সশস্ত্র পার্টিজান যুদ্ধ প্রধান প্রক্রিয়া হিসেবে বা উল্লেখিত রণকৌশলসংক্রান্ত দলিলে যেমন সূত্রবদ্ধ আছে তেমন চলবে না। যদি আমাদের বিপ্লব অ-শান্তিপূর্ণ পথ গ্রহণ করে, তাহলে প্রধান প্রধান নগর-কেন্দ্রগুলিকে ঝড়ের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে যদি তাতে নেতৃত্ব দেয় এবং তা যদি আবার বহুবিস্তৃত সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের দ্বারা সমর্থিত হয়, কেবল তবেই তা সফল হবে।"

আমাদের দেশে ঘটনাসমূহের বিকাশ যে ভাবে ঘটছে, তাতে মনে হয়, গণ-মানসিকতা যে ভাবে বামপন্থার দিকে ঝুঁকছে, এবং দিনের পরদিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশ যে ভাবে নিজেদের (অর্থাৎ দক্ষিণপন্থার—অনুবাদক) প্রতিকূল হয়ে উঠছে, তা প্রত্যক্ষ করে আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মরীয়া হয়ে উঠছে। কাজেই তারা ক্ষমতা দখল করবার জন্য প্রত্যেকটি অস্ত্র ব্যবহার করছে এবং প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র-সমূহের জাল বিস্তার করছে। অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, উত্তর প্রদেশের পুলিশবিদ্রোহ, বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক-কাঠামো বিধ্বংসকারী আন্দোলন এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের সতর্কতাসূচক সংকেত। এছাড়া

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সহায়তায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ মদদ দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশে নানারকম বিভেদমূলক কার্যকলাপ ও উগ্র জাতীয়তাবাদকেও সাহায্য করছে

এই পরিস্থিতিতে এমনও ঘটতে পারে যে এই সমস্ত প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রগুলোকে চূর্ণ করেই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক অগ্রগতির দিকে এগোতে হবে।

যাই হোক না কেন, আমাদের দেশ হল অত্যন্ত জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর একটি বিশাল দেশ। এরই ফলস্বরূপ রাজনৈতিক কাঠামোটিও খুব জটিল। কোন সরলসূত্রই কার্যকরী হবে না জনতার বামমুখীন উত্থানকে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ প্রগতিশীল অংশসমূহ সমেত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে নীতিনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংক্ষিপ্ত পথ, সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ এবং অনাবশ্যক হঠকারিতা কেবলমাত্র আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের ক্ষতিসাধনই করবে।

অনুবাদ : অরুণি ইন্দ্র

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে সি পি এম কোন পক্ষে ?

নরহরি কবিরাজ

ভারতের রাজনীতিক আকাশে আজ ঝড় উঠেছে। একদিকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি যাদের পুরোভাগে রয়েছে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি, অপরদিকে রয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি। প্রশ্ন উঠেছে—এই শক্তি প্রতিযোগিতায় সি পি এম কোন্ পক্ষে ?

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরিণাম

আজ যাঁরা সি পি এম পার্টিতে রয়েছেন দশ বছর আগে তাঁরা ছিলেন সি পি আই-এর অংশ। ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন সি পি আই জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্যের নেতৃত্বে সি পি আই সদস্যদের একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে নতুন পার্টি গঠন করে। তার নামকরণ হয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এঁরা শুধু সি পি আই থেকে চলে গেলেন তাই নয়, তাঁরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কোনো একটি কমিউনিস্ট গ্রুপের পক্ষে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা—একটি মামুলি ব্যাপার নয়। এটি এমন এক ঘটনা যা তাকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে নিক্ষেপ করে, যা তাকে আন্তর্জাতিকতাবাদের সড়ক থেকে জাতীয়তাবাদের সড়কে টেনে নামাতে পারে।

আন্তর্জাতিকতা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। লেনিন কমিন্টার্ণকে (আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে) বলতেন—"আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টি।" তাঁর মতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আন্তর্জাতিক পার্টির বিভিন্ন 'সেকশন' (section)। কাজেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশিদিন কমিউনিস্ট থাকা যায় কি না—এটাই প্রধান প্রশ্ন। সি পি এম-কেও এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেও

আন্তর্জাতিকতাবাদের সড়ক থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতীয়তাবাদের পথ বেছে নিচ্ছে কিনা—এটাই বিচার্য বিষয়।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সি পি এম নেতাদের মত-বিরোধের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই নেতারা যখন সি পি আই-এর মধ্যে ছিলেন সেই সময়েই তাঁরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনটির সমালোচনা আরম্ভ করেন। তখন তাঁদের সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস-এর (১৯৫৬) সিদ্ধান্তগুলি। তাঁদের ধারণা ছিল বিংশতি কংগ্রেস মার্কসবাদকে সংশোধন করেছে, দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের লাইন গ্রহণ করেছে। ১৯৬০ সালে মস্কোতে একাশি পার্টির যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিংশতি কংগ্রেসের লাইনটি সমর্থন লাভ করে। অবশ্য চীনের পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের লাইনটি নিজের মত ব্যাখ্যা করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে চীনের নেতৃত্বে একটি পাল্টা কমিউনিস্ট সেন্টার গঠনের চেষ্টা চলে। বর্তমানের সি পি এম নেতারা তখন চীনের পার্টির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। চীনের লাইনটি অধিকতর সঠিক ধরে নিয়ে তাঁরা সি পি আই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন পার্টি গঠন করেন। এইভাবে তাঁরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

কাজেই দেখা যায়, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির মূল্যায়নকে কেন্দ্র করেই সি পি আই এবং সি পি এম-এর মধ্যে মত পার্থক্যের সূত্রপাত। সি পি এম-এর অতি সাম্প্রতিক প্রস্তাবেও বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদের মূলে রয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, যেখান থেকে সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছে। (কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)। অবশ্য, তাতে এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে—সোভিয়েত সংশোধন বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীন সঠিক নেতৃত্ব দেবে তারা আশা করেছিল। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয় নি। আক্ষেপের সুরে বলা হয়েছে চীন সোভিয়েত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে সংকীর্ণতাবাদের পথ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে সি পি এম নেতারা কর্মীদের এই বলে আশ্বাস দিতে চাইছেন—তাঁরাই মার্কসবাদের পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রামে নেমেছেন, তাঁরা সোভিয়েত সংশোধনবাদ ও চীনের সংকীর্ণতাবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অনেকে

এই প্রচারে প্রতারিত হয়ে বলে থাকেন সি পি এম সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে একটি "সমদূরত্বের নীতি" অনুসরণ করে চলেছে।

কথাটা কতটা গ্রহণযোগ্য তা একটু বিচার করা যাক।

একথা ঠিক সিপিএম চীনের মাওপন্থী নেতাদের সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয়। সি পি এম-এর লাইনের সঙ্গে নকশালপন্থীদের লাইনের পার্থক্যও উপেক্ষার বস্তু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সি পি এম-এর লাইন সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে সমদূরত্বের লাইন ভাবলে ভুল হবে। সি পি এম-এর লাইন আজও চীনের লাইনের কাছাকাছি। সি পি এম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক প্রস্তাবের বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তারা এখনও ১৯৬৩ সালে চীন থেকে প্রচারিত "পঁচিশ পয়েন্ট" দলিলের প্রতি আনুগত্যে অচল রয়েছে। সি পি এম কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশেষ প্রস্তাবে নতুন করে সোভিয়েত বিংশতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ওপর আক্রমণ—এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের সর্বশেষ প্রস্তাবে তাঁরা আরও বোঝাতে চেয়েছেন যে অনুন্নত দেশগুলির প্রতি মনোভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছাকাছি, আর চীনের অবস্থান অপেক্ষাকৃতভাবে এই দেশগুলির অনুকূলে। (কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব)

এখন আসল প্রশ্নে আসা যাক। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ লাইনের ওপর সি পি এম-এর এই তীক্ষ্ণ এবং ধারাবাহিক আক্রমণের কারণ কি ?

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে গৃহীত রিপোর্টে এবং পরবর্তীকালে গৃহীত পার্টি কর্মসূচীতে নতুন যুগ (new epoch) সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়। সেটি সি পি এম নেতাদের মনঃপূত নয়। তাতে বলা হয় আমরা আজ যে যুগে বাস করছি সেটি আর সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের যুগ নয়, এটি হল "ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ।" সোভিয়েত পার্টির এই বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে একাশি পার্টির সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে, তার গুরুত্ব উল্লেখ করে একাশি পার্টির দলিলে বলা হয়েছে—"আজ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সেই সব শক্তি, যারা সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সপক্ষে সংগ্রাম করছে, এরাই সমাজের আন্তর্জাতিক বিকাশের প্রধান মর্মবস্তু, প্রধান ধারা এবং প্রধান

বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারিত করছে। সাম্রাজ্যবাদ যতই চেষ্টা করুক, তারা ইতিহাসের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না।"

বিংশতি কংগ্রেস তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন জোর দিয়ে বলতে চাইছে যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শক্তির তারতম্যে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হবার ফলে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সামনে একটি নতুন, বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বলছে—এই নতুন পরিস্থিতিতে আগের মতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত রয়েছে, আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হিসাবে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ নতুন শ্রেণী সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে ঐ কাজগুলি সম্পন্ন করার পক্ষে একটি বিশেষ সুবিধাজনক, অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন, নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে নতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিটি, যা সাম্রাজ্যবাদ এতকাল মেনে নিতে চায় নি, আজ শক্তি-সম্পর্ক পরিবর্তিত হওয়ায়, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তা একেবারে অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রতিবিপ্লব রপ্তানী করার সুযোগ সঙ্কুচিত হবার ফলে বিভিন্ন দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনাও আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই বিশ্লেষণ সি পি এম নেতারা মেনে নিতে রাজি নন। অথচ, এই বিশ্লেষণ না মানার অর্থ হবে : আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার নির্ধারক ভূমিকা উপেক্ষা করা, আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে বিপুল শক্তি বৃদ্ধির ফলে বিশ্বশান্তির অনুকূল পরিস্থিতিতে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে অগ্রাহ্য করা। সি পি এম নেতাদের কাছে আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রাম, ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রভৃতি যুগ-নিরপেক্ষ কতকগুলি বিমূর্ত

ধারণা! বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থা সামনে রেখে এই নীতিগুলির প্রয়োগই যে সৃজনশীল মার্কসবাদ এ কথা তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন না নতুন অবস্থাটি উপলব্ধির মধ্যে না এনে শুধুমাত্র ঐ নীতিগুলি বারে বারে উচ্চারণ করা যে কতকগুলি অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণের মত—তা তাঁরা বুঝতে চাইছেন না।

সি পি-এম এর সর্বশেষ দলিলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন (detente) সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে তাও আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে ভ্রান্ত চিন্তা পোষণের ফল। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন সম্পর্কে সি পি এম নেতাদের অবস্থানে এবং সোভিয়েত পার্টি তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবস্থানে গুরুতর পার্থক্য বর্তমান। একদিকে নকসালপন্থী, অপর দিকে, আর এস পি, এস ইউ সি প্রভৃতির মত সি পি এম আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। ঐ পার্টিগুলির মত সি পি এম-ও এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের মধ্যে অন্যায় কোলাকুলির লক্ষণ, সোভিয়েত সংশোধনবাদের নবতর প্রকাশ।

এই চিন্তার মধ্যে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত ট্রট্স্কীর সেই তত্ত্বটির প্রভাব পড়ছে যার মূল কথা হল : যুদ্ধের সম্ভাবনা যত বাড়বে, বিপ্লবের গতিও তত ত্বরান্বিত হবে। অপর দিকে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা যত হ্রাস পাবে, বিপ্লবী পরিস্থিতিতে তত ভাঁটা পড়বে।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের মধ্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিক রয়েছে সেটিকে এঁরা পুরোপুরি উপেক্ষা করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের অর্থ কি? এর অর্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের রাজনীতি আরম্ভ করেছিল তা আজ পরাস্ত হতে চলেছে। এর অর্থ মোটেই এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদ তার আগ্রাসী প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে, অথবা সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম স্থগিত রাখতে চলেছে। এর কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমেই বেশি বেশি পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদকে তার কৌশল বদলাতে হচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেও মুখোমুখি ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষমতা সে ক্রমশ হারাচ্ছে; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সরাসরি আক্রমণ করার ক্ষমতা আজ আর তার নেই; তাই সে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো কোনো দাবি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরাজয় সূচিত হচ্ছে। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি

অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। নতুন অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রতিবিপ্লব রপ্তানী করা অধিকতর কঠিন কাজ হয়ে উঠবে। এর ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকের ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের সামনে, সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সামনে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে। নতুন অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম অবশ্যই চলবে, তবে নতুন কায়দায়, নতুন ভঙ্গীতে। এটাই হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গ্রহণে ব্যর্থতা প্রমাণ করছে যে সি পি এম নেতারা আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামের শক্তি দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মোটেই সজাগ নন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই তাঁরা আন্তর্জাতিকাবাদী দৃষ্টি থেকে বিশ্ব সমস্যা বিচার করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মার্কসবাদের পবিত্রতা রক্ষা বা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার যত শপথ তাঁরা গ্রহণ করুন, সি পি এম নেতারা তাঁদের সহকর্মীদের বেশিদিন বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। কেননা, সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিন্দা করে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আন্তর্জাতিকতাবাদী থাকা যায় কি না, কমিউনিস্ট থাকা সম্ভব কি না—এ প্রশ্ন তাঁদের মনে অবশ্যই উঠবে।

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ন

এই আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টি থাকা বা না থাকার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সামনে না রেখে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বিচার করতে গেলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

সদ্য স্বাধীন দেশগুলির বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে আজকের দিনে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট চরম আকার ধারণ করতে চলেছে, এই সংকট ক্রমশই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এই সংকটের বোঝা সদ্য স্বাধীন দেশগুলির মাথায় চাপিয়ে দিতে চায়। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির বিরোধ আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈল সম্পদ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে আরব দুনিয়ার তীব্র দ্বন্দ্ব এই বিরোধেরই প্রতিফলন।

তাই দেখা যাচ্ছে, ভারতে ডঃ কিসিঞ্জার কয়েক দিন এসে অনেক মধুর কথা বললেও, তিনি ভারত ছাড়ার পরমুহূর্তেই এমন কতকগুলি কাজে আমেরিকা জড়িয়ে পড়েছে যাকে ভারত সরকারের পক্ষেও ভালো চোখে দেখা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে আমেরিকার আগ্রাসী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ভারত মহাসাগরে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি নির্মাণের প্রস্তুতির কথা, এই অঞ্চলে ন্যাটো রণতরীর সদম্ভ মহড়া প্রভৃতি। তাছাড়া, মার্কিন সাহায্যের শর্তগুলি হজম করাও ভারত সরকারের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়ছে। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন বহুজাতিক করপোরেশনগুলির অনুপ্রবেশের প্রশ্নটি কংগ্রেস নেতৃত্বকে চিন্তিত ক'রে তুলছে।

মার্কিন সরকার যতই ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করুক যে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হবার দিকে চলেছে, আসলে তা ঘটছে না, ঘটতে পারে না। তার কারণ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সংকটাপন্ন, ক্ষয়িষ্ণু, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যতই বেশি সংকটাপন্ন হচ্ছে ততই তার আগ্রাসী চরিত্রটি আরও উদ্ঘাটিত হচ্ছে। মার্কিন সাহায্যের শর্ত আরও কঠোর হয়ে উঠছে। মার্কিন-ভারত সম্পর্কে উন্নতি আনার পক্ষে ভারত সরকারের যতই সদিচ্ছা থাকুক না, সেটা বেশিদূর অগ্রসর হবার নয়। কেননা ভারত সরকারকে খুসি করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার আগ্রাসী চরিত্রটি কিছুতেই সংবরণ করবে না।

এই জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীকে মোকাবিলা করতে হবে। তাকে বিচার করতে হবে তারা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রের কাছে বেশি বেশি আত্মসমর্পণ করবে কি না।

আগের দিন হলে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার প্রভুত্বের দিনে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে ইচ্ছা না থাকলেও নতি স্বীকার করতে হত। কিন্তু আজ সেই দিন নেই। আজ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আজ বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশগুলি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়, তারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ রুখতে চাইছে।

এই অবস্থায়, ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে বিকাশলাভ করছে।

একদিকে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কাজকর্মে এবং অন্যদিকে মধ্য ও ছোট বুর্জোয়াদের কাজকর্মে পার্থক্য ক্রমশ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠছে। একচেটিয়া বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী পরিকল্পনার সঙ্গে আপোষ করে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, যে পথ বেছে নিতে চায় সেটি হল সুহার্তোর পথ, ইরানের শাহের পথ, ভুট্টোর পথ। অপর দিকে, জাতীয় বুর্জোয়ার মাঝের তলা ও নীচু তলার অংশ অন্য পথ গ্রহণ করতে চায়। তারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে দেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাটি অব্যাহত রাখতে চায়। তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে সুবিধাজনক শর্ত আদায় করতে চায়, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ—এদের লাইন নয়। লাতিন আমেরিকার পানামা সরকার, মেক্সিকো সরকারের মত ভারতের সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে বিশেষ আগ্রহী।

ভারতের রাজনীতি কোন দিকে মোড় ফিরবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করবে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার এই পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ার ওপর। এই প্রক্রিয়াটি আগামী দিনে সংকুচিত হবে না, বরং প্রসারিত হবে। তার কারণ বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার সঙ্গে এই প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষমতা যত হ্রাস পাবে, এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তি যত বৃদ্ধি পাবে, ততই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করবে।

সি পি এম-এর সর্বশেষ প্রস্তাবে দেখা যায় আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি যে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। অথচ ঘটনাটি এত বড় যে প্রকারান্তরে তাদেরও এটি স্বীকার করতে হচ্ছে। তাদের প্রস্তাবে একাধিকবার বলা হয়েছে—ভারতের শাসক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে না, কেননা তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি—এটি কি ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রকাশ নয়? সি পি এম-এর মতে এটি হল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর 'কষাকষি' মাত্র, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও দেশীয় বুর্জোয়ার মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ মাত্র!

সি পি এম নেতারা জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে কি আশা করেন?

জাতীয় বুর্জোয়ারা কি শ্রমিক ও কৃষকের মত ধনতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সুস্থির ভাবে সংগ্রাম করবে ?

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা এই যে এরা ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে থাকবে, কিন্তু যেহেতু তারা নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়া, তাই তারা বিদেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই কারণেই লেনিন বলেছেন—তারা জাতীয় অন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকে, এমন কি জাতীয় আন্দোলনের একটি স্তরে এরা নেতৃত্বও দিতে পারে।

লেনিনের এই শিক্ষার আলোকে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা বিচার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে থেকেও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দেশপ্রেমিক অংশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তা সে সংগ্রাম যতই সীমাবদ্ধ হোক। আসল কথা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার বিরোধ আজও নিঃশেষিত হয় নি। বরং নতুন পরিস্থিতিতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতির কল্যাণে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধের বস্তুভিত্তিটি আরও প্রসারিত হয়েছে।

জয়প্রকাশের প্রতি সমর্থন সি পি এম-কে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে ?

জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি সামনে রেখেই একদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণ গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম বিচার করতে হবে।

এটা আকস্মিক ব্যাপার নয় যে জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রধান সঙ্গী হলেন কংগ্রেস (সংগঠন), স্বতন্ত্র পার্টি, বি কে ডি, বিজু পট্টনায়ক প্রভৃতি। এক কথায় সেই রাজনৈতিক দলগুলি যেগুলি ভারতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার প্রধান বাহক। শ্রেণীগত দিক থেকে যারা ভারতের রাজনীতিতে একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত তন্ত্রের প্রতিভূ।

এদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যোগাযোগ খুবই স্পষ্ট। এরা কমিউনিস্ট-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী। বিশ্বে আজ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামে তারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপক্ষে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা চীনের মাওপন্থী নেতাদের সোভিয়েত বিরোধী কার্যকলাপের বিশেষ সমঝদার

এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ কোণঠাসা। এদের (জমিদার, কালোবাজারী এবং ফাটকাবাজ হিসাবে) জনবিরোধী কার্যকলাপের দরুন এরা জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে নিন্দিত। তারা তাদের কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছে।

সেই সুযোগ তারা পেয়েছে ভারত সরকার অনুসৃত কাজকর্মের মধ্যে। ভারত সরকার ধনতন্ত্রের পথটি আঁকড়ে থাকার ফলে, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আমাদের অর্থনীতি গড়ে ওঠায়, ভারতের অর্থনৈতিক সংকট অভূতপূর্বভাবে তীব্র আকার ধারণ করেছে। মুদ্রাস্ফীতি, দরবৃদ্ধি, বেকারী এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে উঠেছে। এই সংকটের বোঝা জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের এই বিক্ষোভ কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এই কাজে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনি জাতীয় আন্দোলনের একজন সুপরিচিত নেতা ; শুধু তাই নয়, আগস্ট আন্দোলনের তিনি একজন 'হিরো' বলে সাধারণের কাছে পরিচিত। তাই তাঁর একটি বামপন্থী 'ইমেজ' আছে। এই ইমেজকে দক্ষিণ-পন্থীরা বিশেষভাবে কাজ লাগাচ্ছে।

এই ইমেজকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণপন্থীরা, এমন কি বামপন্থী পার্টিগুলির একটি অংশকেও, টেনে নামাতে সক্ষম হয়েছে। আর এস পি খোলাখুলিভাবেই জয়প্রকাশের আন্দোলনকে গণ-আন্দোলন বলে রায় দিয়েছে। এস ইউ সিও সেই পথেই মোটামুটি চলতে চাইছে। জয়প্রকাশের মাও-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে নকশালপন্থীরা তাঁর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছে। সি পি এম-ও তার সর্বশেষ প্রস্তাবে জয়প্রকাশের "দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান এবং আইনসভা ভাঙার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে"। যদিও তার আক্ষেপ এই আন্দোলন এখনও 'অসম্পূর্ণ' এবং এখনও দক্ষিণপন্থী ঘেঁষা। অর্থাৎ সি পি এম এই আন্দোলনকে মূলত সঠিক বলে মনে করছে, এবং তার 'অসম্পূর্ণতা' পরিপূরণের সে আশা পোষণ করছে।

অথচ কে না জানে যে জয়প্রকাশ নারায়ণের এই বামপন্থী ইমেজকে ব্যবহার করা হচ্ছে একটি দক্ষিণপন্থী কর্মসূচী অনুসরণ করার জন্যে। জয়প্রকাশ নারায়ণের কর্মসূচীতে সত্যিকারের বামপন্থী কর্মসূচী বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ

বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির ওপর আক্রমণ, কৃষকের স্বার্থে ভূমি-সংস্কার—এই সবের কোনো স্থান নেই।

জয়প্রকাশ নারায়ণ খুব ভালভাবেই সেটা জানেন। তাই তিনি বার বার জানিয়ে দিচ্ছেন শ্রমিক ও কৃষক তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি নয়। শ্রমিকদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন এরা অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কৃষকদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন—এরা নিরক্ষর, অজ্ঞান,এদের রাজনীতি বোঝার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ তিনি জানেন তাঁর বামপন্থী ডাঁওতাবাজির দ্বারা তিনি শ্রমিক ও কৃষককে, বিশেষ করে, তার সচেতন অংশকে আকৃষ্ট করতে পারবেন না। এইজন্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিশেষ আবেদন মধ্য শ্রেণীর লোকদের কাছে। জয়প্রকাশ তাঁর বামপন্থী ইমেজ কাজে লাগিয়ে এই মধ্য শ্রেণীর লোকদের সমর্থন লাভ করতে চান। এই মধ্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পড়ে ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, কনট্রাকটর, গ্রাম্য মধ্যবিত্ত, অফিস কর্মচারী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর একাংশ; বিশেষ করে মধ্য শ্রেণীর সেই অংশের কাছে তাঁর আবেদন যারা কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সেই হিসাবে বিশেষ বিক্ষুব্ধ। কিন্তু এই মধ্য শ্রেণীর শ্রেণী-অবস্থান বিশেষ ধরনের। এরা কংগ্রেস-রাজের বিরুদ্ধে গেলেও বিকল্প হিসাবে শ্রমিক-কৃষকের রাজ চায় না। মধ্য শ্রেণীর লোকদের সেই অংশের কাছে জয়প্রকাশের আবেদন যারা কমিউনিস্ট-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ ছাত্র ও যুবশক্তির একটি অংশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। তাঁর আবেদন ছাত্র ও যুবশক্তির সেই অংশের কাছে, যাদের সঙ্গে উপরোক্ত মধ্য শ্রেণীর লোকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, যারা উপরোক্ত মধ্য শ্রেণীর লোকদের মত কংগ্রেস-রাজ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ আবার শ্রমিক-কৃষক রাজকে ভয়ের চোখে দেখে। শ্রেণীচেতনার দিক থেকে অপরিণত, ছাত্র ও যুবশক্তির এই অংশকে তিনি বিশেষভাবে কাজে লাগাতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁর উৎসাহে গড়ে উঠছে ছাত্র-সংঘর্ষ কমিটিগুলি —জয়প্রকাশ আশা করেন সেগুলি একদিকে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলিও অন্যদিকে মধ্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবে। আমাদের দেশে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের পার্টিগুলির গণভিত্তি নেই; এই ছাত্র ও যুবশক্তি মধ্য শ্রেণীর লোকদের পক্ষে টেনে এনে এই পার্টিগুলির একটি গণভিত্তি তৈরী করতে সাহায্য করবে।

সি পি এম নেতারা কি একথা জানেন না যে সারা দুনিয়ায় দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি মধ্যশ্রেণীর লোকদের একাংশকে নিয়ে এই খেলায় মেতেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি শ্রমিকের শক্তির (working class power) বিরুদ্ধে ছাত্র শক্তিকে (student power) উপস্থাপন করে শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে প্রতিহত করতে চাইছে। এই উদ্দেশ্যে নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে—যার মূল কথা শ্রমিক আজ আর প্রধান বিপ্লবী শক্তি নয়, প্রধান বিপ্লবী শক্তি ছাত্র। কাজেই জয়প্রকাশ নারায়ণ বেশ ভেবেচিন্তেই, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তালে তাল রেখেই, এই ছাত্র শক্তির (student power) জয়ধ্বনি আরম্ভ করেছেন।

সি পি এম কর্মীরা কি ভেবে দেখবেন—কি মূল্য দিয়ে তাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন সমর্থন করছেন। শ্রমিক-শক্তি বনাম ছাত্র-শক্তির মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব সম্পর্কে কি তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করে চলবেন? বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিন্দার আড়ালে জয়প্রকাশ কর্তৃক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওকালতি দেখেও কি তাঁরা উদাসীন থাকবেন? জয়প্রকাশ নারায়ণ কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে যে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্ষমতা লাভের জন্যে ষড়যন্ত্র করছেন তাকে সাহায্য করবেন?

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এই মুহূর্তের প্রধান কাজ জয়প্রকাশ নারায়ণকে পুরোভাগে রেখে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া যে অভিযান আরম্ভ করেছে তাকে প্রতিহত করা।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই কাজে সাফল্য লাভ করা কি সম্ভব? কংগ্রেস সরকার, যেটি হল একচেটিয়া বুর্জোয়া সমেত সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সরকার তার পক্ষে প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার এই সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা, কংগ্রেস সরকার ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে রয়েছে, তার ফলে প্রতিনিয়ত একচেটিয়া পুঁজির শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। এমন কি, কংগ্রেস সরকারের ভিতরে অ-একচেটিয়া পুঁজির যে প্রতিনিধিরা রয়েছে তারাও একচেটিয়া বুর্জোয়া হবার স্বপ্ন দেখছে, কাজেই তারাও ধনতন্ত্রের পথ আঁকড়ে থাকবে। এই অবস্থায় বর্তমান কংগ্রেস সরকারের পক্ষে কোনো কাঠামোগত মৌলিক সংস্কার প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। অথচ কাঠামোগত মৌলিক সংস্কার ছাড়া ভারতে প্রতিক্রিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার অন্য কোনো পথ নেই।

জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকে

যদি পর্যুদস্ত করতে হয় তাহলে শ্রমিক শ্রেণীকে অগ্রণী ভূমিকা (vanguard role) গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণীকে অগ্রণী হয়ে ব্যাপক কৃষক জন-সাধারণকে, যারা জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তাদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমবেত করতে হবে। শহরের বিপুল পেটিবুর্জোয়া অংশকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল করতে হবে। গ্রামের ও শহরের মধ্যশ্রেণীর লোকদের, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবশক্তিকে, এই সংগ্রামে সমবেত করা—এই মুহূর্তের একটি বড় কাজ। কেননা, এই অংশকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া বিভ্রান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার অর্থ হবে—জাতীয় বুর্জোয়ার দেশপ্রেমিক অংশকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপকভাবে সমবেত করা। এই দিক থেকে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি চলেছে সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসের ভিরতকার প্রগতিশীল অংশ ত বটেই, এমন কি কংগ্রেসের ভিতরে যে মধ্যপন্থীরা রয়েছে তাদেরও এই সংগ্রামে টেনে নামাতে হবে। কংগ্রেসের বিভিন্ন অংশ যারা শাসক পার্টির অন্তর্গত, তাদের প্রতি সঠিক মনোভাব গ্রহণের ওপর এই আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে। জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ঠেলে দেওয়ার মত মূর্খতা আর কিছু থাকতে পারে না।

সি পি এম কি জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত হতে চলেছে ?

আমাদের দেশে এমন কতকগুলি বামপন্থী পার্টি আছে, যেমন সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস ইউ সি প্রভৃতি, যারা শ্রমিক শ্রেণীর নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, বার বার শপথ গ্রহণ করলেও মূলত পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টি। পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বলেই শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করলেও এরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, এরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনটিকে সর্বদা সংশোধনবাদী বলে নিন্দা করে। এক বিশেষ ধরনের সোভিয়েত বিরোধিতা এদের চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্মরণ করা প্রয়োজন, এই পার্টিগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, সোভিয়েত-বিরোধী, আন্তর্জাতিকতা-

বাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল (তারা জনযুদ্ধের স্লোগানটিকে উপহাস করত) এবং পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তদানীন্তন-কালে জাতীয় আন্দোলনকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছিল। তাই বলে এই পার্টিগুলি যে সংগ্রাম-বিরোধী তা নয়। নির্যাতিত, বিক্ষুব্ধ পেটিবুর্জোয়ার দৃষ্টি থেকে এরা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এরা ১৯৪২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলনের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করে এসেছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বামপন্থী অবস্থান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা-বিরোধী, জাতীয়তাবাদী অবস্থান এদের বিশেষত্ব। পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র এদের রাজনৈতিক লাইনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

দুঃখের হলেও সত্যি যে, সি পি এম চিন্তাধারার দিক থেকে এই পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির সঙ্গে ক্রমেই সমগোত্রীয় হতে চলেছে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত যে পার্টির কর্মীরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ বলে গর্ববোধ করত, তারা আজ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে, শুধু তাই নয়, তারা আজ আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টি থেকে বিশ্ব সমস্যা ও জাতীয় সমস্যা বিচারের ক্ষমতা হারাতে বসেছে। ক্রমশ তারা পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর শ্রেণী-অবস্থান গ্রহণ করছে। কাজেই সি পি এম-এর সঙ্গে অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির পার্থক্য ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। একই কারণে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনটি মেনে চলে, তার সঙ্গে তার মতপার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ঘৃণা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে অবিশ্বাস সিপিএম-কে আন্তর্জাতিকতাবাদের পথ থেকে জাতীয়তাবাদের পথে টেনে নামাচ্ছে কি না তা আজ সি পি এম কর্মীদের ভেবে দেখতে হবে। অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতা সি পি এম-কে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে কি না তা বিচার করতে হবে। প্রতিটি বিবেকবান সি পি এম কর্মীকে যাচাই করে নিতে হবে—ভারতে আজ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তাতে তিনি কোন পক্ষে ?

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বলতে কি বোঝায় ?

রণধীর দাশগুপ্ত

শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা কেবল তত্ত্বকথা নয়। সারা বিশ্বে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবই হল শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে এই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল অবিচ্ছেদ্য।

মার্কসীয় দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব থেকেই শ্রমিক-শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকার উৎপত্তি। এই তিনের সমন্বয়ে সমাজচিন্তার বিকাশে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

অন্যান্য দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতপদ্ধতির সঙ্গে মার্কসবাদের বৈসাদৃশ্য এই যে, মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র মেহনতী জনগণের মৌলিক স্বার্থ ব্যক্ত করে। মার্কসবাদ বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ব্যক্তি বা সংকীর্ণ কোন সম্প্রদায়ের মতবাদ নয়, এ হল শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে রচিত ও তাদের বিপ্লবী সংগ্রামে দিক্-দর্শন হিসেবে ব্যবহার্য এক দর্শন। মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শ, তার মূল স্বার্থের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি। মার্কস ও এঙ্গেলসের মহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তি হল এই যে, সমস্ত নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মানব জাতির মুক্তি—শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক কর্তব্যটিকে তাঁরা উদ্ঘাটিত করেন এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থায়, সমাজতন্ত্রে যাবার পথ দেখান।

প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণতাবাদী ও পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্মম লড়াই করে পথ করে নিয়েছে মার্কসবাদ। চিন্তার সঙ্গে সত্তার, আত্মার সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যে সম্পর্কের প্রশ্নে দার্শনিকেরা ভাববাদী ও বস্তুবাদী এই দুই শিবিরে বিভক্ত—এই মূল প্রশ্নটির চিরায়ত সূত্র এঙ্গেলস 'লুদভিক ফয়েরবাখ' নামক গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এবং 'লুদভিগ ফয়েরবাখ'

গ্রন্থে এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সঙ্গে মার্কসের বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ফয়েরবাখের বস্তুবাদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা উদ্ঘাটিত করেছেন। সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শন হল শ্রমিক-শ্রেণীর দর্শন এবং বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনের দর্শন।

মার্কসের অমর কীর্তি "ক্যাপিটাল" বইতে আছে পুঁজিবাদী সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়মগুলির প্রতিভাদীপ্ত বিশ্লেষণ, এই সমাজের উদ্ভব, বিকাশ এবং পতনের অনুসন্ধান। মার্কস উদ্ঘাটিত করেছেন পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিরোধের অনিবার্য তীব্রতাবৃদ্ধি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবিতা। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড বিষয়ে এঙ্গেলস তাঁর পর্যালোচনায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্য দেখিয়েছেন এবং বিবৃত করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, যা হল মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের খুঁটি। অতএব মার্কসীয় অর্থনীতি হল পুরাতন জীর্ণ সমাজব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের এক বিপ্লবী সমাজবিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা এবং সংগ্রামের অমোঘ অস্ত্র। শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা ও কর্মে স্বাতন্ত্র্য এই বিজ্ঞানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'কমিউনিস্ট ইশতেহার-' হল মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রের বনিয়াদী ধারণাগুলির একটা চিরায়ত বিবরণ। লেনিন মন্তব্য করেছেন—"প্রতিভাদীপ্ত স্বচ্ছতা ও ভাস্বরতায় এ রচনায় রেখাঙ্কিত হয়েছে নতুন বিশ্ববোধ, সুসঙ্গত বস্তুবাদ যা সমাজজীবনেও প্রসারিত, রেখাঙ্কিত হয়েছে বিকাশের অতি সর্বাঙ্গীন সুগভীর মতবাদস্বরূপ দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।" পুঁজিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে তত্ত্বগত হাতিয়ার দরকার, সর্বদেশের লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়েতের জন্য 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' সেটি জুগিয়ে দিয়েছে, তাদের জন্যে ছকে দিয়েছে সংগ্রামের একটি জঙ্গী কর্মসূচী।

অতএব দেখা যাচ্ছে মার্কসীয় দর্শন, অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এবং কর্মসূচীগত বিবরণ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অর্থনীতি, দর্শন এবং কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শ্রেণী-বিজ্ঞান।

শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভূমিকা এই তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্টরা অন্য শ্রেণীর কাছে নিজেদের স্বাধীন সত্তা ও ভূমিকা বিলীন করে দেয় নি বরং স্বাধীন ভূমিকা পালন করে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহারে বলা হয়েছে—"জার্মানীতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটিবুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।"

"কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এই জন্য যাতে, বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; এই জন্যই যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু করতে পারে।"

জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবকে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্টরা সমর্থন করেছিল এই কারণে যে, জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।

কমিউনিস্ট ইশতেহারে আরও বলা হয়েছে—"সংক্ষেপে বলা যায়, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে।" "শেষ কথা সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টি-গুলির মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্য তারা সর্বত্র কাজ করে।"..."খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্যসিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত।"

অতএব দেখা যাচ্ছে, মার্কসবাদের তত্ত্ববিকাশের কাজ গোড়া থেকেই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল একটি প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রামের সঙ্গে।

কিন্তু মার্কসবাদী তত্ত্ব কখনও থেমে থাকতে পারে না। প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় যে সব নিয়মের দ্বারা তার বিজ্ঞান হিসেবে, বিশ্বের বিপ্লবী

রূপান্তরের বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদী তত্ত্ব কখনও থেমে থাকতে পারে না নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ হয়ে চলতে হবে। মার্কসবাদ হল একটি জীবন্ত বিপ্লবী শিক্ষা, যা নিয়ত বিকশিত ও উন্নত হয়ে চলেছে। লেনিন মার্কসবাদকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন, যার সাফল্য মূর্ত হয়ে উঠেছে রুশ বিপ্লবে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সৃষ্টিতে। মার্কস ও এঙ্গেলস যেমন সমাজচিন্তার বিকাশে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন, লেনিন তেমনই মার্কসবাদকে আরও সমৃদ্ধ এবং সময়োপযোগী করে নভেম্বর বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে সারা বিশ্বে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস যার বনিয়াদ স্থাপন করে গিয়েছিলেন, সেই বিপ্লবী তত্ত্বকে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর করার প্রয়োজন ছিল। লেনিনের মহৎ কীর্তি এই যে, তিনি সেই কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। লেনিনবাদ হল মার্কসবাদের অনুবর্তন ও তার সৃজনশীল বিকাশ। এ হল নতুন যুগের দর্শন—যা হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ, সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণের যুগ, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের যুগ, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে মানবসমাজের উত্তরণ যুগ।

আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল বিশ্বদর্শন এবং একটি জীবন্ত বিপ্লবী শিক্ষা যার প্রয়োগে গড়ে উঠেছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং যার নায়ক ও রূপকার হল শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি। যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি দেশের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল, সেই একনায়কত্ব সেই দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। অতএব শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টি যদি তাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করার পরিবর্তে তাকে অন্য শ্রেণীর কাছে বিলীন করে দিত এবং সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বকে মোকাবিলা না করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পবিত্রতা রক্ষা না করত তা হলে বিশ্বের চেহারা ভিন্ন রকম হত, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

অতএব শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকাকে মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংগ্রামের একটা নিছক কৌশল মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব থেকে কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে সেই ভূমিকা যেমন বিলীন হয়ে যাবার আশংকা থাকে, তেমনই স্বতন্ত্র-

তার নামে একলা চলার আশংকাও থাকে। প্রথমটা হবে সুবিধাবাদ বা বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড় বৃত্তি, আর শেষোক্তটা হঠকারিতা এবং মতান্ধতা।

প্রত্যেক কমিউনিস্টের কাছে লেনিনের "What is to be done ?" বা "কী করতে হবে ?" একটা অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন অর্থনীতিবাদ, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করা যায় না। এছাড়া তার স্বাধীন ভূমিকা পালন করা অসম্ভব এবং কমিউনিস্ট কর্মী তৈরী করা অবাস্তব। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে অর্থনীতিবাদকে আক্রমণ করেছেন অথচ ট্রেড ইউনিয়নকে ব্যাপক ভিত্তি-সম্পন্ন করার জন্য দৈনন্দিন কাজের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মার্টিনভদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেখিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার সঙ্গে বিপ্লবী চেতনার, ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে বিপ্লবী সংগঠনের এবং উভয়ের মধ্যে শৃঙ্খলার বিরাট এবং গুণগত পার্থক্য আছে। ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা নীচের থেকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে কিন্তু বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কের মধ্য থেকে গড়ে উঠতে পারে না এই রাজনৈতিক শ্রেণীচেতনা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হয় বাইরের থেকে। ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠবে মার্টিনভের এই তত্ত্বকেও তিনি আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন "...Workingclass trade-unionist politics is precisely workingclass bourgeois politics." এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি বুর্জোয়া রাজনীতির গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না। অর্থনীতিবাদ ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে অবলম্বন করে বিপ্লবী পার্টি ও কর্মী তৈরী হয় না এবং বিপ্লবী শৃঙ্খলা বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। লেনিন বলেছেন—"We must 'go among all classes of population'' as theoreticians, as propagandists, as agitators and as organisers.'' অর্থাৎ সংগঠক, আন্দোলনকারী, প্রচারক এবং তাত্ত্বিক হিসেবে আমাদের জনসাধারণের সকল শ্রেণীর কাছে যেতে হবে। এর থেকে বোঝা যায় পার্টিকে কী রূপ ধারণ করতে হবে এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের কী কী গুণাবলী আয়ত্ব করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত দিকগুলি অনুশীলন করা সোস্যাল ডেমোক্রেটদের তত্ত্বগত কর্তব্য হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন—"He is no social democrat who forgets in practice

his obligation to be ahead of all in raising, accentuating, and solving every general democratic question." এর মর্মার্থ হল প্রত্যেকটি সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও সমাধানে সকলের অগ্রবর্তী হওয়ার দায়িত্ব যদি কার্যক্ষেত্রে ভুলে যান তা হলে তিনি সোস্যাল ডেমোক্রেটই নন। এর প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে যেমন ব্যাখ্যামূলক প্রচার করা প্রয়োজন, আন্দোলন সংগঠিত করা দরকার, তেমন পার্টির শৃঙ্খলাকে ট্রেড ইউনিয়নের শৃংখলার স্তরে টেনে নামাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এই কাজ না করলে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট হবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এবং পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে স্থান হবে বিভিন্ন দলগত গোষ্ঠীর।

কেবল পার্টি গঠনে নয়, রুশ বিপ্লবেও কর্মকৌশল গত প্রশ্নেও শ্রমিকশ্রেণীর ও পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকাকে কেন্দ্র করে লেনিনকে বিভিন্ন রংয়ের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বিশেষত মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের চরিত্র যেহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ছিল সেহেতু মেনশেভিকেরা বলেছিল, এ বিপ্লবের প্রধান শক্তি ও নেতা হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণী। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে ফরাসী বা জার্মান বিপ্লবের মৌলিক পার্থক্য আছে, সে কথাটা মেনশেভিকেরা গণ্য করে নি। সাম্রাজ্যবাদী যুগে যে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, এই ঐতিহাসিক সত্যটি অনুধাবণ না করার ফলে তারা বুর্জোয়া শ্রেণীকে ফরাসী দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মতই বিপ্লবে পরিচালক শক্তি মনে করে বুর্জোয়াদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। লেনিনকে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবের চরিত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হলেও বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এরা বিপ্লবের পরিচালক শক্তি হতে পারে না। বিপ্লবের পরিচালক শক্তি শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজ। ফরাসী বিপ্লব ও জার্মান বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব—এই তিনের সমন্বয়কে বিচার বিশ্লেষণ করে লেনিন বলেছিলেন শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ব্যতীত বিপ্লব সফল হতে পারে না।

লেনিন পরিষ্কারভাবে বলেছেনে—The revolution in our country is one of the whole people, the social democrats say to the proletariat. As the most progressive and the only thoroughly revolu-

tionary class. you should strive to play not merely a most active part in it, but the leading part as well. Therefore, you must not confine yourself within a narrowly conceived framework of the class struggle, understood mainly as the trade union movement; on the contrary, you must strive to extend the framework and the content of your class struggle so as to make it include not only all the aims of the present, democratic Russian revolution of the whole people but the aims of the subsequent socialist revolution as well." (Two Tactics of S·D in the Democratic Revolution.—Lenin)

এর থেকে বোঝা যায় বিপ্লবের কর্মকৌশলগত প্রশ্নে ও লেনিনকে শ্রমিক শ্রেণী ও পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে কী ভাবে মেনশেভিক-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বলতে কি বোঝায় তা লেনিন তাঁর বিখ্যাত ঔপনিবেশিক থিসিসে বলেছেন—"The significance of this change is that we, as communists, should and will support bourgeois-liberation movements in the colonies only when they are geniunely revolutionary, and when their exponents do not hinder our work of educating and organising in a revolutionary spirit the peasantry and the masses of the exploited. If these conditions do not exist, the communists in these countries must combat the reformist bourgeoisie, to whom the heroes of the Second International also belong." (Lenin's Report of the Commission on the National and Colonial questions)

এর মানে হল, কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের উপনিবেশের বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করা উচিত ও করব কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন এগুলি প্রকৃতই বিপ্লবী আন্দোলন, যখন কৃষক সম্প্রদায় ও ব্যাপক শোষিত জনগণকে বিপ্লবী প্রেরণায় শিক্ষিত ও সংগঠিত করার কাজে ঐ আন্দোলনের প্রতিনিধিরা আমাদের বাধা দেবে না এই সব শর্ত যদি না থাকে, তাহলে

এসব দেশের কমিউনিস্টদের লড়তে হবে সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে পড়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়কেরাও।

তিনি আরও বলেছেন—"The Communist International should collaborate provisionally with the revolutionary movement of the colonies and backward countries, and even form an alliance with it, but it must not amalgamate with it ; it must unconditionally maintain the independence of the proletarian movement, even if it is only in an embryonic stage." (Thesis on the National and Colonial questions).

"ঔপনিবেশিক ও পশ্চাৎপদ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে আবদ্ধ হতে হবে সাময়িক জোটে, কিন্তু তার সঙ্গে যাওয়া চলবে না এবং প্রলেতারীয় আন্দোলন একেবারে ভ্রূণাবস্থায় থাকলেও অবধারিত রূপেই তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।" (জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে থিসিস)

জাতিসমস্যা সম্পর্কে রোজা লাগজেমবুর্গের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন বলেছেন—"In so far as the bourgeoisie of the oppressed nation fights the oppressor, we are always, in every case, and more strongly than any one else, in favour, for we are the staunchest and the most consistent enemies of oppression. But in so far as the bourgeoisie of the oppressed nation stands for its own bourgeois nationalism, we stand against it." (Lenin : The Right of Nations to self-determination. p. 411-12, Collected Works vol 20)

এর তাৎপর্য "নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিপীড়নকারীদের সংগ্রামে আমরা সর্বদা, সর্বক্ষেত্রে এবং অন্য সকলের চেয়ে বলিষ্ঠভাবে তাদের পক্ষে, কারণ আমরা নিপীড়নের দৃঢ় ও অটল শত্রু। কিন্তু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পক্ষাবলম্বনের ক্ষেত্রে আমরা নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে।"

উপরোক্ত রচনাতে লেনিন যেমন পরাধীন দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রের কথা বলেছেন, তেমনই শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়ারা যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে তখন

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাহীন চিত্তে সেই সংগ্রামকে সমর্থন করে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট পার্টি তার স্বাধীন সত্তা ও ভূমিকাকে বিলীন করে দেয় না। বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্য ও সংগ্রামের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টি'র স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা না থাকলে ঐক্য ও সংগ্রামের কৌশল যে অবলম্বন করা যায় না তা বলা বাহুল্য মাত্র।

লেনিন কেবল নিপীড়িত দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি'র স্বাধীন ভূমিকার কথা বলেন নি। যে সমস্ত দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়েছে এবং পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে সেখানেও শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভূমিকাই ছিল প্রধান। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভ বলেছেন :

"Communists, of course, cannot and must not for a moment abandon their own **independent work** of Communist education, organisation and mobilisation of the masses. However, to ensure that the workers find the road of unity of action, it is necessary to strive at the same time both for short term and long term agreement that provide for joint action **with social democratic Parties, reformist trade unions and other organisations of the working people against the class enemies of the proletariat. The chief stress in all this must be laid on developing mass action, locally, to be carried out by the local organisation through local agreements. While loyally carrying out the conditions of all agreements made with them, we shall mercilessly expose all sabotage of joint action on the part of persons and organisations participating in the united front."** (Georgi Dimitrov : Selected Works. vol 2, p. 32-33)

এর মর্মার্থ হল : জনগণকে সংগঠিত করার স্বার্থে কমিউনিস্টরা মুহূর্তের জন্যও

কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত করার স্বাধীন কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, সংস্কারবাদী সংগঠন প্রভৃতি সকল মেহনতী জনগণের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে জোর দিতে হবে গণ-আন্দোলন বিকশিত করার দিকে, স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েও। কমিউনিস্টরা যেমন যুক্ত আন্দোলনের ঐক্যের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাবান হবে, তেমনি যুক্তফ্রন্টের ভিতরে সাবোতাজ-প্রয়াসী ব্যক্তি বা দলের মুখোস খুলে দিতেও কার্পণ্য করবে না।

ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনে যেমন স্থানীয়ভাবে যৌথ অভিযানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনই গুরুত্ব আরোপ করেছেন কমিউনিস্টদের স্বাধীন কাজ, সংগঠন এবং গণসমাবেশের উপর। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি, সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য শ্রমিকসংস্থার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছিল বলেই দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়েছিল। কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল। তাদের ত্যাগ এবং আত্মদানের ইতিহাস অতুলনীয়। এখনও সেই ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে নি। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনের জন্য যেমন মার্কসবাদী তত্ত্বে ও দর্শনে সমৃদ্ধ হতে হয়, বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করতে হয়, তেমনই ত্যাগ স্বীকার ও জীবনদানের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও বিপ্লবের ইতিহাস এই সত্যকেই বার বার প্রমাণ করেছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের উপর যারা গুরুত্ব আরোপ করে না তাদের অবস্থা ভিন্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর্ল ব্রাওডার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রগতিশীলতা আবিষ্কার করে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলোপ করে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ফস্টার আর্ল ব্রাওডারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছে এ রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদী

বিশ্বে বৃহত্তম পার্টি হয়েও নাসাকম'এ পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা বিসর্জন দিয়ে প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোকে কেবল সমর্থনই করেন নি, সোয়েকার্নোর সীমিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিরত ছিল। 'নাকসাম' থেকে পার্টি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকেও বিরত ছিল। শেষ পর্যন্ত হঠকারী কার্যকলাপের আবর্তে পড়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এর ফলে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টকে জীবন দিতে হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই অঙ্গ। মার্কসীয় তত্ত্ব ও দর্শন থেকে তার উৎপত্তি। কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকা ব্যতীত কোন বিপ্লবই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। বিশেষ করে যে যুগ হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ, সেই যুগে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এবং কমিউনিস্টদের দায়িত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ মানেই তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যুগ। পুঁজিবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, এমন কি সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিপ্লবকে সফল করতে হবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ পরাক্রমশালী একটা স্বতন্ত্র শক্তি। এই শক্তিই বিশ্ববিপ্লবের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সদ্যস্বাধীন দেশের সঙ্গে ঐক্য গঠন বিশ্ব বিপ্লবী ধারাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে যার ফলে উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের পরাজয় ঘটছে এবং যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা তিরোহিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদকেও আজ বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলশ্রুতি।

কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন ভূমিকা কোন একটা দেশের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এর একটা আন্তর্জাতিক চরিত্রও আছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধ দাবি করে, কোন একটা দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের কাছে অবনত হতে হবে বা তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর যে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দেশকে বিশ্বপুঁজিবাদের বিলোপ করার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এর নাম শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা। এ বিষয়ে অন্য সমস্ত পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা স্বতন্ত্র।

প্রয়োগ ও পূর্বশর্ত

কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করার অর্থ বিপ্লবে মিত্রশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা চলার পথ নয়। বিপরীতটাই সত্য। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকার গঠন করার প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হয়। এটা কেবল বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য নয়, যুগের বৈশিষ্ট্য বিচার করে বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই বিপ্লবের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্ততন্ত্র হলেও বিপ্লবী প্রক্রিয়া যতই তীব্র হয়ে উঠবে, ততই এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধাবিত হবে। এই বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীও অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এই ভূমিকা মূর্ত হয়ে ওঠে বিপ্লবের স্তর, রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ের মধ্যে। কেবল তা নয়, বিপ্লবের মূল শ্রেণীশক্তি ও তাদের মৈত্রী গড়ে তোলার সংগ্রামের মাধ্যমে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিপ্লবের প্রধান শত্রুকে কোন্ রণকৌশলের মাধ্যমে আক্রমণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী শক্তি সমাবেশের মাধ্যমে, শত্রুপক্ষের ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে, মতাদর্শ (বুর্জোয়া জাতীয়তা ও পেটিবুর্জোয়া হঠকারী মতবাদ), রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে বাদ দিলে পার্টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টি'র স্বাধীন উদ্যোগ ও ভূমিকা থাকলেই বাম ও দক্ষিণপন্থী কর্মকৌশল ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চলে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি মোহ থাকলে বা বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীর দেশপ্রেমিক অংশের ভূমিকাকে লঘু করে দেখলে বা এ সব বুর্জোয়ারা বিপ্লবের শক্তি নয়—একথা মনে করলে স্বতন্ত্র ভূমিকার নামে কমিউনিস্ট পার্টি'কে হঠকারিতার খপ্পরে পড়তে হয়। বিপ্লবের মূল শক্তি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ঐক্য গড়ে তোলার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। সেই শক্তি আরও সমৃদ্ধ হয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ এবং বামপন্থী পার্টি'র অনুসরণকারী শক্তির ঐক্যের মধ্যে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ফ্যাসিবাদী শক্তির সংঘাত যত তীব্র হচ্ছে, ততই আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল

শক্তির প্রতিবিপ্লব সোচ্চার হয়ে উঠছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির যৌথ সমন্বয় কমিটির পরিকল্পনাই হল সমস্ত রাজ্যে প্রতিবিপ্লবকে সংগঠিত করা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিলোপ করে শাসন-ক্ষমতায় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা। আজকাল প্রতিবিপ্লবী শক্তি কোন দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তারও একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে বলেই এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট। বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট যতদিন চলবে ততদিনই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে চক্রান্ত চালিয়ে যাবে। উপরন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কর্তৃক অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথ এবং জনগণের স্বার্থবিরোধী নীতির ফলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির বনিয়াদ এবং সামন্ত-তন্ত্রকে বিলোপ না করা পর্যন্ত কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ক্ষমতাদখলের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে।

যদিও কংগ্রেস সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের নেতৃত্ব অনুসরণকারী কংগ্রেস সদস্যরা জয়প্রকাশ নারায়ণের দ্বারা পরিচালিত প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করছেন, তথাপি জয়প্রকাশ কোম্পানীর সঙ্গে তাঁদের আপোসরফার আশংকা একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না, কারণ একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়ারা দ্বৈতচরিত্র-সম্পন্ন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধনের সাধারণ বনিয়াদ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ। বলা বাহুল্য, জয়প্রকাশ কোম্পানীও ধনতান্ত্রিক পন্থার পূজারী।

অতএব এই পরিস্থিতিতে শ্রেণীদৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, জয়প্রকাশী প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের পার্থক্য আছে। এই ক্ষেত্রে যেমন কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা পালন করতে হবে, তেমনই সরকারের অগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে। এই উভয় সংগ্রাম-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ে মেহনতী জনগণ যেমন শ্রেণী-চেতনায় সমৃদ্ধ হবে, তেমনই কংগ্রেস ও বামপন্থীর পার্টির অনুসরণকারীদের জয় করার পথ প্রশস্ত হবে। বিহার হচ্ছে তার পথপ্রদর্শক। বিহারের পার্টি যে কৌশল অবলম্বন করেছে—সেটাই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনের একটা নিদর্শন, যার

ফলে কংগ্রেসীরাও জয়প্রকাশের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে।

স্বভাবতই এই ভূমিকা পালন করতে হলে তাকে গণ পার্টিতে পরিণত হতে হয়। এটা কেবল আংশিক অর্থে নয়। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে হলে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে যেমন পার্টির সম্প্রসারণ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দরকার, তেমনই গণসংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা এক অপরিহার্য কর্তব্য। এ কাজ সম্পাদন করতে হলে কমিউনিস্ট পার্টির সামনে মতাদর্শগত, রাজনীতিগত, কর্মকৌশলগত এবং সাংগঠনিক ঐক্যকে দৃঢ় করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োগ ও অনুসরণ করার পরিবর্তে যে কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিভিন্ন উপদলীয় গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়, তা হলে সেই পার্টি বিপ্লবের শত্রুকে আঘাত করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, পরস্পর বিবদমান উপদলের মধ্যে বৈরীভাব সৃষ্টি হয় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সে-পার্টিকে দূরে সরে যেতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, ঐতিহাসিকভাবে পার্টির একশিলা ঐক্যের পরিবর্তে উপদল সৃষ্টি করা হচ্ছে পরাজয়ের পথ। যে পার্টি আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যাদের একাত্মবোধ রয়েছে, দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যাদের উপর নির্ভরশীল সেই পার্টির সর্বাঙ্গীন সংহতি ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য। এ ছাড়া বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এই কাজ খুবই কঠিন সন্দেহ নেই।

আলোচনা

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা বন্ধ হোক

সম্প্রতি একটি বিপজ্জনক ঝোঁক আমাদের চোখে পড়েছে। সেটি হল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্ববরেণ্য নেতাদের বক্তব্যকে বিকৃত করার ঝোঁক, অথবা যে প্রসঙ্গে এই বক্তব্য বলা হয়েছে—সেটি গোপন করে সম্পূর্ণ নিজের প্রয়োজনে ঐগুলিকে ব্যবহার করার ঝোঁক। কেউ কেউ আবার মার্কস ও কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার নিয়েই টান পাড়তে আরম্ভ করেছেন! কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরে আমি বিষয়টির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের দোহাই দিয়ে একজন লেখক বলতে চান—স্বয়ং মার্কসই ত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার কথা বলেছেন। এ প্রবন্ধ লেখক লিখেছেন—'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের ভাষ্য অনুযায়ী বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত দুটি মাত্র বিপ্লবী শ্রেণী'। এখানে মনে রাখা দরকার মার্কসবাদ একটি সৃজনশীল সমাজবিজ্ঞান। যখন সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হয়, তখন সমাজ-পরিবর্তনে বুর্জোয়ার ভূমিকা ছিল বিপ্লবী। কিন্তু আজ বিশ্ব পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত। সুতরাং আজ আর বুর্জোয়াদের আগের মত বিপ্লবী ভূমিকা নেই। বুর্জোয়াদের অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশ তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে কিছু কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে মাত্র। ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার যুগে তারা যাদের ব্যবহার করতো, সেই কৃষক ও মধ্যবিত্তদের কাছে আজ উন্নত সমাজতান্ত্রিক জগৎ ও ক্রমাগত সংকটে নিমজ্জিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান। সুতরাং তারা কোনমতেই ধনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা ও পুষ্ট করতে এগোবে না। অতএব বর্তমানে সবচেয়ে সুস্থিত বিপ্লবী শ্রেণী বলতে বোঝায় শ্রমিকশ্রেণীকেই। তবে কিছুদূর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সামাজিক শ্রেণীগুলি এক বিশেষ ধরনের বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে—'এ যুগ সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের যুগ—এ যুগ প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ'। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে স্থান কাল-পাত্র বিচার না করে

মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করতে যাওয়া সংস্কারবাদী চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঐ লেখক '৭৫-পার্টি দলিল' থেকেও একটি উদ্ধৃতি টেনেছেন—'It is of paramount importance for the prospects of anti-imperialist struggle to strengthen the alliance between the socialist system, the forces of working class movement and national liberation'. এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন 'আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে মুখ্য হিসেবে গণ্য করেছেন।' এই সিদ্ধান্ত লেখকের কি রকম মনগড়া তা আমি দেখাচ্ছি—৮১ পার্টি দলিল থেকে এবং ৭৫ পার্টি দলিল থেকে। ৮১ পার্টি দলিলে বলা হয়েছে—"জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষায়, সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে ও সামাজিক প্রগতি সুনিশ্চিত করার পক্ষে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এই মৈত্রী এক ব্যাপক জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তি রচনা করে। মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কতখানি অংশগ্রহণ করে বা না করে তা-ও নির্ভর করে বিশেষভাবে এই মৈত্রীর শক্তি ও স্থায়িত্বের উপরে। জাতীয় দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, দেশের এমন সমস্ত মানুষ এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান অবস্থায়, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন জাতীয় বুর্জোয়ারা বাস্তব ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী মুখ্য কর্তব্যসাধনে আগ্রহান্বিত; আর সেইজন্যই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা তারা বজায় রাখতে পারে। সেই অর্থে এরা প্রগতিশীল। কিন্তু এদের স্থায়িত্ব নেই। প্রগতিশীল হলেও এদের ঝোঁক হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করা।" এবং '৭৫ পার্টি দলিল'-এ বলা হয়েছে—'সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে সামাজিক পৃথগ্‌ভবন বিকাশলাভ করছে। একদিকে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ ও পেটি-বুর্জোয়ার দেশপ্রেমিক অংশসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি, জাতীয় বুর্জোয়ার শক্তি, যারা ক্রমেই বেশি করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসছে, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হচ্ছে।...' সুতরাং এ থেকে জাতীয় মুক্তির শক্তি কারা এবং জাতীয়

বুর্জোয়ার ভূমিকা কতটা প্রগতিশীল তা বোঝা যায় এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা যে জাতীয় মুক্তির মুখ্য শক্তি নয়, তাও অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না।

তিনি ব্রেঝনেভের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে চাইছেন—তাঁর বক্তব্য কত ঠিক,—'The example of a consistent policy of peace and democratic solutions of internal problems is given by Republic of India. By urging a just peaceful settlement of existing international issues, she creates a favourable situation for the solution of her own internal problems. And, by gradually resolving internal socio-economic problems, the Indian people are substantially strengthening the foundations of their peace-loving policy.' এই কথার অর্থ কি ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী—মুখ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি? এ থেকে এ কথা বলা যায় যে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতি, যা আন্তর্জাতিক শান্তির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী নয়। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরতা ক্রমশঃ কমে আসছে এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটছে ঠিকই, কিন্তু তার মূলে রয়েছে তিনটি কারণ। এক—জাতীয় বুর্জোয়ারা স্বনির্ভর হতে চায়, দুই—ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তিন—সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্য। কমরেড ব্রেঝনেভের উক্তি থেকে কখনই মনে করা যায় না, যে ভারতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী মুখ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি বা সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রধান শক্তি, বরং তিনি বলেছেন, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের শক্তি ভারতবর্ষের জনসাধারণ। তাছাড়া জাতীয় বুর্জোয়ারা দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি হলে কোন মুহূর্তের জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করত না বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরত না। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু ভারতবর্ষ কেন, সারা তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি করে দুটি কারণে—প্রথমতঃ তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে, যার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং

দ্বিতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বগত প্রচার ও বাস্তবতার উপর এই সমস্ত দেশের প্রগতিশীল জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজন। এ কারণে নয় যে, এই সমস্ত দেশের সরকারগুলি সমাজতান্ত্রিক সরকার বা সোভিয়েতের সহযোগিতায় সমাজতন্ত্র গড়ার সরকার।

ঐ লেখক আরও সিদ্ধান্ত করেছেন যে,—'জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা প্রাক্ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা পর্যন্ত থাকছে।' এ প্রসঙ্গে আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিই—জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সহযোগী হিসেবে জাতীয় বুর্জোয়া নয়, তার অ-একচেটিয়া দেশপ্রেমিক অংশ থাকছে; কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তারা নাও থাকতে পারে, তখন শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর শক্তি এত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করতে পারবে।

তিনি আরও বলেছেন—'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ক্ষয়িষ্ণু শক্তি নয়—তা যদি হত, তবে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের লাইন—The only possible way to defeat imperialism is to remove the power of National Bourgeoisie—ঠিক হতো।' এখন কথা হচ্ছে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে লড়াই আর জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে লড়াই এক জিনিষ নয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ যদি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি না হয় তবে চিরকালই বুর্জোয়া শাসন থাকবে; শ্রমিকশ্রেণী তার মিত্রশক্তিকে কখনও radicalised করতে পারবে না অন্ততঃ আশু কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো অনেক দূরের কথা। আর এই কথাটি ঠিক নয় বলে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের বক্তব্য সঠিক হবে, তা কে বলেছে? কারণ—দুটি উক্তির মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদকে এক নম্বর শত্রু মনে করে, আর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মিত্র খোঁজে এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই শক্তিগুলির মধ্যে যত দুর্বলতা, যত দোদুল্যমানতা থাকুক না কেন, তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তাকে ব্যবহার করে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মানে জাতীয় বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই নয়। এখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক (antagonistic contradiction) নয়। অতএব সে দিক থেকে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভুল।

অপর একটি লিখিত বক্তব্যও আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—ভারত সরকার যে রাষ্ট্রীয় সেকটর (state sector) গঠন করছে তা চরিত্রের দিক থেকে "বিপ্লবী গণতান্ত্রিক", ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়াদের তিনি "বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি" বলে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয়। নিজের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি সোভিয়েত পার্টির দুই প্রধান নেতা ব্রেঝনেভ ও পনোমারিয়ভের বক্তব্য ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন—"ব্রেঝনেভ বলেই দিয়েছেন—রাষ্ট্রীয় সেক্টর মূলত বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক কর্মনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি"। আর পনোমারিয়ভ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'কিভাবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সমাজতন্ত্রের দিকে এগোনোর আবশ্যিক অভ্যন্তরীণ পূর্বশর্ত ধীরে ধীরে বানিয়ে চলেছে"। হ্যাঁ, ব্রেঝনেভ ও পনোমারিয়ভ অবশ্যই বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ঐ কথাগুলি বলেছেন, যেসব আরব দেশ অ-ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করছে তাদের লক্ষ্য করে, ঐ সব দেশে কৃষক, বুদ্ধিজীবি ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশ রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত তাদের বলা হয়েছে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি। লেখকের কাছে আমার প্রশ্ন: ভারত সরকার কি অ-ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করেছে? ভারতে রাষ্ট্রীয় সেক্টর কি রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র (state capitalism) গড়ার মাধ্যম নয়? কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ কি ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে মোহমুক্ত? ব্রেঝনেভ ও পনোমারিয়ভের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ধনতন্ত্রের পথে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সেক্টরকে বিপ্লবী গণতন্ত্রের মাধ্যম বলে সার্টিফিকেট দেওয়া কি অমার্জনীয় অপরাধ নয়?

কাজেই দেখা যাচ্ছে—এক শ্রেণীর লোক আমাদের মধ্যে রয়েছেন যারা বিশ্ব-বরেণ্য কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তব্যগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের সংস্কারবাদী চিন্তাগুলিকে প্রচারের চেষ্টা করছেন। আরও বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায়—মার্কসবাদী বলে খ্যাত কোনো কোনো পত্রপত্রিকায় ঐগুলি ফলাও করে ছাপা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল বা বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তব্য বিকৃত করার এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাতে চাই। আমি বিষয়টির প্রতি মার্কসবাদী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রভাত কুমার কামিলা

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই মুহূর্তের প্রধান কাজ

দেশকাল ভেদে যেমন বিপ্লবের প্রকারভেদ, অনুরূপভাবে প্রতিবিপ্লবও ছকে বাঁধা পরিচিত পথ ও পদ্ধতিতে এক সময় সংঘটিত হয় না। বিশেষত এ যুগে সমাজতন্ত্র ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি বলেই পশ্চাদপসরণকারী প্রতিবিপ্লব রণনীতি নিয়ত পরিবর্তন করে, প্রচ্ছন্ন পন্থায় নবরূপে দেখা দেয়, যা পাতি-বুর্জোয়া মানসিকতাকে বিভ্রান্ত করে তোলে—প্রতিবিপ্লবকে বিপ্লবের মতো ভেবে মরীচিকার দিকে ছোটে। ভারতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে "সর্বাত্মক বিপ্লব"-এর ডাক তেমনই মরীচিকা। যা আদ্যন্ত প্রতিবিপ্লব, তা বিপ্লব বলে প্রতিভাত হচ্ছে কারু কারুর কাছে।

বিষয়ীগতভাবে, এ হল ১৯৭১ সালের মহাজোটের প্রসারিত সমন্বয়—যেমনে রয়েছেন সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ। ১৯৭১ সাল ছিল মহাজোটের অনুপযোগী সময়সন্ধি। আজ সে তুলনায় তাদের অনুকূল সময়। ধনতান্ত্রিক পথের শকট - ভারতের আর্থ-কাঠামোতে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত। ধনতান্ত্রিক পথে তৃতীয় বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের স্বপ্ন যে অলীক, এখন এটা প্রমাণ করার প্রয়াসও বাহুল্য। ভারতের গভীর অর্থনৈতিক সংকট এ সমস্তগুলির করুণ নিদর্শন বহন করছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা শ্রেণীস্বার্থেই ধনতান্ত্রিক পথ ত্যাগ করছে না, আবার তার দরুণ অভিশপ্ত সংকটের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ মোকাবিলা করার মতো শক্তিও তাদের নেই।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সংকট-প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভবনের কারণগুলি সমগ্র ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সেই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ভারতের আর্থ-কাঠামো। ধনতন্ত্রের চক্রাবর্তিত সংকট যত তীব্র আকার ধারণ করবে, ভারতে তার প্রভাব দীর্ঘতর ছায়া নিয়ে দেখা দেবে। কেননা ভারতীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের কেবল অঙ্গ নয়, তার পদাবনতও বটে।

ধনতন্ত্রের সংকট যত বাড়ছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তত শোষণের মাত্রা বর্ধিত করছে মুনাফালিপ্সার জন্য। কিন্তু তার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ধনতন্ত্র-বিরোধী উপাদানমুক্ত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃতিতে এই লক্ষ্য করা হচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন দশম কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে অত্যন্ত সঠিকভাবেই একথা বলা হয়েছে: "কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথের সংকট জাতীয় কারণে ও সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘনীভূত সংকটের সাম্প্রতিক বিস্ফারণ হতে উত্থিত কারণে এক বিস্ফোরক বিন্দুতে উপনীত হয়েছে। এই সংকটের ফলে অভূতপূর্ব গণ-অসন্তোষ, এমনকি বিদ্রোহও দেখা দিচ্ছে, যা বৈপ্লবিক অগ্রগমন ও প্রতিবৈপ্লবিক পরিবর্তন উভয় দিকেই চালিত হতে পারে। আমরা এক ঝোড়ো সময়ে প্রবেশ করছি যখন এই দুই বিপরীত এক সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।" বিপ্লবী শক্তি আর প্রতিবিপ্লবী শক্তি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে চলেছে। জয়প্রকাশের আন্দোলন এবং তার মোকাবিলার মধ্যে তার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হচ্ছে। জয়প্রকাশের উদ্দেশ্য ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘোরানো। তারা চাইছে দেশে নয়া-উপনিবেশবাদ কায়েম করতে, মুখে বলছে বিপ্লবের বাণী। ধনতান্ত্রিক পথকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য এদেরও। নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে তারা চূর্ণ করতে চাইছে, কারণ নয়া-উপনিবেশবাদ কায়েম করার পথে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবন্ধক। সংসদীয় গণতন্ত্রকে সংশোধনের বুলির আড়ালে তারা চাইছে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক একনায়কতন্ত্র। স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৬৭ সালে যখন ভারতের একাধিক রাজ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল, জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন সামরিক একনায়কতন্ত্রের কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন যারা, তাদের অন্যতম ছিলেন সি পি এম নেতা এ কে গোপালন ও এম বাসবপুন্নাইয়া। আজ জয়প্রকাশ মুখে তা বলছেন না, কিন্তু তার সাকরেদরা একথাই বলছে। কয়েক মাস আগে মিনু মাসানী সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় এবং ১৯৭১ সালে লোকসভা উপনির্বাচনের মাধ্যমে এরা দেখেছে যে, নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথে এরা ক্ষমতা দখল করতে পারবে না, তাই এরা এখন সংসদীয় গণতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য অবতীর্ণ। বাহ্যত, এদের সংগ্রাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দুর্নীতি দূরীকরণে আগ্রহী

নয়। তা নাহলে ওড়িশার বিজু পট্টনায়ক, আকালী নেতা প্রকাশ সিং বাদল প্রভৃতি নেতা এদের মধ্যে থাকতেন না—যাদের কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত, কাউকে দুর্নীতির দায়ে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল। দুর্নীতি দূরীকরণ যদি এদের উদ্দেশ্য হত, তাহলে তারা তামিলনাড়ুর দুর্নীতিগ্রস্ত ডি-এম-কে মন্ত্রিসভা উচ্ছেদের ডাক দিত।

সুতরাং দুর্নীতিরোধের আওয়াজ আসলে অন্তঃসারশূণ্য। তাছাড়া দুর্নীতি হল শ্রেণীব্যাধি শোষক শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থেই দুর্নীতিকে পোষণ করে। জনসংঘ-স্বতন্ত্র-সিণ্ডিকেট কংগ্রেস প্রভৃতি শ্রেণী কখনো কি দুর্নীতিরোধে প্রকৃত-পক্ষে সামিল হতে পারে? কখনোই পারে না।

এসব সত্ত্বেও, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আর এস পি ও এস পি এই আন্দোলনের অংশীদার। বিষয়গতভাবে সি পি এম-ও রয়েছে—তারা আন্দোলনকে সমর্থন করছে, কিন্তু আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে না। এ এক বিচিত্র স্ববিরোধিতা বটে। তারা বলছে যে, এ আন্দোলন গণ-আন্দোলন, কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের দাবী নেই ও জনসংঘ প্রভৃতি দল আছে বলে যোগ দিচ্ছে না। শ্রমিক-কৃষকের দাবী না থাকলে গণ-আন্দোলন কি করে হয়? শ্রমিক-কৃষক মিলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। সংখ্যাগরিষ্ঠকে বাদ দিয়ে গণ-আন্দোলন তো সোনার পাথরবাটি!

প্রকৃতপক্ষে, সি পি এম ও বামপন্থী দলগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অকংগ্রেসবাদের প্রভাবে এ আন্দোলনকে সমর্থন করছে। কমিউনিস্ট পার্টি এ দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করেছে এবং দশম কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলেছে: "ভারতে দক্ষিণপন্থী বিপদকে শ্রেণীগত পরিভাষায় বুঝতে হবে, 'কংগ্রেস' ও 'অ-কংগ্রেস' এরকম বুর্জোয়া সংসদবাদী ধারণায় নয়।"

জয়প্রকাশের আন্দোলনের লক্ষ্য, শক্তি সমাবেশ ও পরিচালন শক্তি বিচার না করে সেই আন্দোলনকে সমর্থন করা অবৈজ্ঞানিক, হঠকারী এবং বিপ্লবের পিছনে ছুরিকাঘাত। জয়প্রকাশ নারায়ণ গত ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বলেছিলেন যে, ভারতের শিল্প-শ্রমিকরা সংকীর্ণ স্বার্থে ও দাবীতে আন্দোলন করেছে, কাজেই তারা তাঁর আন্দোলনে বড় শক্তি নয়। সি পি এম সহ বামপন্থী নেতৃত্ব ইতিহাসের এই অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। তারা কি ভুলে গেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীই জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলেছিল? তারা কি ভুলে গেছেন যে, ত্রিশ দশকে

একাধিক শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল শুধুমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে? আসলে তাদের চিত্তে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী আজ অনুপস্থিত; তার বদলে রয়েছে অকংগ্রেসবাদের শ্রেণীরহিত দৃষ্টিভঙ্গী। তা নাহলে এদের একথা বুঝতে কষ্ট হত না যে, জয়প্রকাশের আন্দোলন মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণী তথা জনগণের বিরুদ্ধে। কারণ শ্রমিকশ্রেণী আজ ধনতান্ত্রিক পথের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে অধনতান্ত্রিক পথ, যা হল দীর্ঘমেয়াদে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ। কমিউনিস্ট পার্টি সেজন্যেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রামে অবতীর্ণ। ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানকালে কমিউনিস্টরা তাই চিরদিন করে এসেছে। কিন্তু তাই বলে কমিউনিস্ট পার্টি গোপন করে নি বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সংকল্প, যার মধ্যে কংগ্রেসের দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে স্বার্থহীন ভাষায় বলেছে: "দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টিকে দৃঢ় প্রবক্তা হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। তার মানে এই নয় যে, পার্টি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে, পরন্তু পার্টি বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রকে জাতীয় গণতান্ত্রিক দিকে প্রসারিত ও বলীয়ান করতে চেষ্টা করবে।"

প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীই অচঞ্চল সংগ্রামী। জয়প্রকাশের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দায়িত্ব এসে পড়ছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। ইতিহাসে তার নজিরও রয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে, এই প্রতিবিপ্লবকে উৎসাহিত করেছে কংগ্রেস সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি। ধনতন্ত্রকে পুষ্ট করার জন্যই এ নীতি। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক পথ এখন অশক্ত। প্রতি-বিপ্লবকে প্রতিরোধ করা আর ধনতন্ত্রকে পুষ্ট করা একই সঙ্গে চলতে পারে না। কাজেই দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করতে গেলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন দশম কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে একেই বলা হয়েছে "দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ও তার ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বর্তমান সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তার পরিবর্তে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সরকার গঠনের সংগ্রামের মেলবন্ধন।" এক কথায়, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অধনতন্ত্রের স্বপক্ষে সংগ্রাম পর্যন্ত তাকে প্রসারিত করতে হবে।

বিয়োগপঞ্জী

রজনী পাম দত্ত

রজনী পাম দত্ত ১৮৯৬ সালে ১৯ জুন তারিখে বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন কৃতী ছাত্র। ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সভা সংগঠিত করার জন্যে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। তা সত্ত্বেও তিনি বিশেষ অনুমতিক্রমে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন তাতে প্রথম হবার সম্মান অর্জন করেন।

১৯১৯ সালে পাম দত্ত ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করেন।

রজনী পাম দত্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ও তাত্ত্বিক। তাঁর সম্পাদিত "লেবার মান্থলি" পত্রিকা সারা বিশ্বে মার্কসবাদী মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁর গ্রন্থ "ফ্যাসিজম এ্যাণ্ড সোশ্যাল রেভোলিউশন" মার্কসবাদী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

ভারতের সঙ্গে পাম দত্তের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সারাজীবন ধরে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক "ইণ্ডিয়া টু-ডে" আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা পুস্তক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে যাঁরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত, পাম দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর পুস্তক "দি ক্রাইসিস অব ব্রিটেন এ্যাণ্ড দি ব্রিটিশ এম্পায়ার" তাঁর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় বহন করে। সারাজীবন ধরে তিনি পশ্চিমের শ্রমিক আন্দোলন ও প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ক্ষতি হল তা সত্যিই অপূরনীয়। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করছি।

অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

গত ২০ নভেম্বর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের জীবনাবসান ঘটেছে। ডঃ সিংহ দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য ও আধুনিক ভারত ইতিহাসের আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন।

ডঃ সিংহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসের গবেষণায় আজীবন লিপ্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ হল—তিন খণ্ডে লিখিত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস; তাঁর আরও গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে "রণজিত সিংহ", "হায়দার আলি", "শিখ শক্তির উত্থান" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৯ সালে তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনের মূল সভাপতি হন।

তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রের মহাফেজখানাগুলি পরিদর্শন করেন। সোভিয়েত লেখকদের বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থে ডঃ সিংহের বইয়ের উল্লেখ আছে।

ডঃ সিংহ দুইটি নামকরা ইতিহাস গবেষণার সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, Bengal Past and Present এবং "ইতিহাস"।

শিক্ষকতা ও গবেষণায় লিপ্ত থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পশ্চাদপদ হন নি। মার্কিন সাহায্যে যখন "ইন্দো-মার্কিন শিক্ষা ফাউণ্ডেশন" গড়ার চেষ্টা হয়, তখন তার প্রতিবাদ আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি ছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় সম্প্রতিকালে মার্কিন ও ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যেভাবে ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতে সুরু করেছিলেন, বিভিন্ন সমালোচনা প্রবন্ধে তিনি তার স্বরূপ উদঘাটিত করেন।

ডঃ সিংহের মৃত্যুতে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।

MULYAYAN
Kartick-Aghrahayan (1381 B.S.)
Regd. No.—W.B./SC-16
R. N. 13785/65

থাক লক্ষ্মী যাক বালাই

6 JAN 19

ঐ হল মানুষের আবহমান কালের প্রার্থনা। কিন্তু যাক বললেই তো আর রোগবালাই যায় না। তাকে বিদায় করতে হলে চাই কুলোর বাতাস—ঠিক যে রোগের যে ওষুধ।

আমরা সেই ঠিক-ঠিক ওষুধেরই জোরে মানুষের রোগবালাই দূর করার কাজে লেগে আছি এক-টানা পঁয়ত্রিশ বছর প্রায় তিন যুগ।

আমরা সমানে বানিয়ে চলেছি ১২৫ দফা ওষুধ, ইন্‌জেকশন, রাসায়নিক এবং আরও অনেক কিছু।

অসুখ থেকে বাঁচিয়ে মানুষকে সুখে রাখাই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ব্রত।

ERC PA.7 CPN

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

মূল্যায়ন

পুরানোর পরিবর্তে নতুন বিশ্ব : রজনী পাম দত্ত

রজনী পাম দত্ত ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ঐতিহাসিক আশাবাদের দর্শন

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দলের ভাষণ

নীল দর্পণ ও রেভারেণ্ড জেমস লঙ

পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র
১৩৮১

দেড় টাকা

রূপের প্রকাশ চুলে...

আর সেখানেই কেয়ো-কার্পিনের
কথা ওঠে।
এক অতুলনীয় কেশ তৈল···
চুল চটচটে হয় না
জামা কাপড়ে দাগ লাগে না
মনোরম গন্ধে

ডে'জ
কেমিক্যাল
তৈরী

নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখুন-
চুলের সৌন্দর্য্য অটুট রাখুন

pa/dm/kk-B/84

With best compliments from

BENGAL POTTERIES LIMITED

Makers of Fine Crockeries & Insulators

PROBLEMS OF NATIONAL LIBERATION

a journal of theoretical studies and research

In the 1st Issue

- ☐ Growth of Nepali Nationality
- ☐ Santhal Agitation on Rent—1861-81
- ☐ Structural Changes in Indian Agriculture
- ☐ Tanzania's Road to Socialism
- ☐ Boris Ponomaryov on *Communist Manifesto*

Discussion :

Non-Capitalist Path in India

Price : Rs. 3/-

Available at :

Manisha Granthalaya (P.) Limited

4/3B, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-12

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৩·৭৫ টাকা

●

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী

মূল্য : ২·৫০ টাকা

●

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ৪·০০ টাকা

প্রত্যেকটি বই পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ ও বহু উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রে সজ্জিত। ঝকঝকে সচিত্র প্রচ্ছদ, সুদৃঢ় বাঁধাই, উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা। যাবতীয় তথ্য-সংবলিত মানচিত্র আছে প্রত্যেক বইতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের অধীক্ষকের কাছ থেকে পাইকারী খরিদের ক্ষেত্রে পুস্তক ব্যবসায়ীরা ২০% কমিশন পাবেন।

●

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন
১, কিরণশংকর রায় রোড
কলিকাতা ১

.....প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৬৩৫/৭.....

কবিতা :

শেভ:চেঙ্কোর স্বপ্ন ও অন্যান্য কবিতা :
অনুবাদক গোলাম কুদ্দুস ৩·০০

স্মৃতিতে সত্তায় : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ৫·০০

স্বেচ্ছা বন্দী : গোলাম কুদ্দুস ৪·০০

বিজ্ঞানের বই :

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ : শংকর চক্রবর্তী

উপন্যাস :

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস

ন হন্যতে : মৈত্রেয়ী দেবী

স্মৃতিচারণ :

তরী হতে তীর : ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০·০০

আমার বিশ্বয় জিজ্ঞাসা :
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সদ্য প্রকাশিত

লেনিন : এক কদম আগে দুই কদম পিছে

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

With best compliments from :

NAVA BHARAT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

NILHAT HOUSE ANNEXE

11 R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-1

Regd. Office :

"NAVA BHARAT HOUSE"
6-3-654 SOMAJIGUDA
HYDERABAD-500004.

Other Branches :

BOMBAY • COCHIN • DELHI
MADRAS • GUNTUR • AGRA
MORADABAD • BANGALORE

দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে

"মূল্যায়ন"-এর দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লেখক, পাঠক ও গ্রাহকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আগামী সংখ্যা থেকে প্রবন্ধ-সম্ভার ও অঙ্গ-সজ্জা অধিকতর উন্নত করার চেষ্টা করা হবে।

লেখক, পাঠক ও গ্রাহকদের সহযোগিতার ওপর ভরসা ক'রে, নতুন উৎসাহ নিয়ে, মূল্যায়ন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করবে।

—সম্পাদক

মূল্যায়ন

১০ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
পৌষ-মাঘ
ফাল্গুন-চৈত্র
১৩৮১

সূচী

পৃষ্ঠা

নীলদর্পণ ও রেভারেণ্ড জেমস লঙ/অমর দত্ত ১
ঐতিহাসিক আশাবাদের দর্শন/ভি. প্রিপিসনেভ ২৮
পুরনোর পরিবর্তে নতুন বিশ্ব/রজনীপাম দত্ত ৩৫
রজনীপাম দত্ত ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি/নির্মালা বাগচী ৪১
রজনী পাম দত্তের সঙ্গে পত্রালাপ ৬৬
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির
প্রতিনিধি দলের নেতার ভাষণ
আলোচনা : জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে
জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য

সম্পাদক :
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
নরহরি কবিরাজ

পত্রিকা রায় কর্তৃক ১০, বতেল রোড, কলকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত।

মুল্যায়ন পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

(৮নং ফরম)

প্রকাশ স্থান—১০, বঙ্কেল রোড, কলিকাতা-১৯

প্রকাশের সময়—প্রতি মাসে

মুদ্রক—পবিত্র রায়

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১২বি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩০

প্রকাশক—পবিত্র রায়

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১২বি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা—৩০

সম্পাদক—সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও নরহরি কবিরাজ

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বঙ্কেল রোড, কলিকাতা—১৯

স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী

ঠিকানা—১০, বঙ্কেল রোড, কলিকাতা-১৯

আমি, শ্রীপবিত্র রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

পবিত্র রায়

তাং—১৫।৩।৭৫ প্রকাশক

নীলদর্পণ ও রেভারেণ্ড জেমস লঙ

অমর দত্ত

১

১৮৬০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা সহর থেকে 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বহু আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ললিত চন্দ্র মিত্র প্রমুখ মনীষীরা নীলদর্পণের অনুবাদক হিসাবে মাইকেলের নাম উল্লেখ করলেও সম্প্রতি এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। অনুবাদক যিনিই হউন না কেন তিনি শ্রদ্ধেয়; কিন্তু নাটকটিকে নিজের নামে প্রকাশ করার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত রয়ে গিয়েছেন। পাদরী জেমস লঙ অনুবাদটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে হিউম্যানিস্টের পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন। নীলদর্পণ নাটকের অনুবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সর্বত্র যে ঝড় উঠেছিল এবং পাদরী লঙের ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি।

নিরপেক্ষ নীল কমিশনের সভাপতি ও বাঙলা গভর্নমেন্টের অন্যতম সেক্রেটারী সীটনকার নাটকটির অনুবাদ প্রসঙ্গে একটি পত্র লেখেন (১৮৬১ খৃঃ ২৭শে জুলাই)।[১] পত্রটির সারমর্ম উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে রেভারেণ্ড জেমস লঙ নাটকটি সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নাট্যকার মফঃস্বলের অধিবাসী হওয়ায় নাটকটিতে গ্রামের অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকটি আমার অনুমোদনক্রমে ও জ্ঞাতসারে জনৈক দেশীয় কর্তৃক অনূদিত হয়। অনেকেই নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ পড়তে ইচ্ছুক হওয়ায় অনূদিত নাটকটির ৫০০ কপি মুদ্রিত করা হয় এবং কপিগুলি বেঙ্গল অফিসে প্রেরিত হয়। সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে ও সমকালে দেশীয় প্রকাশনা সমূহের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য নিন্দিত হয়েছিল। সেই কারণে জনমতের সঠিক পরিচায়ক নাটকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম।'

হয়েছে। আমি আট বৎসর 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত আছি এবং দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার মহৎ আদর্শগুলি লাভের মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বর্তমান।

এক স্বতন্ত্র অবস্থার জন্যে অন্যান্য মিশনারী অপেক্ষা দেশীয় প্রকাশনাসমূহের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। 'ক্রিশ্চিয়ান স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'র সদস্য হিসাবে দেশীয় প্রকাশনাসমূহ থেকে সংকলিত তিনটি ভলুম প্রস্তুত করেছি। এছাড়া আমাকে বাংলা পাণ্ডুলিপি দেখতে হয় ও সম্পাদনা করতে হয়।

কলকাতার দক্ষিণে ও বিভিন্ন জেলায় প্রচারকার্য চালানোর সময় আমি বুদ্ধিজীবী মানুষের সংস্পর্শে আসি এবং তাদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে পরিচিত হই। আমার প্রচারকেন্দ্র সমূহে একদল শিক্ষক ও পাঠক আছেন।, তাঁদের আমি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে (বাংলা ভাষা) শিক্ষা দিয়ে থাকি। তাঁদের মনের ক্ষুধা মিটাতে গিয়ে খাঁটি দেশীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা আমি গভীর ভাবে অনুভব করি এবং দেশীয় প্রকাশনাসমূহের প্রতি আমার আগ্রহের বৃদ্ধি হয়।

দেশীয় প্রকাশনাসমূহের মতামত ও সম্পদগুলির পরিচিতির জন্যে আমি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমানকালে এই বিষয়ে কাজ করার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। মিশনারী, সরকারী কর্মকর্তা ও এদেশীয়দের কাছ থেকে পাওয়া অজস্র উৎসাহব্যঞ্জক পত্রাদি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সাফল্য প্রমাণ করছে।

আমার কর্মপ্রচেষ্টা 'মিশনারী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মে'র অন্তর্গত বিবেচনা করে আমি সরকার বা অন্য কারোর কাছ থেকে কোন অর্থ পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করি না। তবুও সরকার আমার দেশীয় প্রকাশনাসমূহের উপর লিখিত কিছু রিপোর্ট প্রকাশে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছেন। ১৮৫৫ খৃঃ স্যর হ্যালিডে'র নির্দেশে সরকার আমার লেখা 'Return of authors and translators of vernacular, etc ;'র ৮০০ কপি মুদ্রিত করেছেন। আমার লেখা 'Classified Catalogue of 1400 Bengali books and tracts'-এর ৫০০ কপি সরকার ক্রয় করেছেন এবং 'Returns relating to the vernacular Press in 1859'এর ৫০০ কপি মুদ্রণ করেছেন।' এইভাবে আমার মুদ্রণের ব্যয় উঠে এসেছে।

আমার পরামর্শক্রমে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী থাকাকালীন মাননীয় বীডন দেশীয় প্রকাশনাসমূহের বাৎসরিক Return চেয়ে এক আদেশ জারি করেন। দেশীয় প্রকাশনাসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে একটি 'কিউরেটর' পদ সৃষ্টি করতে আমি প্রাক্তন লেঃ গভর্নর স্যর হ্যালিডে'কে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি সহানুভূতিশীল হলেও উচ্চতম সরকার অর্থনৈতিক কারণে 'কিউরেটর' পদসৃষ্টির প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন। কলকাতার বাজারে অশ্লীল পুস্তকের প্রাচুর্যে ব্যথিত হয়ে আমি এই বিষয়ে Legislative Council এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং অশ্লীল পুস্তক নিবারণ আইন প্রণীত হয়। সহরে এই আইন সন্তোষজনক ভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

দেশীয় জনগণের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সফল 'Bengali Education Gazette' অনেকখানি আমার প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য লাভ করে।

দেশীয় পত্র-পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন কার্যকলাপের ফলে ব্রীটীয় জনগণকে 'ক্রিশ্চিয়ান ভার্নাকুলার লিটারেচার' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন' সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছি। বর্ধমান জ্ঞান-স্পৃহার জন্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হল একজন মিশনারী এই ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করবেন কেন? এর সোজা উত্তর হল যে এই ব্যাপারে উপযুক্ত মনোযোগ দেবার লোক দুর্লভ। আমাকে এই ধরনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যে যদি একজন সাধারণ লোকও পাওয়া যেত তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকতাম।

তাৎপর্যপূর্ণ দেশীয় মানসিকতার প্রকাশক গ্রন্থসমূহ আমি মিশনারী, শিক্ষাবিদ ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রেরণ করে থাকি। গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত দানে আমি বিরত থাকি। অনুরূপভাবে দুই বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্মের সপক্ষে প্রচারিত দুইটি গ্রন্থের বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং কলকাতার প্রায় প্রতিটি মিশনারী গ্রন্থটি ক্রয় করেন।

ছয় বৎসর পূর্বে অধুনালুপ্ত 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টর' 'ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী'র জন্য মূল বাংলা গ্রন্থসমূহের এবং পত্রপত্রিকার সংগ্রহ প্রেরণের অনুরোধ জানান। দিন পনের পূর্বে আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রী উইলিয়ামকে বাংলায় অনুদিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ প্রেরণ করেছি।

এই একই ভাবে বেনারস, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদেশীয় গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ প্রেরণ করেছি।

এদেশীয় মনের গতি-প্রবৃত্তি জানার একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বেঙ্গল হরকরায় 'The spirit of the Native press' নামে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। গত বৎসর নীলচাষ সম্পর্কে দেশীয়দের মনোভাবের প্রকাশক 'নীলদর্পণ' নাটকটির বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সরকারী কর্মকর্তাগণ, বণিকগণ এবং মিশনারীরা এই বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে দেশীয় পত্র-পত্রিকার মতামত জানতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি ইতিমধ্যে এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে এবং অনেকেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে গ্রন্থটির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। একথা সত্যি যে নাটকের পাত্রপাত্রীর অনেক সংলাপ এবং অনেক অংশ উন্নত রুচির য়ুরোপীয় ব্যক্তিকে আহত করবে। প্রাচ্য দেশীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে প্রাচ্য দেশীয় সাহিত্যে নিম্নরুচি সুস্পষ্ট: নীলদর্পণ এর ব্যতিক্রম নয়। 'নীলদর্পণে'র ইংরাজী অনুবাদে কর্কশ অংশগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে অথবা কোমল করা হয়েছে। অনবধানতাবশতঃ যদি অনুরূপ কোন অংশ বর্তমান থাকে তবে আমি তার জন্য দুঃখিত। নাট্যকার মুখবন্ধে দুইটি ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পর্কে ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত সংবাদপত্রদ্বয় নীলকরদের দ্বারা প্রভাবিত। আমি এটা কল্পনাও করতে পারি নি যে, ইংরেজ পাঠকেরা এই নিন্দার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করবেন। ব্যাপক প্রচারিত সংবাদপত্র দুইটির সম্পাদকদ্বয় সম্পর্কে সহস্র মুদ্রা বা ১০০ পাউণ্ডের ঘুষের উল্লেখ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

আমার লেখা ভূমিকার উপসংহার প্রমাণ করবে যে অনুবাদটি বিদ্বেষপ্রসূত নয়। পারস্পরিক স্বার্থে নীলকর এবং রায়তদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের দ্রুত প্রতিষ্ঠা এবং মফঃস্বলে কৃষকেরা নীলকরদের পৃষ্ঠপোষকতায় সুরক্ষিত থাকুন—এটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। নতুবা 'প্রলেটারিয়ানিজম' ও 'পপারিজম' এর বিপদ থেকে এদেশ রক্ষা পাবে না। নীল কমিশনে সাক্ষ্য-দানের সময় গত কয়েক বৎসরে নীলকর সাহেবদের আচার-আচরণের উন্নতির কথা আমি উল্লেখ করেছি; এবং নীলচাষ ব্যবস্থার ত্রুটি বিষয়ে আলোচনার মধ্যেই কমিশনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছি।

'য়ুরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে দেশীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হওয়া উচিত'—

লর্ড বেণ্টিঙ্কের এই নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। এদেশীয় পত্র-পত্রিকার দর্পণে নিজেদের মুখ দেখার অভ্যাস য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার অন্যতম উপায় বিশ্বাস করে লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁর ও তাঁর প্রশাসনের সমালোচনা পছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জনমত নিরাপত্তার নির্দেশক। অনুরূপ চিন্তা থেকে মার্কুইস অফ হেস্টিংস ১৮১৮ খৃঃ মাত্র এক-চতুর্থাংশ ডাক খরচে 'সমাচার দর্পণে'র বিলির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মিশনারীদের প্রচারিত উক্ত পত্রিকায় এদেশীয় পত্র-পত্রিকায় সরকারী প্রশাসন ও য়ুরোপীয়দের আচার-আচরণের উদ্ধৃতি থাকত। উক্ত পত্রিকার পুরানো এক সংখ্যায় 'ভাস্কর' ও 'চন্দ্রিকা'র তীব্র ব্যঙ্গময় উদ্ধৃতি আমি পড়েছি। উদ্ধৃতিটির সারমর্ম হল: 'ইংরেজ বিচারক বিচারালয়ে বসে ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছেন—তিনি এমন ভাষায় কথা বলছেন যা কারোরই বোধগম্য হচ্ছে না; আর সেই সময়ে তাঁর আমলা ঘুষ গ্রহণ করছেন।' এদেশীয়দের জনমানস সম্পর্কে পরিচিত হওয়া ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী নয়। এই প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড ডবলু মর্টনের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি এদেশীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মিশনারী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মন্তব্যসমূহের ইংরাজী অনুবাদ করতেন। একই উদ্দেশ্যে তিন বৎসর পূর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মিশনারী সম্মেলনে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্পর্কে দেশীয়দের মতামত জানার জন্যে পত্র-পত্রিকার মতামত সংগ্রহের ও সংকলনের ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। এটা খুবই দুঃখের কথা যে খুব কমসংখ্যক য়ুরোপীয় দেশীয় পত্র-পত্রিকার দর্পণে নিজেদের মুখ দেখতে প্রস্তুত।

নীলচাষের মত বিতর্কিত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হওয়া মিশনারী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। আমি প্রশ্ন করতে পারি ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা কি তাঁর একটি কর্তব্য নয়? এদেশের বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে য়ুরোপীয়দের সংখ্যা খুবই নগণ্য। খুব অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় দেশীয় ভাষা ও অনুভূতির খোঁজ রাখেন। য়ুরোপীয়দের পায়ের তলায় আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে—দুর্যোগের কালোমেঘে ভারতবর্ষের আকাশ সমাচ্ছন্ন হতে পারে। প্রহরী যদি তার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে তবে কি সেটা তার অপরাধ? যদি কোন যাজক এদেশীয়দের অনুভূতির এমন এক অবস্থার কথা জানেন যার রক্তাক্ত পরিণতি ঘটতে পারে তবে সেই সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ কি অপরাধ? নীল জেলাগুলিতে এই ধরনের অবস্থার কথা সবাই মেনে নিয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে দেশীয় প্রকাশনাসমূহের মধ্যেই প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি সম্ভব। আমার পবিত্র বিশ্বাস যে য়ুরোপীয়দের ভবিষ্যত নিরাপত্তা ও ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যে দেশীয় প্রকাশনাসমূহের ব্যারোমিটার পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যে এদেশবাসীর সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে দৃষ্টি না দেওয়া মূর্খতার নামান্তর বলে বিশ্বাস করি। স্বর্গত J. Wilson অনুভব করেছিলেন যে দেশীয় প্রকাশনাসমূহে প্রকাশিত দেশীয়দের মতামত উচ্চতম কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে আসা উচিত এবং এই কারণে সরকারী ব্যয়ে অনুবাদক নিয়োগ করে তিনি বাংলা, উর্দু, পার্শি, হিন্দী, তামিল প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত দেশীয়দের মতামতগুলির অনুবাদের বন্দোবস্ত করান। সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক অনুরূপ উক্তি আমি সম্প্রতি পড়েছি। বোম্বে সরকার পার্শি অনুবাদকের কার্যালয় থেকে দেশীয়দের মতামত জানতে পারেন এবং আমি মনে করি যে ভারত সরকার বাংলার জন্যে অনুরূপ বন্দোবস্ত করতে পারতেন। নীলদর্পণ প্রসঙ্গে ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স' অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে লিখিত একপত্রে লেঃ গভর্নর বলেছেন, 'পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও য়ুরোপীয়দের সম্বন্ধে দেশীয় মতামতের যথার্থ উপলব্ধি সত্যিকারের বিদ্রোহ ও শান্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ছাড়া আর কি হতে পারে?' সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে দেশীয় পত্র-পত্রিকার মৃদু বক্তব্য যদি অনুধাবন করা হত তবে সেটা কত মঙ্গলজনক হত! সেইগুলি উপেক্ষা করা হল এবং লোকে আগ্নেয়গিরির উপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইল। আগ্রা প্রেসিডেন্সী থেকে প্রকাশিত দেশীয় পত্র-পত্রিকা যদি ইংরাজীতে অনূদিত হত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে আসত তবে য়ুরোপীয়রা দেশীয় সিপাহীদের হাতে গোলাবারুদ রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক মাস পূর্বে আমি আগ্রা প্রেসিডেন্সিতে ছিলাম এবং এদেশীয় পত্র-পত্রিকার মতামতের প্রতি প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দলগুলির উপেক্ষায় মর্মাহত হয়েছিলাম। অনুরূপভাবে ১৮৫৩ খৃঃ দিল্লীর আলিগলিতে যখন দেশীয় পুস্তক সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময় মুসলিম সমাজমনের কার্যকলাপে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম; এবং দিল্লী ত্যাগের সময় আমার দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছিল যে ঐ অঞ্চল দাহ্য পদার্থের স্তূপে পরিণত হয়েছে—একটিমাত্র দেশলাই কাঠি বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

এদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মের সম্প্রসারণ ও প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিশনারীদের একজন হিসাবে আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখেছি যে বিপুল পরিমাণ বিদেশীয় অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও মিশনারী কার্যকলাপ কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রাম বাঙলায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের সম্প্রসারণ প্রচারের তুলনায় তুলনামূলক ভাবে কম হয়েছে। আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে রায়তদের মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক নিম্নমান এর মূল কারণ। নীলদর্পণের ভূমিকায় আমি যা লিখেছিলাম, তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন :

'বাঙলাদেশের অত্যাচারিত রায়তদের সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ ও খ্রীষ্টীয় শিক্ষকেরা সচেতন হয়েছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন যে জমিতে রায়তি-স্বত্ব দান ব্যতীত রায়তদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। যদি বাঙলাদেশের রায়তদের দাসেদের মত, ভবঘুরেদের মত অথবা দিন মজুরদের মত ধরা হয় তবে মিশনারী, স্কুল শিক্ষক, এমন কি ভারতবর্ষের সম্পদ বৃদ্ধিকারীদের (বণিক সম্প্রদায়) পক্ষে যে কোন ধরনের কাজ করার চেষ্টা সিসিপাসের মত ব্যর্থ ও অর্থহীন হবে। পরিসংখ্যান প্রমাণ করেছে যে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্যাক্সনি প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকদের শিক্ষা ও তাদের ক্ষুদ্র জমিতে রায়তি স্বত্ব দানের ফল ভালো হয়েছে। তারা পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, সদগুণযুক্ত, পরিচ্ছন্ন অভ্যাসযুক্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সুস্থ সক্রিয় স্বাধীন সত্তাযুক্ত হয়েছে। ফলে তারা চাষের উন্নতি করে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে এবং বিপ্লবের বিপক্ষে ও শান্তির সপক্ষে মানসিকতা গড়ে তুলেছে। এই একই লক্ষ্য নিয়ে রাশিয়া দাসমুক্তির মহৎ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে চলেছে।'

কতকগুলি সামাজিক ত্রুটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারের অন্তরায় বলে দৃঢ়বিশ্বাস হওয়ায় চার্চ মিশনারী সোসাইটি এবং তার বন্ধুরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পশ্চিম আফ্রিকায় দাস-ব্যবসা বিলোপে ও নিউজিল্যাণ্ডে দেশীয়দের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। ব্যাপ্টিস্ট ও ওয়েসবিয়ান সোসাইটির মিশনারীরা জামাইকা ও অন্যান্য উপনিবেশে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে ক্ষেত্রস্বামীগণ কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছেন। আমেরিকার খ্রীষ্টীয় চার্চসমূহ দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমার অসাবধানতার জন্যে প্রকাশিত কোন অংশ বা কোন মন্তব্য

নীলকরদের পক্ষে পীড়াদায়ক হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু নীলকররা 'Brahmins and Pariahs' গ্রন্থে অশোভন ও অশালীন বক্তব্য প্রচার করেছেন। নীলকরদের সমর্থক সংবাদপত্র দুটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে—১৮৬০ খৃঃ এর প্রথম থেকে কলকাতায় বসবাসকারীরা নিঃসন্দেহে আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হবেন। এদেশের মানুষেরা য়ুরোপীয়দের মিতাচারের অভাবে বিস্মিত হয়েছেন। আমার এবং Rev. Bomwetsch বিরুদ্ধে আদালতে 'লাইবেলে'র অভিযোগ আনা হবে বলে শাসানো হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের নীরবতায় আমরা সন্তুষ্ট।

নাটকের সমস্ত বিবৃতিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চয়তা দিয়েছি বলে অভিযোগ করা হয়েছে; কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নীলের বাধন গ্রহণের ফলে একজন সম্ভ্রান্ত রায়ত কেমন ভাবে সর্বস্বান্ত হলেন নাটকে তা বর্ণিত হয়েছে। এদেশের মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে নাটকে বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য আছে; সুতরাং নাটকের সিদ্ধান্তটি ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। নাটকে প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন আংশিক অথবা সম্পূর্ণ হতে পারে; নিরাপদ বসবাস ও সমৃদ্ধির জন্যে, এই দেশের মানুষের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য নীলচাষ বিষয়ে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে।"

কলিকাতা, ২০শে জুন ১৮৬১ জে. লঙ

হিউম্যানিস্ট লঙ খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী নীলকরদের পশুসুলভ আচরণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারের অন্তরায় বলে অনুভব করেছিলেন। নীলদর্পণ অনুবাদের দুই বৎসর পূর্বে ১৮৫৯ খৃঃ তিনি চার্চ মিশনারী সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটিকে এক পত্র লেখেন।[৬] উক্ত পত্রে তিনি কমিটিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিষয়ে পার্লিয়ামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ১৮৬০ খৃঃ এপ্রিল মাসে Rev. Bomwetsch-এর পত্র নিয়ে ৫০ জন রায়ত নদীয়া থেকে কলকাতায় লঙের কাছে আসেন।[৭] লঙ অবিলম্বে কলকাতার সমস্ত মিশনারীদের এক সভা আহ্বান করেন। হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি রায়তেরা নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়ে বিবৃতি দেন। ডাঃ ডফ বিবৃতিগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করে ইংলণ্ডে পাঠান। ১৮৬০ খৃঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক মিশনারী সম্মেলনে লঙ ও ডাঃ ডফ নীলচাষীদের সপক্ষে

মিশনারীদের অংশগ্রহণ করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[৮] এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে পাদরী লঙ নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই নীলকরদের অত্যাচার নিবারণ প্রচেষ্টার মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করেছিলেন; এবং এর ফল হিসাবে তিনি নীলকরদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

নীলদর্পণের ঐতিহাসিক মামলা শুরু হবার কয়েকদিন পূর্বে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকেরা পাদরী লঙকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটির স্বাক্ষরকারী মধ্যে রাজা রাধাকান্ত, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু রমানাথ ঠাকুর এবং ৬০ জন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন।[৯] পত্রটির সারমর্ম উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আপনি সংবাদপত্রের কুৎসিৎ তিক্ত ব্যক্তিগত আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন। সংবাদপত্রের এই অশোভন আচরণে আমরা মর্মাহত।

'নীলদর্পন নাটকটিতে নীলচাষের বিষয়ে এদেশের মানুষের অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। মূল নাটকে গ্রাম্য মহিলাদের কথোপকথন রুচিসম্পন্ন অনুশীলিত মনের পক্ষে পীড়াদায়ক হতে পারে। কোন গ্রন্থের কোন অংশের নিম্নরুচির প্রকাশ যদি গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ করার কারণ হয় তবে আমাদের দেশের বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকে নিষিদ্ধ করতে হয়। য়ুরোপীয় প্রতিভার সৃষ্ট বহু প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থও একই দোষে দুষ্ট। আমরা অনুমান করছি যে একটি বিশেষ শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থই আপনার মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপ সমালোচনা করছে।

'য়ুরোপের জনগণের কাছে এদেশের জনগণের মনোভাব তুলে ধরার জন্যে আপনার প্রচেষ্টাকে হেয় করার প্রয়োজনে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে নীলদর্পণ নাটকটিতে এদেশের মানুষের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে নি। আমরা মনে করি এই পত্র সমস্ত অপপ্রচার ও ভুল ধারণার অবসান ঘটাবে।'

পাদরী লঙ ১৮৬১ খৃঃ ১৫ই জুলাই পত্রটির জবাব দেন।[১০] লঙের পত্রটির মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'এদেশে মিশনারী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অংশীদার হয়েছি। আমার স্বদেশবাসীর প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল; কিন্তু তাঁদের অনেকের অবাঞ্ছনীয় আচরণে আমি ব্যথিত। সত্য, ন্যায় ও মানবতার জন্যে অনেক মহারুষ আত্মোৎসর্গ

করেছেন—জনগণের জন্যে আমি যদি নির্যাতিত হই তবে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার গৌরব অর্জন করব।'

হিউম্যানিস্ট লঙ যেদিন সত্য, ন্যায় ও মানবতার জন্যে নির্যাতন ভোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে পত্র লিখছেন ঠিক সেইদিন (১৫ই জুলাই, ১৮৬১) গ্র্যাণ্ড জুরি রেভারেণ্ড লঙের বিরুদ্ধে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ও নিম্নবঙ্গের নীলকরদের আনীত 'লাইবেলে'র অভিযোগে বিচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিচ্ছেন।

১৮৬১ খৃঃ ১২শে জুলাই (শুক্রবার) সুপ্রীম কোর্টের ফৌজদারী সেসনে ঐতিহাসিক 'নীলদর্পণ' মামলা শুরু হয়।[১১] বিচারক ছিলেন স্যর মরডণ্ট ওয়েলস।

বাদী 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'র সদস্য ওয়াল্টার ব্রেট। প্রতিবাদী রেভারেণ্ড জেমস লঙ। বাদীর পক্ষে কৌঁসিলি পিটারসন ও কাউই। বিবাদীর পক্ষে কৌঁসিলি এগলিংটন এবং নিউমার্চ। ২৪ জন জুরির মধ্যে মাত্র সতেরো জন জুরি উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত মানিকজী রুস্তমজী একজন জুরি ছিলেন।

প্রথম দিনে পিটারসন বলেন যে তিনি ওয়াল্টার ব্রেটের সপক্ষে সওয়াল করবেন এবং মামলার যাবতীয় ব্যয় 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনে'র সদস্যেরা বহন করবেন। একজন খ্রীষ্টীয় যাজকের বিরুদ্ধে আদালতে সওয়াল করতে হওয়ায় পিটারসন দুঃখ প্রকাশ করেন।

পিটারসন বলেন, 'ফল্স অ্যাক্টে'র ৫৪ ধারা অনুযায়ী অনুদিত নাটকটির প্রকাশক লাইবেলের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। প্রকাশক ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ায় উক্ত আইন তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য।

এদেশের জনগণের অনুভূতির প্রকাশকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরার জন্যে জনৈক দেশীয় কর্তৃক নাটকটি অনুদিত হয়েছিল এবং পাদরী লঙ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল বলে পিটারসন বিশ্বাস করেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি 'সড়কি' শব্দটির অনুবাদের কথা উল্লেখ করেন। 'সড়কি'র অর্থ ছোট বর্শা। অনুবাদক ইংরাজী অনুবাদ করেছেন—'brick dust makers।' নাটকটির আরও কয়েকটি অংশের উল্লেখ করে পিটারসন বলেন যে নাটকটির অনুবাদক নিঃসন্দেহে একজন ইংরেজ এবং একটি শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের জন্যেই নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ করা হয়েছিল।

নাটকটিতে ব্রিটিশ মূলধন ও দেশীয় শ্রমের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ মূলধনের নির্মম শোষণের সহযোগী হিসাবে নিম্নবঙ্গের ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক্তন লেঃ গভর্নরও রেহাই পান নি। সুতরাং নাটকটিতে কেবলমাত্র নীলকরদের বিরুদ্ধে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারিত হয়নি, সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে।

পিটারসন নাট্যকার লিখিত ভূমিকার নিম্ন অনুদিত অংশটি পাঠ করেন—'দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই তা আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু, তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আকর্ষণ শক্তি। ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাপ্রদ জুডাস খ্রীষ্টীয়-প্রচারক মহাত্মা যীশুসকে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল সম্পাদক-যুগল সহস্র মুদ্রালাভ প্রবল হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে, আশ্চর্য কি?' পিটারসন বলেন যে ভূমিকাটিতে ইংলিশম্যান ও হরকরার সম্পাদকদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পিটারসন লঙ লিখিত ভূমিকাটি পাঠ করতে শুরু করলে লঙের কৌঁসুলি এগলিংটন আপত্তি জানান; কেননা আদালতে পেশ করা অভিযোগপত্রে উক্ত অংশটির উল্লেখ ছিল না। বিচারক ওয়েলস বলেন যে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কৌঁসুলিরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থটির যে কোন অংশের উল্লেখ করতে পারেন।

পিটারসন লঙ লিখিত ভূমিকাটি পাঠ করেন—'বাঙলাদেশের অত্যাচারিত রায়তদের সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকগণ ও খ্রীষ্টীয় শিক্ষকেরা সচেতন আছেন। ...এই একই লক্ষ্য নিয়ে রাশিয়া দাসমুক্তির মহৎ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলেছে।' (পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য)

পিটারসন নাটকটিতে ইংরাজ মহিলার প্রতি আপত্তিজনক ও অশালীন উক্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি নিম্নলিখিত অংশের অনুবাদের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিট্ঠি লাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্ডো শোনে।' 'আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, লজ্জাও নেই, সরমও

নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি, তেরোনাল্ কিরতি থাকে, মা গো, নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সে'দোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে। —কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এতো জ্যালার হাকিম।'

পিটারসন বলেন যে নাটকটিতে যে ভাবে 'মেসার্স রোস অ্যাণ্ড উড'-এর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে 'জার্ডিন স্কিনার অ্যাণ্ড কোং'-এর বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। মফঃস্বলের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতি সমগ্র বিশ্বের বিরাগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ একই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে রেভারেণ্ড সেল, রেভারেণ্ড বমস্‌ওয়েচ প্রমুখ মিশনারীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

এগলিংটনের জেরার উত্তরে ব্রেট নিজেকে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সত্বাধিকারী ও সম্পাদক বলে ঘোষণা করেন। ব্রেট বলেন যে তিনি 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস' অ্যাসোসিয়েশনে'র একজন সদস্য এবং অ্যাসোসিয়েশন মামলার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছে।

এগলিংটন (ব্রেটকে প্রশ্ন করেন) : নীলদর্পণে রায়তদের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে নীলদর্পণের বক্তব্যের বিরোধ রয়েছে।

ব্রেট : নীলদর্পণে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। ইংলিশম্যান পত্রিকাটির প্রচার 'লাইবেলে'র প্রকাশে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি।

এগলিংটন : এটা কি সত্য নয় যে 'নীল-প্রশ্নে' নীলকরদের সপক্ষে মত প্রকাশ করায় আপনার পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বিষয়ে নীলকরদের অবদান আছে।

ব্রেট : আদালত বাধ্য না করলে আমি এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিতে বাধ্য নই, তবে ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি যে আপনার ধারণা সত্য নয়।

বিচারক ওয়েলস্ : ইংলণ্ডে অনেক সত্বাধিকারী নিজের পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা এর ফলে তাঁর বিজ্ঞাপন প্রাপ্তিতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

এগলিংটন : অনুদিত গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে আপনি (ব্রেটকে প্রশ্ন) নীল-করদের কাছ থেকে গ্রাহক চাঁদা হিসাবে ১০০০ টাকা পেয়েছেন কি ?

ব্রেট : আমার বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকায় আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।

বিচারক ওয়েলসের অনুরোধে ব্রেট এগলিংটনের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি স্বীকার করেন যে নীলকরদের কাছ থেকে গ্রাহক চাঁদা হিসাবে ১০০০ টাকা পেয়েছেন।

এগলিংটন : আমি মনে করি যে পৃথিবীর সর্বত্র সংবাদপত্র কোন না কোন বিশেষ মত বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করে থাকে।

ব্রেট : আমিও সেকথা বিশ্বাস করি।

বাদীর কৌঁসুলি কাউই'র প্রশ্ন : মিঃ ব্রেট, আপনি কি ১০০০ টাকার বিনিময়ে নীলকরদের সপক্ষে প্রচার চালিয়েছেন ?

ব্রেট : নিশ্চয় না।

কাউই : আপনি কি মনে করেন নীলদর্পণে ১০০০ টাকার ঘুষ নেওয়ার উল্লেখ আপনাকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে

ব্রেট : আমি সেকথা মনে করি

'হরকরা'র সম্পাদক আলেকজাণ্ডার ফরবেস আদালতে মিঃ ব্রেটের সঙ্গে এই ব্যাপারে নিজের মতৈক্যের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আদালতে লঙের সংশোধিত প্রুফের হস্তলিপি সনাক্ত করেন।

বাদী পক্ষের কৌঁসুলি কাউই বলেন যে লঙ অনূদিত গ্রন্থটির বিতরণের ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। আদালত কাউই'র বক্তব্য মেনে নেন।

দ্বিতীয় দিনে (২০শে জুলাই) আদালতে লঙের বিতরণ তালিকাটি পেশ করা হয়। জুরিরা লঙের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নেন। তাঁরা লঙের বিরুদ্ধে রায় দেন।

তৃতীয় দিনে (২২শে জুলাই) বিচারক ওয়েলস জুরিদের রায় সম্বন্ধে এগলিংটনের মতামত জানতে চান। এগলিংটন ও লঙ সময় নেন।

১৮৬১ খৃঃ ২৪শে জুলাই ঐতিহাসিক নীলদর্পণ মামলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিচারক ওয়েলস জুরিদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পাদরী লঙের কৌঁসুলিদের মতামত জানতে চান।

কৌঁসুলিরা জুরিদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন

লঙের বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ ছিল নিরবঙ্গের নীলকরদের বিরুদ্ধে শ্রেণীগত বিদ্বেষ প্রচার। সেই প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে নীলকরদের বিরুদ্ধে শ্রেণীগত বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ মেনে নিলে ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ মেনে নিতে হবে। অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নিখুঁত চিত্রায়ণ ঘটেছে। ডিকেন্স কমার্শিয়াল হাউসের মালিকদের নির্দয়তার চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন—সুতরাং ডিকেন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হয়। নীলকরদের শোষণের চিত্র অঙ্কন যদি 'লাইবেলে'র কারণ হয় তবে দেশীয়দের নীচ চরিত্র অঙ্কনও 'লাইবেলে'র কারণ হতে পারে।

লঙের বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল সংবাদপত্রের সম্পাদকদ্বয়ের মর্যাদাহানি। সেই প্রসঙ্গে কৌঁসুলিরা বলেন যে বর্তমান যুগে সংবাদপত্র কোন না কোন বিশেষ শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে থাকে। সুতরাং নীলকর-দের মুখপত্র হিসাবে ইংলিশম্যান ও হরকরার উল্লেখ 'লাইবেলের অভিযোগ আনয়নের কারণ হতে পারে না। 'জুডাস খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুখৃষ্টকে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল, সম্পাদক-যুগল সংস্র মুদ্রা লাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল করলে নিক্ষেপ করিবে, আশ্চর্য কি?' অংশটি শৈল্পিক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। গ্রন্থকার বা অনুবাদক নীলকরদের তুলনা হিসাবে জুডাসের উল্লেখ করেন নি।

বিচারক ওয়েলস পাদরী লঙের মতামত জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

লঙ আদালতে একটি লিখিত বিবরণ পাঠ করেন। বিবরণটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপ উল্লেখ করা হচ্ছে :

"বিশ বৎসরের অধিক সময় আমি এইদেশে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে আমি কখনও আদালতে বাদী বা প্রতিবাদী হিসাবে উপস্থিত হই নি। নীল-প্রশ্নে জনগণের অনুভূতিকে প্রভাবশালী য়ুরোপীয়দের দৃষ্টিতে আনার জন্যে আমি নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম এবং সেই কারণে আমি আজ প্রতিবাদীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। মিঃ পিটারসনের বক্তব্য প্রকারান্তে আমার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছে। তিনি বলেছেন যে নাটকটিতে বিদ্রোহের উস্কানী আছে—যদি তাঁর কথা সত্য হয় তবে সেই অগ্নিগর্ভ অবস্থা য়ুরোপীয়দের কাছে তুলে ধরে আমি কি সমাজ সেবার কাজ করি নি? অনূদিত নাটকটি আমি প্রভাবশালী য়ুরোপীয় এবং ব্রিটিশ আইন প্রণয়নকারী ও প্রশাসকদের মধ্যে

বিতরণ করেছি—কেননা তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি নীলকর স্ত্রীদের চারিত্রিক পবিত্রতায় সংশয় প্রকাশ করেছি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আমি বিশ্বাস করি যে নীলকরদের স্ত্রীরা অন্যান্য ইংরাজ মহিলার মত চারিত্রিক পবিত্রতায় উজ্জ্বল। আসলে প্রাচ্যদেশে মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিন্দিত হয়ে থাকে—নাটকটিতে দেশীয় মহিলাদের কথোপকথনে তার প্রকাশ ঘটেছে। আমার স্ত্রীর সম্পর্কে আমি নিজে অনেক কুট মন্তব্য শুনেছি এবং এই মন্তব্যগুলি গ্রাম্য অজ্ঞতা-জাত বলে উপেক্ষা করেছি। সুপ্রীম কোর্টের প্রখ্যাত বিচারপতি স্যর ইউলিয়াম জোন্স হিন্দু-সমাজের চিত্র তুলে ধরার জন্যে প্রথম এদেশীয় একটি নাটকের অনুবাদ করেন।

নীল কমিশনে আমার সাক্ষ্যদানে কিংবা নীল-বিরোধের বিষয় মিশনারী-দের জ্ঞাত করার জন্যে আমার কার্যকলাপ নীলকরদের বিব্রত করেনি। অথচ অজস্র অনুবাদের একটি অনুবাদ হিসাবে নীলদর্পণের প্রকাশক হওয়ায় আমি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি।

শান্তির অতন্দ্র প্রহরা একজন মিশনারীর পবিত্র কর্ম। সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা আজও কলকাতা ভুলে যায় নি। ঠগীদের অত্যাচার, সাঁওতালদের বিদ্রোহ আজও মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। উক্ত বিষয় সমূহের উপর, বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের উপর রচিত কোন নাটক যদি রচিত হত এবং আমি সেই নাটক যদি অনুবাদ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতাম তবে আমি অনেক রক্তপাত থেকে এদেশকে রক্ষা করতে পারতাম। নীল-বিরোধের রক্তাক্ত পরিণতি ঘটতে পারে আশঙ্কা করে আমি অনূদিত নাটকটির প্রকাশক হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি যে দেশীয়দের অনুভূতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা এদেশে য়ুরোপীয়দের বসবাসকে নিরাপদ করতে পারে।

নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশের অন্য একটি কারণও আছে। সিপাহী যুদ্ধের সময় এবং আফগান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সীমান্তে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল 'পার্লিয়ামেণ্টের ব্লু বুকে' একথা স্বীকার করা হয়েছে। অনুরূপ অবস্থায় এদেশীয়দের সন্তোষই সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হতে পারে।

মিশনারী হিসাবে প্রচারকার্য করতে গিয়ে আমি অনুভব করেছি যে আমার স্বদেশবাসীর আচার-আচরণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রসারের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

কেননা এদেশের মানুষেরা য়ুরোপীয়দের আচার-আচরণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের ব্যবহারিক প্রকাশ দেখতে চায়। এদেশের অন্যত্র মানুষ আমাকে বলেছে যে য়ুরোপীয়দের খ্রীষ্ট এদেশের রায়তদের শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য এবং সামাজিক প্রথা সর্বস্বতা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করছে। আমি এই বিষয়ে একাধিক পুস্তিকা ইংলণ্ডে প্রচার করেছি। অনুরূপ অবস্থায় নীল ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এদেশের জনগণের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে আমি কি উদাসীন থাকতে পারি?'

বিচারপতি লঙের লিখিত বিবৃতিটি অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন। তিনি সম্পূর্ণ বিবৃতিটি পাঠ করতে দেন নি।

লঙ তাঁর লিখিত বিবৃতিটির যে অংশ পাঠ করতে পারেন নি তার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হচ্ছে: 'ইংলণ্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আমার কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। নিপীড়িত জনগণের মর্যাদা হানিকর দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর সংগ্রামের ফলাফল জানতে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রায়তদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমি রায়তদের অবস্থা জেনেছি। রায়তদের নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য আমার হৃদয়, মন ও চৈতন্য বারবার ভেঙে পড়েছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে জনগণের মধ্যে আছি এবং যতদিন আমার চিন্তা করার ক্ষমতা ও লেখার ক্ষমতা থাকবে ততদিন আমি জনগণের সামাজিক উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। কেননা রায়তদের সামাজিক উন্নতি ব্যতীত রায়তেরা সুসমাচারের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। সম্প্রসারিত অর্থে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার একটি রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ। এই ধর্ম অতীতে রোমানদের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, মধ্যযুগে সার্ফদের আশ্রয় দিয়েছে, এবং সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছে এবং আধুনিক যুগে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও অন্যত্র দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। অতি সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর সর্বত্র এই ধর্ম আদিবাসী-দের রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং নীলকরদের বিরুদ্ধে আমার বা মিশনারীদের রাজনৈতিক অভিসন্ধির কথা প্রচার করা অর্থহীন। ১৮৫৬ খৃঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত মিশনারীদের সম্মেলনে আমি 'Peasant degradation, an obstaole to Gospel propagation' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।-সেই সময় আমার বক্তৃতায় রাজনীতির গন্ধ আছে বলে কোন অভিযোগ শোনা যায় নি।

আমি বিশ্বাস করি ভারতীয়দের মঙ্গলের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতে বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় আমার বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

আদালতে জুরিরা আমাকে 'লিবেলে'র অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষণা করেছেন। আদালতের রায়কে স্বীকার করে নেওয়া আমার পবিত্র কর্তব্য। যদিও আমার বিবেক বলছে যে আমি কোন নৈতিক বা অন্য কোন অপরাধ করিনি। অনুদিত গ্রন্থটি যদি লাইবেলের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তবে বহু-পত্নীকতা, কুলীন ব্রাহ্মণের অনাচার, ভ্রাতৃবধূ ব্যবহার বা অন্য যে কোন সামাজিক কুপ্রথার উপর লিখিত গ্রন্থকে লাইবেলের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। কেননা প্রতিটি সামাজিক কুপ্রথাই একটি শ্রেণীস্বার্থে রক্ষিত ও পুষ্টিপুষ্ট হয়ে থাকে।'

বিচারক ওয়েলস সাধারণ কয়েদীদের মত লঙের একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানার রায় দেন।

বিচারকের রায় শুনে লঙ মন্তব্য করেন, 'আমি এখন যা করেছি, ভবিষ্যতেও ঠিক সেই কাজ করব।'

সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতে লঙের জরিমানার অর্থ প্রদান করেন। রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ লঙের মামলার ব্যয় বহন করেন।

রেভারেণ্ড জেমস লঙের বিচারের প্রহসন এদেশে ও য়ুরোপে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সীটনকারের সমালোচনাটি উল্লেখযোগ্য।[১২] রেবতী ও আদুরীর কথোপকথনের সময় আদুরী বলেছিল—'বিবাবার···আলোর হাকিম।' এবং ইন্দ্রাবাদের জেলখানায় দারোগা ও জমাদারের কথোপকথনের সময় জমাদার বলেছিল—'শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাপ্পন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি চিঠিতে এ গোরবকে জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।' এই দুইটি অংশের অনুবাদের জন্যে রেভারেণ্ড লঙ আদালত কর্তৃক নিন্দিত হয়েছেন। প্রথমটিতে প্রাচ্য-দেশের পর্দানশিন রমণীদিগের কথোপকথনের স্বাভাবিক রীতি প্রকাশিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে আবহমান কালের সুপারিশের রীতি উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং উক্ত অংশ দুইটির জন্যে রেভারেণ্ড লঙের নিন্দা অর্থহীন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে ৩০,০০০ সহিযুক্ত একটি অভিনন্দন পত্র লঙের নিকট প্রেরিত হয়।[১৩]

১৮৬১ খৃঃ ২৬শে আগস্ট রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরের সভায় বিচারক মরডন্ট ওয়েলসের অপসারণের দাবী জানানো হয়।[১৪]

London Review তে লঙের বিচারের সমালোচনা করে লেখা হয়, ইংলণ্ডের কোন বিচারালয়ে অনুরূপ পক্ষপাতদুষ্ট বিচার দেখা যায় নি—ইংলণ্ডের অধীনস্থ কোন দেশে অনুরূপ বিচার সহ্য করা উচিত নয়।'[১৫]

The Daily News (London) এ মন্তব্য করা হয়, 'উক্ত বিচারে শিশু-সুলভ প্রতিহিংসার প্রতিফলন ঘটেছে।'[১৬]

১৮৬১ খৃঃ ৩০শে জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত মিশনারীদের সম্মেলনে রেভারেণ্ড লঙের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতার বিশপ ডঃ কৌন 'Christian Intelligencer'এ লিখিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, 'ডিফেন্স ইয়কশায়ারের স্কুল-শিক্ষক, সরকারী অফিসের কেরাণী, সওদাগরী হৌদের মালিকদের সমালোচনা করে অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেও লাইবেলের অভিযোগে অভিযুক্ত হন নি—ঐ একই কারণে লঙের বিরুদ্ধে লাইবেলের অভিযোগ অযৌক্তিক।'[১৭] অবশ্য একথা সত্য যে কলকাতার 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' সদস্যেরা নীলের মত বিতর্কিত ব্যাপারে লঙের মাত্রাতিরিক্তভাবে জড়িত হওয়া পছন্দ করেন নি এবং লঙকে বহিষ্কারের কথা চিন্তা করেছিলেন। লর্ড ক্যানিং কলকাতার বিশপকে লিখিত এক পত্রে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্যে অনুরোধ জানান।[১৮] পরবর্তীকালে সোসাইটির চিন্তার পরিবর্তন ঘটে এবং লণ্ডনের চার্চ মিশনারী সোসাইটির কেন্দ্রীয় সংগঠন লঙের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৯] Aborgines' Protection Society'র কেন্দ্রীয় সংগঠন লঙের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।[২০]

এদেশের পত্র পত্রিকায় লঙের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পিটারসন মন্তব্য করেছিলেন, 'Government of the country were on trail' ; পিটারসনের মন্তব্যের উত্তরে হিন্দু পেট্রিয়টে বলা হয়েছিল, 'Nay more than that, the defendants were more numerous than the court could accommodate, and a far more important body than even the Government.'[২১] বিশপ কলেজের অধ্যাপক Dr. Key একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতি চার্চ-

মিশনারী সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছিল, 'অনুরূপ যদি শ্রীষ্টীয় শিক্ষা হয় তবে আমরা কামনা করব যে সমস্ত ভারতবাসী শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করুক।'[২২] সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছিল, 'মিশনারীদের এদেশে আগমনই ব্রিটিশ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।'[২৩]

দেশীয় নেতৃবর্গ লঙের কারাবাস মুকুবের জন্য আবেদন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মিশনারীরা সরকারকে বিব্রত করতে না চাওয়ায় সেই আবেদন করা হয় নি।[২৪]

১৮৬১ খৃঃ ২৪শে আগস্ট লঙের মুক্তির দিনে জনসমাবেশের আয়োজন লঙের অনিচ্ছায় ও রাজনৈতিক কারণে পরিত্যক্ত হয়। মুক্তির দিনে দু-তিনশো ব্যক্তি জেল ফটকে উপস্থিত ছিলেন।[২৫]

মুক্তি পেয়েই লঙ ঘোষণা করলেন যে একটি মহৎ আদর্শ নিয়ে তিনি 'নীল বিরোধে' জড়িয়েছিলেন। তিনি নীলকরদের উদ্দেশ্যে লিখলেন—Strike but Hear!' লঙের পুস্তিকাটির সমালোচনা করে বেঙ্গল হরকরায় বলা হল, 'The Godfather of the Nil Durpan invites the planters and the world generally to apply 'Shamchand' to his reverend person but to do him the favour to hear him'.[২৬]

নীলকররা লণ্ডন হতে 'Brahmeis and Pariahs' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। উক্ত পুস্তিকায় বলা হল লেঃ গভর্নর গ্রাণ্ট এদেশে ব্রিটিশ পুঁজি নষ্ট করছেন এবং বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাচ্ছেন। গ্রাণ্ট 'the present high priest of the Civil service Juggernaut' বলে পুস্তিকাটিতে অভিহিত হন।

১৮২৯ খৃঃ কলকাতার টাউন হলের এক সভায় রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার কলোনাইজেশনের প্রস্তাব করেন। তাঁদের অবাস্তব আশা ছিল যে সৎ য়ুরোপীয় শিল্প-বণিকদের আগমনে এদেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে। সমসাময়িক কালের ইংলণ্ডে বাণিজ্য বণিকদের সঙ্গে শিল্প বণিকদের যে দ্বন্দ্ব চলেছিল রামমোহন সেই দ্বন্দ্বে শিল্প-বণিকদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যেন-তেন প্রকারেন সমৃদ্ধি অর্জন যাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল তারাই এদেশে settlers হিসাবে, নীলকর হিসাবে আসেন। য়ুরোপের তথা ইংলণ্ডের শিল্প-বণিকদের কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ উপনিবেশে সম্ভব ছিল না—কেননা এদেশকে কাঁচামালের দেশ করে রাখাই ব্রিটিশ শিল্প-বণিকদের স্বার্থের অনুকূল

ছিল। নীল-আবাদকে কৃষি-শিল্পের অগ্রদূত রূপে চিহ্নিত করে রামমোহন রায় কাজ করেছিলেন। পাদরি লঙ এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আন্তর্জাতিক চেতনা থেকে কোম্পানি-ইজারাদারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে যারা মিডল ক্লাস বা মধ্যবিত্ত এবং য়ুরোপে যারা বুর্জোয়া বলে অভিহিত হতেন তাদের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ১৮৩২ খৃঃ রিফর্ম বিলে middle class bourgeoisie-দের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নীল বিরোধে এই বুর্জোয়া-ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সীটনকার, গ্রান্ট প্রমুখ প্রশাসকেরা রায়তদের স্বার্থের পক্ষে এবং ব্রিটিশ বণিক স্বার্থের বিপক্ষে ছিলেন। আসলে বিহুমীরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির ফলে তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে এদেশের মানুষের প্রতি লিবেরাল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় না দিলে ব্রিটিশ প্রশাসনের মূলভিত্তি বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে নীলকররা এবং তাদের সমর্থক প্রশাসকেরা মনে করতেন যে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুযোগ গ্রহণ করে চূড়ান্ত শোষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজি ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির প্রয়োজন। নীল-বিরোধ উভয় পক্ষের বিরোধে হল 'liberal' ও conservative দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ। একপক্ষ একটি মুক্তিভিত্তিক নীতি গড়ে তুলতে চেয়েছেন, অন্যপক্ষ অর্জিত অধিকারকে কঠোর ও নিষ্ঠুর করতে চেয়েছেন।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৃষ্ট শাসকপ্রভুরা, মুৎসুদ্দী সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন। এঁদের একটি অংশ মানবিক কারণে এবং অন্য একটি অংশ নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থে রায়তদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৃষ্ট ভূম্যধিকারীগণ নীলকরদের অত্যাচারে বিব্রত হয়েছিলেন। নীলকরেরা পত্তনি নিতেন অথচ খাজনা দিতেন না। ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গোপাল চরকদার (হাঁসখালি-গোবিন্দপুরের ভূম্যধিকারী) এবং নদীয়ার শিবনিবাসের বৃন্দাবন সরকার চৌধুরী নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে রায়তদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়া পীতম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং বিশ্বনাথ সর্দার বা বিলে ডাকাতের সশস্ত্র প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য। নীল বিদ্রোহের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের [illegible] ডাকাতের ফাঁসি এবং রায়তদের প্রতিরোধ [illegible] বিদ্রোহের কাছে পৌঁছে দেন।

উনিশ শতকের [illegible] সৃজনশীল সাহিত্যের নবজাগরণের যুগে একাধিক লেখক নীলকরদের অত্যাচারের কথা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেন। মীর মোসারফ হোসেনের রচিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় নীলকর [illegible] ও অত্যাচারিত পল্লী বাঙলার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় এবং টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত 'আলালের ঘরে দুলাল' নামক গ্রন্থে নীলকরদের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমগ্র জাতির নীলচাষ সম্পর্কিত মানসিকতার সর্বাত্মক একটা ঘটেছে দীনবন্ধুর রচিত নীলদর্পণ নাটকে। সাহিত্য যে সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে 'নীলদর্পণ' তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। আমেরিকার দাসপ্রথা বিলোপে 'Uncle Tom's Cabin'-এর অবদানের সঙ্গে নীলদর্পণ তুলনীয়। লঙ 'নীলদর্পণ'কে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে আনলেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এবং অন্যান্য প্রশাসনিক পদলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধে প্রশাসন যন্ত্রের যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন মহেশগঞ্জের নীলকর সাহেবের অত্যাচার নিবারণ করেন। নীলকররা বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার মূল্য এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল।[৭] যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ নিজের চাকুরি ও জীবন বিপন্ন করে পচাপাড়ার কুঠির মালিক ম্যাকেঞ্জিকে শায়েস্তা করেন।[৮]

কিন্তু ইউরোপীয় মিশনারীরা এবং পাদরি লঙ নীলচাষের মত বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়লেন কেন? গ্রান্ট বা সীটনকারেরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য থেকে এবং বিভিন্ন বণিকী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে ভারতদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন নিছক সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে মিশনারীরা নীলের মত বিতর্কিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন নি। [illegible] পাদরি লঙ সম্পর্কে সেকথা যান্ত্রিকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে লিবেরাল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একটি বিশিষ্ট খ্রীষ্টীয় মানবিক অনুভূতির সংমিশ্রণই লঙকে নীল-বিরোধের সঙ্গে আত্মরিকভাবে জড়িত করেছিল।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির স্লোগান তুলে ইউরোপের বণিক সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এই সংগ্রামের ফলে [illegible]

অংশ বণিক সম্প্রদায়ের সহযোগী শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে বণিক সম্প্রদায় তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না এবং চার্চকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নতুনভাবে নিয়োজিত করলেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধন-বৈষম্য ও শিল্প-বণিকদের অপরিসীম লোভ দেখে এবং স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি স্লোগানের প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে ধর্মীয় যাজকেরা অনেকেই শিল্প বণিকদের লোভকে সংযত করতে সচেষ্ট হলেন। ভিক্টোরিয়া যুগের শুরুতে ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন ধর্মযাজকদের শ্রমজীবী মানুষদের কথা ভাবতে শেখাল—ক্ষমতাচ্যুত অভিজাতরাও শ্রমজীবীদের প্রতি দরদী হয়ে উঠলেন। ফলে ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ খৃঃ মধ্যে ইংলণ্ডে Christian interventionism-এর স্লোগান উঠল এবং অভিজাতেরা এই স্লোগানের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি প্রকাশ করলেন (শ্রেণী বিভক্ত সমাজে অর্থ প্রতিভাকে ব্যবহার করে এবং প্রতিভা অর্থের সামাজিক স্বীকৃতি এনে দেয়)। 'Do unto others as you would that they should do to you', 'Thow canst not serve God and Mammon', প্রভৃতি সুসমাচারের বাণীর সাহায্যে ধর্মযাজকেরা শিল্প-বণিকদের লোভকে সংযত করতে সচেষ্ট হলেন। রেভ'রেণ্ড উইলিয়াম গ্যাসকেলের স্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী গ্যাসকেল 'Christian interventionism' মতবাদের পক্ষে সক্রিয় প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন।[২৯]

উনিশ শতকের তিনের দশকে লণ্ডনে ইসলিংটন কলেজে অধ্যয়নের সময় 'রিফর্ম বিলে'র প্রয়োগ, চার্টিস্ট আন্দোলন, 'Christian interventionism' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিঃসন্দেহে লঙকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তী-কালে পাদরী লঙ রায়তদের জন্যে কারাদণ্ড ভোগ করেছেন কিন্তু তাদের নীল চাষ বন্ধ করার পরামর্শ দেন নি। আসলে তিনি নীল চাষকে ব্যবস্থা ভিত্তিক এবং নীলকর সাহেবদের সুসমাচারের বাণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখেছেন।

পাদরী লঙ এবং ব্রিটিশ লিবেরাল প্রশাসকদের একই মানদণ্ডে বিচার করলে ভুল হবে একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। Christian interventionism-এর সমর্থক Charlotte Elizabeth তাঁর 'Helen Fleetwood' গ্রন্থে বলেছেন যে কারখানার মালিকেরা শয়তানের রূপ নিয়েছে—তাঁর কাছে Contract labour' ভণ্ডামীর নামান্তর।[৩০] লঙের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা Charlotte Elizabeth-এর মত। ব্রিটিশ লিবেরাল প্রশাসকরা, দেশীয় জমিদারেরা এবং

শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা লঙের এই Christian interventionism-এর চেতনাটিকে যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছিলেন।

পাদরী লঙ তাঁর বিবৃতিতে একাধিকবার নব-বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে প্রশাসককে সতর্ক করতে চেয়েছেন। জমিতে রায়তি স্বত্বদান এবং মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পাদরী লঙ বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা ও য়ুরোপীয়দের এদেশে নিশ্চিত বসবাসের সুযোগ ভারতবর্ষের মঙ্গল আনবে। উনিশ শতকের বাঙলাদেশের সমস্ত মনীষী অনুরূপ বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বুর্জোয়া মুক্ত জীবনাদর্শের আলোটিকে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বড় করে দেখেছেন এবং আলোর নীচে অন্ধকারের প্রতি অপরিসীম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বিবর্ধিত হওয়ার ফলে 'Proletarianim'-এর প্রতি লঙের বিরাগ সুস্পষ্ট ছিল—তিনি মনে করতেন যে Proletarianism'-এর বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ অধর্মীয় ও ধ্বংসাত্মক। এইজন্যে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক স্যাক্সনি প্রভৃতি দেশের মত এদেশে কৃষকদের জমিতে রায়তি স্বত্বদানের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এদেশে ব্রিটিশ আনুকূল্যে লিবেরাল বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তিনি 'Proletarianism'-এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন দারিদ্র্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী লঙ বিবৃত হয়েছিলেন যে য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ এক নয় এবং এক হতে পারেও না। এখানেই লঙের চিন্তার স্ববিরোধ।

নীল-কমিশনে সাক্ষ্যদানের সময় লঙ নীল বিষয়ক প্রথম রচনা 'বাপরে বাপ! নীলকরের নিদারুণ অত্যাচার' নামে গদ্যে-পদ্যে লেখা একটি পুস্তিকার উল্লেখ করেন। পুস্তিকাটির গোড়ায় পাঁচটি গান আছে, 'সারি' গানের ঢঙে।[৩৪] রাম-রাবণলীলারও উল্লেখ আছে। পুস্তিকাটি সম্বন্ধে কমিশনে লঙ বলেন,[৩৫] ... songs have a powerful effect among Bengalees,...justifying the remarks of Burke 'Give me the making of the ballads of a nation and I will give you the making of the laws.'...it alarms me seriously for the future peace of India, unless an equitable adjustment of the question is made. এখানে একদিকে নিপীড়নের প্রতি ঘৃণা, অন্যদিকে দরিদ্র মানুষদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতি ভীতি প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তায় বড় ইংরেজ ও ছোট ইংরেজ ধারণা সৃষ্টিতে ডেভিড হেয়ার, ইমসন, লঙ প্রভৃতি য়ুরোপীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁরা এদেশে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার লিবেরাল চিন্তার বাস্তব অবয়ব ছিলেন। য়ুরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনে শিক্ষিত বাঙালী যে গৌরবময় বণিক রেনেসাঁসের চিন্তাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন লঙের মত য়ুরোপীয়দের মধ্যে তার বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যস্রষ্টাদের সৃষ্টিতে বারবার বড় ইংরেজের সাক্ষিণ্যে এদেশের মঙ্গলের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

হিউম্যানিস্ট লঙের ব্যক্তিমানস একটি বুদ্ধিদীপ্ত আন্তর্জাতিক চেতনার আলোকে প্রোজ্জ্বল ছিল। জ.মাইকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশের অত্যাচারিত কৃষকের সঙ্গে তিনি নীলচাষীদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে পূর্ব ও পশ্চিমের অত্যাচারিত কৃষক এক হয়ে গিয়েছিল—এটাই তাঁর ব্যক্তিমানসের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল।

টীকা :

১-৪। Lalit Chandra Mitra—The Indigo Disturbances in Bengal.

Statement By Rev. James Long—Printed by Sanders, Cones and Co.,—Calcutta, June 21, 1861

৬-৭। Kling—The Blu Mutiny

৮। Long's Statement

৯। Hindu Patriot—July, 1861—ললিতচন্দ্র মিত্রের গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য

" " " — "

Hindu Patriot, Englishman, Friend of India, Bengal Hurkaru প্রভৃতি সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত। সুধী প্রধান সম্পাদিত নীলদর্পণ দ্রষ্টব্য।

১২। Lalit Chandra Mitra—The Indigo Disturbances in Bengal

১৩। " " " — "

১৪। Hindu Patriot — Sept, 1861

১৫-১৬। Lalit Chandra Mitra—The Indigo Disturbances in India

১৭। Gibbs—History of Anglican Church in India

১৮। Kling—The Blue Mutiny
১৯-২০। Hindu Patriot—Nov 21, 1861
২১। Lalit Chandra Mitra—The Indigo Disturbances in Bengal
২২। Kling—The Blue Mutiny
২৩। " — " " "
২৪-২৫। Lalit Chandra Mitra—The Indigo Disturbances in Bengal
২৬। " " " " " " "
২৭-২৮। প্রমোদ সেনগুপ্ত — নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ
২৯। Louis Cazamian—The Social Novel in England (1833-50)
৩০। " " — " " " " "
৩১। সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)
৩২। Report of the Indigo Commission—1860—ললিতচন্দ্র মিত্র কর্তৃক উদ্ধৃত।

ঐতিহাসিক আশাবাদের দর্শন

ভি. প্রিপিস্‌নভ

প্রতিদিন পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ নিজেদের প্রশ্ন করেন: মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ কী? পৃথিবী কোন দিকে চলছে? আমাদের ভবিষ্যৎ কী? এসব প্রশ্নকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এগুলি অতি জরুরী প্রশ্ন, জীবন-সম্ভূত।

সোভিয়েত ভূমির ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জাতিগুলি অনুদ্বেজিত আস্থা নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতি নেত্রপাত করছেন। তাঁরা স্থিরপ্রত্যয় যে নিজেদের হাতে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন। এ হবে কোটি কোটি মানুষের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংগঠিত তৎপরতার ফল। কমিউনিজম অর্জন এঁদের অভিন্ন কামনা। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণের আগামী দিনের কথা ভাবতে আতঙ্ক জাগে, কেননা, আগামী দিনে বেকার হয়ে পড়তে পারেন, জীবনমান হঠাৎ পড়ে যেতে পারে, শোষণ তীব্রতর হতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন আতঙ্কের মধ্যেও আবার এঁরা ক্রমেই বেশি করে উন্নততর ভবিষ্যতের আশাও মনে মনে লালন করেন। ভবিষ্যতের চিন্তা আধুনিক বুর্জোয়াদের মনে জাগায় ভয় আর যাতনা। সামাজিকভাবে এদের সর্বনাশ অবধারিত।

আশাবাদ ও দুঃখবাদ

ভবিষ্যতের সমস্যার প্রতি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার পরস্পর-বিরুদ্ধ মনোভাব এবং এই দুই দুনিয়ার পরস্পর-বিরুদ্ধ লক্ষ্য পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশ্ববীক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক ঢাঁচের জন্ম দিয়েছে। তত্ত্বগত স্তরে এগুলি শ্রমিক-শ্রেণীর ঐতিহাসিক আশাবাদ ও বুর্জোয়াদের দুঃখবাদের, প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির রূপ নিয়েছে।

আশাবাদ আর দুঃখবাদ জগত, ভবিষ্যৎ ও ঘটনার বিষয়গত গতিপথ সম্পর্কে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। আশাবাদ ও দুঃখবাদের ধারণা সর্বোপরি একটি দর্শনের ভাবাবেগগত রঙের বৈশিষ্ট্য, এ একটি শ্রেণী বা সমাজের আত্মিক

আবহাওয়াকে, প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির পক্ষে উন্নততর সম্ভাবনার আস্থাকে কিংবা এর বিপরীতে প্রস্থানপর শ্রেণীগুলির ক্ষয়িষ্ণুতা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপলব্ধির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতিকে প্রতিবিম্বিত করে।

দর্শনে আশাবাদী ও দুঃখবাদী প্রবণতাগুলি হাজার হাজার বছরের পুরনো। দুঃখবাদ ও আশাবাদের সুনির্দিষ্ট রূপগুলির ঐতিহাসিক মূল ও ঐতিহাসিক প্রকৃতি কী? মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিনের ঐতিহাসিক আশাবাদ এবং মার্ক্সবাদের পূর্বেকার আশাবাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য কি ছিল?

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বেরিয়ে আসছে। প্রথমত, আশাবাদ কোন না কোন প্রকারে প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির ও সামাজিক অংশগুলির ভবিতব্যের সঙ্গে জড়িত ছিল, এবং এখনো রয়েছে, আর দুঃখবাদ জড়িত ঐতিহাসিক দৃশ্যপট থেকে প্রস্থানপর প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ও সামাজিক স্তরগুলির ভবিতব্যের সঙ্গে। যদিও এই সম্পর্ক পরম নয় তাহলেও দর্শনের গোটা ইতিহাস জুড়ে একটি প্রবণতা হিসাবে এর নিশানা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মার্ক্সবাদের পূর্বেকার দর্শনে আশাবাদী ঝোঁকের প্রকৃতি ছিল বিমূর্ত অনৈতিহাসিক।

মার্ক্সবাদের পূর্বেকার দর্শনে আশাবাদী ও দুঃখবাদী ঝোঁক সম্পর্কে মার্ক্সীয় মনোভাব শুধুমাত্র এইসব ঝোঁককে গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দুঃখবাদ মার্ক্সবাদের কাছে বিজাতীয়। দুঃখভোগ যা কিছু বিদ্যমান তারই নিয়ম, স্বর্ণযুগ ভবিষ্যতে নিহিত নেই, ছিল অতীতে—দুঃখবাদী দর্শনের এই বক্তব্যকে মার্ক্সবাদ নাকচ করে দেয়। যেসব বুর্জোয়া ভাবাদর্শ-প্রচারক পুঁজিবাদের অবসানকে পৃথিবীর অবসানের সঙ্গে একাত্ম করে দেখাতে চান তাদের ধারণাকেও মার্ক্সবাদ নাকচ করে দেয়। মার্ক্সবাদ দুঃখবাদের আবির্ভাবের এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে, এক সামাজিক শিকড়কে প্রদর্শন করে। মার্ক্সবাদ দেখায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের বিষয়গত অবস্থার ক্ষণস্থায়িত্বও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা এই আবির্ভাব নির্ধারিত হয়।

প্রতিক্রিয়াশীল, প্রস্থানপর শ্রেণীগুলির দুঃখবাদী বিশ্ববীক্ষার—যা মানুষকে নিষ্ক্রিয়তায় নামিয়ে এনেছিল—বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কসবাদের পূর্বেকার দর্শনে আশাবাদী প্রবণতা শক্তি সঞ্চয় করেছিল। সব সময়ই এই প্রবণতা একটি শ্রেণী-চরিত্রের ছাপ বহন করেছিল। কিন্তু, বিশেষ করে উদীয়মান বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শ-প্রচারকদের আশাবাদের একটি বিমূর্ত ও সীমিত প্রকৃতি ছিল। যে বুর্জোয়ারা সকল মানুষের মুক্তি, সমানাধিকার ও সৌভ্রাতৃত্বের স্লোগান নিয়ে

সাধারণতন্ত্রের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে শোষণের পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্বাধীনতার জন্যই শুধু চেষ্টা করত।

যে দর্শনের কোন ভবিষ্যৎ নেই

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জয়যুক্ত বুর্জোয়া বিপ্লব এবং বুর্জোয়াদের একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য যুগিয়েছিল যে, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ-প্রচারকরা যে "সেরা জিনিসগুলির দুনিয়ার" কথা ঘোষণা করেছিলেন সেটি ছিল মজুরি-দাসত্ব, শোষণ আর নিপীড়নের দুনিয়া। পুঁজিবাদ যখন তার সর্বোচ্চ ও সমাপ্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল, যখন আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষণগুলি আবির্ভূত হল, তখন বুর্জোয়া ভাবীকদের আশাবাদের চিহ্নমাত্রও আর রইল না। এখন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল গভীর দুঃখবাদ এবং ভবিষ্যতের ভয়।

আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনে সবগুলি প্রবণতাই ক্ষয়িষ্ণু দুঃখবাদ দ্বারা সংক্রামিত। কিন্তু দুঃখবাদের সবচেয়ে স্পষ্ট রূপগুলি সম্ভবত দেখতে পাওয়া যাবে পুঁজিবাদী পশ্চিমী দুনিয়ার অন্যতম সর্বাধিক প্রচারিত দার্শনিক প্রবণতা অস্তিত্ববাদের মধ্যে। অস্তিত্ববাদ আজকের দিনের পুঁজিবাদী সমাজের গভীর সংকটের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই কারণেই এটিকে বলা হয় সংকটে পড়া পুঁজিবাদের দর্শন ভীতির দর্শন। এ পুঁজিবাদী সমাজের সেই সদস্যদের মানসিকতাকে ব্যক্ত করে যারা মানবিক যুক্তিতে, এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতায়, এবং পুঁজিবাদের বিরোধসমূহ মেটাবার সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়েছে। এ বুর্জোয়া বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত দুঃখবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বাস্তবতা হল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবিশ্বাস, প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এরকম অনুভূতি ও আগামী দিনের ভয়।

মাঝে মাঝে পুঁজিবাদকে সমালোচনা ও ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য আবেদন করলেও মুক্তি ও বিপ্লবের প্রকৃত উপায় অস্তিত্ববাদীদের জানা নেই, তারা বিভ্রান্তিপনা প্রকাশ করে ও বামপন্থী বুলি কপচায় এবং বাস্তব থেকে মানুষের অন্তর্জগতে পলায়নের আহ্বান জানায়।

বিষয়গত নিয়মসমূহের ভিত্তিতে

আশাবাদী দার্শনিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ও ধারাবাহী মার্ক্সীয় দর্শনের

আশাবাদ একই সময়ে আবার মার্ক্সবাদের পূর্বেকার আশাবাদের রূপগুলি থেকে আপাতভাবে পৃথকও। ইতিহাসের বস্তুগত ধারণা সমাজের বিকাশকে দুটি প্রাথমিক শক্তি সৎ ও অসতের সংগ্রামের একটি প্রক্রিয়া বলে বিমূর্তভাবে দেখাকে বাতিল করে দেয়। সৎ ও অসতের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এদের মধ্যে সংগ্রাম সর্বোপরি প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম।

পৃথিবী সর্বোত্তম কালের দিকে এগিয়ে চলেছে এই বিমূর্ত আশাবাদী চিন্তাধারার স্থান নিচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রগতিশীল বিকাশ সম্পর্কিত ও বিকাশের কোন কোন স্তরের নতুন, উন্নততর স্তরে রূপান্তরণ সম্পর্কিত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অবশ্যনীয় শিক্ষা। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববীক্ষার বৈশিষ্ট্য হল সত্যিকার ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আশাবাদ যা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে, এর নিয়মসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থেকে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়: এ সমাজকে স্থানু নয় বরং গতিময় বলে মনে করে। সমাজের বিকাশকে বিশ্লেষণ করে মার্ক্স-লেনিনবাদই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেছিল যে মানবজাতি সত্যিই তার সর্বোত্তম ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলেছে, এবং এই ভবিষ্যৎ—সমাজতান্ত্রিক, ও পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট, শ্রেণীহীন সমাজ—গড়ে তোলার প্রধান প্রধান ধারাগুলিকে প্রকাশ করেছিল।

সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব ঐতিহাসিক আশাবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল। লেনিন বলেছিলেন: "ইতিহাস ও রাজনীতি সংক্রান্ত মতামতে পূর্বে যে বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়ালিপনা বিরাজ করত তার স্থলাভিষিক্ত হল লক্ষণীয়রূপে অখণ্ড ও সুসমঞ্জস একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দেখায় কিভাবে উৎপাদক শক্তিগুলির বৃদ্ধির ফলস্বরূপ সমাজ-জীবনের একটি প্রণালী থেকে অপর ও উচ্চতর একটি প্রণালীর বিকাশলাভ ঘটে।..."*

ঐতিহাসিক আশাবাদ সকল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে, এর সকল দিক ও অংশে সহজাত রয়েছে। পৃথিবী সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রশ্নে, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রশ্নে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আশাবাদী।

---

* ভি. আই. লেনিন, রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১৯, পৃ. ২৩

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী দর্শনের ঐতিহাসিক আশাবাদের রয়েছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য :

—এটি প্রকৃতির দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অখণ্ডনীয়, পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আশাবাদের মাত্রা বেড়ে চলছে।

—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশা সূচিত করা দূরের কথা, এই আশাবাদকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির পরিচালনাধীনে শ্রমিক-শ্রেণীর ও সকল শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় সৃষ্টিশীল, বৈজ্ঞানিক তৎপরতাকে আগে থেকে ধরে নেওয়া হয় ; শ্রমজীবী জনসাধারণের বিবর্ধমান তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতির সঙ্গে সঙ্গে এর বিকাশ ঘটে ;

—ইতিহাস এক মসৃণ, অকুটিল ও সরল রেখা ধরে চলে এই দাবির সঙ্গে ঐতিহাসিক আশাবাদের সাদৃশ্য নেই। ঐতিহাসিক আশাবাদের দর্শনে স্বীকার করা হয় যে নানা সামাজিক সমস্যা, অসুবিধা ও সাময়িক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এবং এগুলির সমাধান করতে হবে। এই সব সমস্যা সমাধান করার ও অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক আশাবাদ মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ঐতিহাসিক আশাবাদ ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম

আশাবাদ মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিনের এবং মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির গোটা রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের সহজাত। এমনকি ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শোকাবহ ও জটিল মুহূর্তগুলিতেও তাঁদের কাজকর্মকে আশাবাদ পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল।

১৮৭১ সনে ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় রাষ্ট্র প্যারিস কমিউনের পরাজয় ঘটে। শেষ বীর কমিউনার্ডদের গুলি করে হত্যা করা হয়, কিন্তু মার্ক্স "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নামে তাঁর পুস্তকে শ্রমিকশ্রেণী ও সকল শ্রমজীবী জনগণ সম্পর্কে বলতে যেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে "লড়াই অবশ্যই বারবার বাধবে, এর পরিসর ক্রমশ বেড়ে চলবে, শেষ পর্যন্ত কারা জয়ী হবে—ভোগদখলকারী

সৃষ্টিমেয় না বিপুল সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী মানুষ—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারেনা।"*

১৮৮৭ সনে আগামী বিশ্বযুদ্ধের প্রথম লক্ষণগুলি দিগন্তে দেখা দিয়েছিল। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা প্রত্যয় সহকারে বিবৃত করেছিলেন: এই সবের সমাপ্তি ঘটবে সাধারণ দেউলিয়াপণার মধ্যে, পুরনো রাষ্ট্রগুলির ও তাদের রুটিন বাঁধা রাষ্ট্রিক প্রাজ্ঞতার পতনের মধ্যে। ডজন ডজন রাজমুকুট রাস্তার ধুলায় ইতস্তত গড়াগড়ি যাবে, কেউ এগুলি কুড়িয়ে তুলবে না। একটি মাত্র জিনিস পরিষ্কার: শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হবে।

১৯০৭ সনে প্রথম রুশ বিপ্লব (১৯০৫-১৯০৭) পরাজিত হয় এবং এর পরে প্রতিক্রিয়ার একটি পর্ব চলে কিছুকাল ধরে। কিন্তু সেই তখনই এই বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করে লেনিন ভবিষ্যৎ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবার প্রক্রিয়া ছকে দিয়েছিলেন। লেনিনের আশাবাদ শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, এর নিয়মগুলি সম্পর্কে এবং ইতিহাসের নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মস্কোতে শান্তির শক্তিগুলির বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশনের ঠিক আগে, ১৯৭৩, অক্টোবর মাসে ঘোষণা করা হয়েছিল যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে মার্কিন ফৌজকে তৈরি থাকার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী তখন সবে আন্তর্জাতিক সহজতর সম্পর্কের প্রক্রিয়ায় প্রথম ফসল তুলতে শুরু করেছিল। এই সংবাদে পৃথিবী হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে এই শান্তি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ আশ্বাভরে ঘোষণা করেছিলেন:

"আমাদের শান্তির দর্শন ঐতিহাসিক আশাবাদের দর্শন। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি জটিল ও বিরোধপূর্ণ, তাহলেও আমরা এ বিষয়ে স্থিরপ্রত্যয় যে বর্তমানে যে ব্যাপক শান্তির অভিযান চলছে যে সফল হবে। আমাদের আশাবাদের ভিত্তি কী কী?

"আমাদের আশাবাদের ভিত্তি হল সর্বোপরি এই ঘটনা যে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের জোর শান্তির এরূপ একটি স্থায়ী, পরাক্রান্ত ও গতিময় উপাদান রয়েছে। এর

* কে. মার্ক্স ও এফ. এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃঃ ২৪০।

শান্তিকামী কর্মনীতি এই সমাজ-ব্যবস্থার একেবারে প্রকৃতি থেকেই জাত। আমাদের আশাবাদ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অধিকাংশের মত ও কর্মের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি সমেত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি রাষ্ট্র ও জাতির ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক শান্তিতে গভীর আগ্রহ আমাদের আশাবাদের ভিত্তি।

"আমাদের আশাবাদের ভিত্তি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতির ইতিমধ্যেই অর্জিত সাফল্যগুলি। আমাদের আশাবাদের ভিত্তি এই ঘটনাটি যে কোন কোন পুঁজিবাদী দেশে শাসক মহল পৃথিবীর শক্তিগুলির বর্তমান পরস্পর-সম্পর্কটির মর্ম ক্রমেই বেশি করে অবধারণ করছে, ক্রমেই উপলব্ধি করছে যে আন্তর্জাতিক সমস্যাদি সমাধান করার উপায় হিসাবে যুদ্ধ গ্রহণযোগ্য নয়।

"শান্তির প্রশ্নে আমাদের আশাবাদ শান্তির জন্য কর্মরত সবগুলি গণ-আন্দোলনের কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত।"

অতএব, যেসব শক্তি শান্তি নিশ্চিত করছে তাদের, সর্বোপরি সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপ আজকে শান্তি সম্পর্কে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি।

(কমিউনিষ্ট ভাত্রিকিভাবা, ১৪ মার্চ, ১৯৭৪)

অনুবাদ : শৈলেন চৌধুরী

পুরনোর পরিবর্তে নতুন বিশ্ব

রজনী পাম দত্ত

[ভারত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে, সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ক্রুশ্চেভ ও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনের ভারত ভ্রমণের অব্যবহিত পরে, 'লেবার মান্থলি' পত্রিকায় (জানুয়ারি, ১৯৫৬) রজনী পাম দত্ত কর্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

ইংরাজীতে প্রবন্ধটির নাম "নিউ ওয়ার্লডস্ ফর ওল্ড" (New Worlds for old)। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করায়, রজনী পাম দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে, আমরা প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশ করছি।]

সম্পাদক

"শেষ বিশ্লেষণে, সংগ্রামের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করবে এই ঘটনাটির ওপর যে রাশিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতিরা বিশ্বের জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের দখলীদার। এবং সংক্ষেপে এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিগত কয়েক বছরে মুক্তির সংগ্রামে এসে যোগ দিয়েছে এমন অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে, যে বিশ্ব সংগ্রামের চূড়ান্ত ফল কি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। এই দিক থেকে, সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন বিজয় পুরোপুরি এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে নিশ্চিত।"

(লেনিন, বরং কম, কিন্তু আরো ভাল, মার্চ, ১৯২৩)

লেনিন এই কথাগুলি লেখবার পরে এক শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছে। এর সাফল্যের এক অগ্রবর্তী স্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি, লেনিন যখন লিখেছিলেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র মুক্তি অর্জন করেছিল। চীন তখনও পাশ্চাত্য ফিনান্স-পুঁজি ও সমর প্রভুদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ঔপনিবেশিক ভারতে গান্ধী সবেমাত্র ছ' বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ী চীনা জনগণতন্ত্র। প্রায় এক দশক হতে চলল ভারত ঔপনিবেশিক শাসন ছিন্ন করেছে। আর এখন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সফরে

ভারতের লক্ষ-কোটি জনগণ যে আবেগদীপ্ত সুবিশাল সম্বর্ধনা জানাল তা ভারত কোন পথে চলেছে তার দিকে এবং ভারতের ও বিশ্বের এই নতুন শক্তির দিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের চোখ খুলে দিয়েছে। নতুন বিশ্বের এই বেগে অগ্রসরমান দৃশ্যের সম্মুখে গত হেমন্তের জেনেভার প্রাচীর তোলা কৌশল স্বস্থানে এবং স্বীয় অনুপাতে পতিত হয়েছে।

স্মরণীয় বছর

গত বছরের বহুধা জটিল ও পরস্পর-বিরোধী বুনুনির মধ্য থেকে দীর্ঘ-কালীন ঐতিহাসিক তাৎপর্যসমন্বিত তিনটি ঘটনা সকলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রথমটি হল, আফ্রো-এশীয় দেশগুলির বান্দুং সম্মেলন, সাম্রাজ্য-বাদের উপস্থিতি বাদ দিয়েই যা এই প্রথম আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির মুখপাত্রদের একত্রে মিলিত করেছিল, যা আর ইতিহাসের বস্তু হিসেবে নয়, এই প্রথম প্রভুরূপে তাদের মিলিত স্বরকে শুনিয়েছে এবং যা এই প্রথম, মানবজাতির অধিকাংশের সরকারী মুখপাত্রদের সর্বব্যাপক প্রতিনিধি সম্মেলনে, সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চুক্তি সমূহের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপ্রধানদের জেনেভা সম্মেলন—যা হল বান্দুং সম্মেলনের পরিণাম এবং অনেকটা পরিমাণেই তারই ফলশ্রুতি। এবং যা, এক দশকের প্রতি-বিপ্লবী নীতি ও ঠাণ্ডাযুদ্ধের রণনীতির দেউলিয়াপনাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্য-সমূহকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছে। তৃতীয়টি হচ্ছে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশ পরিভ্রমণ এবং যে নতুন পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হচ্ছে—যা শুধু তাদের সম্বর্ধনার গণ-আগ্রহেই নয়, পরন্তু সমানভাবেই পরাধীন ঔপনিবেশিক আর্থ-ব্যবস্থা অবসানের এবং শান্তির ভবিষ্যৎ নির্ধার্য করার জন্যে সহযোগিতার যে বাস্তব এবং গঠনমূলক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যেও পরিস্ফুট।

সুবর্ণ সংখ্যা

পশ্চিমের বিভিন্ন দূতাবাস ও প্রচার দপ্তরগুলি এখনও যে বিকৃত বিশ্ব চিত্রটির ধারণা করে রেখেছে তাকে শুধরে দেবার জন্য কিছু অঙ্ক এখানে উল্লেখ করা যেতে

পারে। ১৯৫০ সালে বিশ্বে জনসংখ্যার হিসেব ছিল ২৪৫.৪ কোটি (১৯৫৩-২৫৪.৭ কোটি)। এর মধ্যে এশিয়ার জনসংখ্যা হল ১৩২.০ কোটি, বা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। এশিয়া ও আফ্রিকার জনসংখ্যা হল ১৫১.৮ কোটি বা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৮ ভাগের ৫ ভাগ। যে তিনটি শক্তির কথা—সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও চীন—যাদের উল্লেখ লেনিন বিশেষভাবে করেছিলেন—কেবলমাত্র এই তিনের মিলিত জনসংখ্যাই ১২০ কোটির কাছাকাছি অর্থাৎ বিশ্ব-জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-জোটের (ন্যাটো—অনুবাদক) ১৪টি দেশের (তাদের উপনিবেশিক সাম্রাজ্য বাদ দিয়ে) মোট জনসংখ্যা হল ৩২ কোটি, বা বিশ্ব-জনসংখ্যার ৮ ভাগের ১ ভাগ। তত্রাচ এই সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসকরা—এতদিনকার এককালীন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভুত্বের অভ্যস্ততায় এখনও মনে করছে যে তারা বিশ্বের বা এমনকি (তাদের এখনও পর্যন্ত বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দৌলতে, ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ ছোঁয়া দিয়ে) যাকে তারা 'মুক্ত দুনিয়া' বলে খুশী হয় তার স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রেরিত নেতা, মুখপাত্র এবং বিচারক হিসেবে নিজেদের দাবী করতে পারে।

শক্তি সাম্যের পরিবর্তন

সংখ্যার মূল্যায়নের তাৎপর্য সামর্থ্য বা শক্তির প্রশ্ন নয়। এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতদিনও পর্যন্ত ছিল অথবা এখনও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অধীন, এবং ফলতঃ লুণ্ঠিত হয়েছে, পেছিয়ে গিয়েছে এবং তাদের বিকাশ হয়েছে বাধাগ্রস্ত, সেখানে অর্থনৈতিক ও কারিগরী স্তর এখনও নিম্নমানের, দারিদ্র ব্যাপক-বিস্তৃত, এবং সংখ্যার মাপ বস্তুগত মাত্রায় বর্তমানে সামর্থ্যের কোন মাপই নয়। তাৎর্যটা হল এই যে সর্বোপরি মানবজাতির এই বিশাল জনতা এখন চলমান, এবং তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কোনভাবেই পশ্চিমী শেয়ার বাজার বা তাদের 'সংস্কৃতিবান' ব্যাখ্যাতাদের বাধাদানকারী পূর্বধারণা এবং গণনার সঙ্গে মেলে না। তাছাড়াও, বস্তুগত সাম্যও এখন পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মুক্তির জন্য লড়াই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামের প্রথম ধাপ মাত্র। ইতিমধ্যেই, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তিধর অর্থনৈতিক সাফল্য বিশ্বের অর্থ-নৈতিক সাম্যে একটা চূড়ান্ত এবং ত্বরণ-সৃষ্টিকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে ; এবং পশ্চিমী 'উচ্চতর' সভ্যতার নেতৃবৃন্দই বৃটেন ও আমেরিকার একইরকম ভাবে,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে। আর এখন একটা অবস্থা এসেছে যখন যে সব উঠতি দেশ এখনও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পঙ্গুত্বের উত্তরাধিকার দ্বারা ভুগছে তাদের সাহায্যের জন্য এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা দ্বারা অগ্রগতির এক নতুন যুগের পথ উন্মুক্ত করার জন্যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এগিয়ে আসতে সমর্থ।

লৌহ-যবনিকা ছিন্ন

প্রায় দু'শো বছরের প্রভুত্বের দ্বারা ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের চারিদিকে লৌহযবনিকার ঘেরা দিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম বিজয়ের বহু পূর্বেই তারা ভারতকে 'রুশ বিপদ' থেকে 'রক্ষা' করার সাধু উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে এগোতে গিয়ে বা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন তিনটে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে তাদের এই আগ্রাসনকে তারা ন্যায্যতা দিয়েছিল এই বলে যে এগুলি পর্বৎ অতিক্রম করে 'রুশ'দের আগমনকে পূর্বেই বাধা দেবার জন্য ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং এরই পাশাপাশি ভারতে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই, সর্বপ্রকার সামরিক, পুলিশী এবং গোপন পুলিশী ব্যবস্থা অনেক জোরদার করা হয়েছিল ভারতকে এই খাঁচার মধ্যে আটকে রাখার জন্য। বিদেশ ভ্রমণকারী ভারতীয়দের পাশপোর্টে, যদি আদৌ তা পাওয়া যেতই, লেখা থাকত 'সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য গণ্য নয়।' কোন সোভিয়েত নাগরিকের 'ব্রিটিশ' ভারতে প্রবেশের ভিসা পাওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। একজন ভারতীয় সাংবাদিক স্মরণ করেছেন :

> "এই যুদ্ধের সময়ই একমাত্র, ১৯৪৩ সালে, আমরা প্রথম একজন সোভিয়েত-বাসীর সঙ্গে বোম্বাইতে দেখা করতে পারলাম—তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়া-ফেরত জাস-এর একজন প্রতিনিধি—তাকে বোম্বাইতে জাহাজ পাওয়া পর্যন্ত কয়েকদিন কাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যদিও চব্বিশ ঘন্টাই তাঁকে অনুসরণ করত গোয়েন্দারা" (কে. এ. আব্বাস, ব্লিৎস, নভেম্বর ১৯, ১৯৫৫)।

ব্রিটিশ শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, লৌহ যবনিকা উঠে গেছে। 'রুশ'রা এসেছেন পর্বৎ অতিক্রম করে, কিন্তু অস্ত্র হাতে নয়, বন্ধুত্ব নিয়ে ; এবং তাঁদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এমন গণ সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে যে বিশতাধিক বৎসরেও কোন

ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় তাদের সাড়ম্বর শোভাযাত্রা নিয়েও, এমনকি তাদের শাসনের বিরুদ্ধে আবেগ স্পন্দিত ঘৃণা এবং সর্বোচ্চ ক্রোধের গণ-প্রকাশেও এ ধরনের গণ-আবেগদীপ্ততা দেখার সুযোগ পান নি।

উচ্চকোটির সাহেবরা

এটা আশ্চর্যের নয় যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকরা তাদের জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ সীমাবহির্ভূত এই নব-বিশ্বের দৃশ্যের উন্মোচনকে গোপন করতে না-পারা রোষের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু তাদের অপমান বিবেচনাকে ছাড়িয়ে গেছে। অপরের অনুভূতির প্রতি স্বভাবতঃ স্থূলচর্মের স্পর্শকাতরতা বিরহিত চিত্ততার দরুন এশিয়া ও আফ্রিকায় সাহেবরা যে খ্যাতিলাভ করেছে, তার দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিন সরকারী ও আধা-সরকারী সংবাদপত্র এমন বিষোদ্গার করেছে, 'অজ্ঞ ভারতীয় জনগণ'-এর প্রতি তাদের দাদাসুলভ পিঠ চাপড়ানো মনোভাব ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে যে এমনকি ভারতের অত্যন্ত নরমপন্থী চিন্তার লোকদেরও বিরোধিতা জাগিয়ে তুলেছে। প্রথম দিকে এই প্রদর্শনকে তাৎপর্যবিহীন বলে তারা উড়িয়ে দিয়েছে, বিচক্ষণ **অবজার্ভার** মন্তব্য করেছে যে লোকেরা বেরিয়ে এসেছিল তার কারণ তাদের বাড়িগুলি হল ভীড়াক্রান্ত ও ঠাসা (অর্থাৎ ভাইসরয়দের আমলে এই ঠাসাঠাসি ছিল না)। ১৮ই নভেম্বরের, **নিউ-ইয়র্ক টাইমস্**-এর রায় হল 'অনেকেই একটু মজা দেখতে চেয়েছিল' আর **ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান** ২১শে নভেম্বর সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল এই বলে যে "এটা ঠিক যে, ভারতীয়রা আড়ম্বর দেখতে ভালবাসে এবং অনেকেই রুশ রাষ্ট্রপ্রধানদের দেখতে এসেছিল যেমন তারা ভীড় করে দেখতে যেত মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের।"

যেখানে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ একেবারেই যান নি সেই মালাবারে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর জন্য একই রকম আবেগদীপ্ততাকে এটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতে পারে না।

কিন্তু এই ভান বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা গেল না। মজা-পাওয়া ঘৃণার এই মুখোশ খুলে পড়ল। নভেম্বরের ২৬শের মধ্যেই ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান 'জনতার অত্যধিক আবেগকে ভয়ের সঙ্গে দেখল: "রুশদের যে অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব সম্বর্ধনা দেওয়া হল তা ভারতীয়দের ভাবিয়ে তুলেছে।"

যদি 'ভারতীয়রা' ভাবিত হয়ে পড়েছিল, তাহলে, সরলমনা পাঠকরা একথা

ভেবে ধাঁধায় পড়ে যেতে পারেন যে, কারা তাহলে ছিল এই বিশাল 'অভূতপূর্ব' এবং 'অত্যধিক আবেগস্পন্দিত' জনতারা। অবশ্যই এরা ছিল প্রকৃত ভারতীয় সাহেববের থেকে পৃথক, 'সামান্য নেটিভ' মাত্র। ডিসেম্বরের শুরুতে কলকাতার একটা জমায়েতে ত্রিশ লক্ষ লোকের সমাবেশ ('ইতিহাস'-এর বৃহত্তম সমাবেশ : একটি ভারতীয় সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী এক অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় জনতা, মানবেতিহাসের একটি রেকর্ড') ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর সাংবাদিককে ভারতে কমিউনিজম-এর অগ্রগতির সম্ভাবনা নিয়ে তিক্ত ভাবনায় ফেলেছে :

"যে মহাসাগর তরঙ্গতুল্য সম্বর্ধনা তাঁরা পেলেন কলকাতায় তা কমিউনিস্ট ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবেই, এখনই তাদের শতকরা ২৫ জন কমিউনিস্ট, সম্ভবতঃ আর ২৫ ভাগ কংগ্রেস, বাকী অর্ধেক একই পথের দরদী ও কমিউনিজমের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে রয়েছে। এদেরকেও জয় করে নিয়ে আসা হবে, কেননা এদের অবস্থান সেই 'স্বল্পশিক্ষিত বেকারদের বিশাল মলকুণ্ডে' যেখানে অকৃৎকার্যতার জন্য নিজেদের দায়ী না করে ব্যবস্থার ঘাড়ে (সমাজব্যবস্থা—অনুবাদক) সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়।"

"স্বল্পশিক্ষিত বেকারদের বিরাট মলকুণ্ড'—এই হচ্ছে ছাত্র ও স্নাতকদের প্রতি 'উদারমনা' 'সভ্য' ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর কৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। মুহূর্তের এই বদমেজাজের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি কারণ এর দ্বারা 'উদার-নৈতিক' কুশিক্ষিতদের মুখোশের আড়ালে বর্বরের আসল' মুখের আদলটা ধরা পড়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্র আত্মপ্রশস্তির শিঙায় স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী প্রাণপণ ফুঁ দিয়ে সন্তুষ্টি পেতে চেষ্টা করেছে এবং ভারতীয় আবেগে আঘাত করার সঠিক উপায় পেয়েছে সেই পুরাতনাতিরিক্ত গল্পের পুনরাবৃত্তি করে যে ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার 'স্বেচ্ছা নির্বাসনের মহত্তম দৃষ্টান্ত' দ্বারা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছিল।

"ভারত মুক্ত হয়েছে একটা ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনীতির ইতিহাসে 'স্বেচ্ছা নির্বাসনের মহত্তম কর্মের' দ্বারা।...'উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা' ব্রিটিশ জনগণের সরকার কেননা তারা ৪৮ কোটি লোকের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে সেটা ন্যায় ও সঠিক বলে। (রেনল্ডস্ নিউজ, ডিসেম্বর ৪, ১৯৫৫)

এ ধরনের দাবীর সঙ্গে টোরীদের দাবী মিলে যায় যে টোরীবাদই ব্রিটিশ

শ্রমিকশ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার, ভোট দেবার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনের অধিকার, কারখানা নিরাপত্তা অথবা সামাজিক সেবার অধিকার দিয়েছে। দীর্ঘকালীন ও তিক্ত সংগ্রাম প্রচারবিদদের যাদুদণ্ডের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছে অত্যাচারীর হৃদয়ের ঔদার্যে। এ কাহিনী ব্রিটেনে কিছু পরিমাণে এখনও চালু থাকতে পারে কারণ সেখানে কঠিন সত্যকে সাধারণের জানার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু খাস ব্রিটেনেই, 'সমগ্র ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামী' মালয়ের জনগণের ওপর যে বর্বর ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালিয়েছিল তা একজন আকস্মিক দর্শকেরও চোখে না পড়ে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুর্বল হয়ে পড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিদ্রোহী ৪০ কোটি ভারতীয় জনগণের ওপর শাসন টিঁকিয়ে রাখার অক্ষমতা মালয়ের ৬০ লাখ লোকের বেলায় সুর পাল্টে ফেলেছে। তবে কী এই সঠিক ও ন্যায় প্রতিপক্ষের আকার অনুযায়ী পাল্টে যায়?

ভারতীয় জনগণ কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাল

"স্বাধীনতা দান হিসেবে পাওয়া যায় না"—বলেছিলেন স্তালিন ১৯৫২ সালে। অভ্যুত্থানকে অবদমিত করার জন্য তার অস্ত্রাগারের সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে অকুণ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ, যার মধ্যে ছিল শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদও, তার বিরুদ্ধে শতবর্ষব্যাপী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় ভারতীয়রা সে কথা ভালভাবেই জানেন। তাঁরা ভুলে যান নি যে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী তোলার অপরাধে মিঃ অ্যাটলী সহ দ্বিতীয় শ্রমিক সরকার ৬০,০০০ ভারতীয় দেশপ্রেমিককে কারারুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণ-অভ্যুত্থান যখন নিপীড়ন-যন্ত্রের ক্ষমতা ছাপিয়ে উঠল, যখন ভারতীয় নৌ-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করল, ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে ফেলে কংগ্রেস, মুসলীম লীগের পতাকা ও লাল পতাকা উত্তোলন করল, যখন বোম্বাইয়ের জনগণ ব্রিটিশ সর্বাধিনায়কের ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে বোমার আঘাতে ধ্বংসের ভীতির বিরুদ্ধে নৌ-বিদ্রোহের প্রতি সংহতি জানাতে পথে এসে দাঁড়াল, যখন তিন দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি ৪০০ ব্যক্তিকে কেবলমাত্র বোম্বাইয়ের রাজপথে গুলি করে মেরে ফেলল: একমাত্র তখনই, ব্রিটিশ শাসনের সমগ্র ভিত্তিটাই চুরমার হয়ে যাবার ভয়ে, অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ত্বরান্বিত স্বীকার করে নিয়ে, যাতে

আরো খারাপ কিছু না হয়ে যায় তার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক সরকারের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের উচ্চ-শ্রেণী থেকে আগত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল মীমাংসায় পৌঁছবার জন্যে আলোচনায় বসল। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। আর ১৯শে ফেব্রুয়ারি মিঃ অ্যাটলী ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ক্যাবিনেট মিশন পাঠানর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পার্লামেন্টে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ১৯৪৭ সালের ৫ই মার্চ পার্লামেন্টে বললেন যে ঐ রকমের হস্তান্তরের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে 'বিশালসংখ্যক বাহিনীর দ্বারা বলীয়ান' হয়েই একমাত্র ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু এই বিকল্প 'সম্ভব নয়', কেননা অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী পাওয়া যাবে না। 'যখন একে চালিয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তি আমাদের নেই', তখন ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা 'স্পষ্টতঃই অসম্ভব'—ঘোষণা করলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড। একটা উল্লেখ-যোগ্য 'স্বেচ্ছা-পদত্যাগ।'

ইতিহাস দাঁড়িয়ে থাকে না

নিঃসন্দেহে, জাতীয় আন্দোলনের উচ্চ-শ্রেণীর নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল, উভয়ের কাছেই ভীতিজনক গণ-বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে এবং তার দ্বারা, সাধারণ ভিত্তিভূমির এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের জন্যে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল শর্তাদি, এবং এমনকি রাজ-নৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেও অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক অধিকার এবং বেশ কিছুটা পরিমাণে অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বজায় রাখতে।

কেননা, আসলে, ভারতীয় গণ-অভ্যুত্থান যা স্বাধীনতা আনয়ন করেছিল, নৌ-বিদ্রোহ এবং বোম্বাই অভ্যুত্থান, কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের অধীনে পরিচালিত হয় নি, বরং তার নিষিদ্ধকরণ ও অসমর্থনেই ঘটেছিল। ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল, ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের 'দান' হিসেবে নয় বা ভারতের উচ্চ-শ্রেণীর লোকদের দ্বারা নয়, পরন্তু আজ যারা সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে বিশাল আবেগ-স্পন্দিত সম্বর্ধনা জানিয়েছে সেই বহু লক্ষ কোটি ভারতীয় জনগণের দ্বারা। অতএব ১৯৪৭-এর মীমাংসা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটল; এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ-রাজকে শুধুমাত্র 'কমনওয়েলথ প্রধান' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল সার্বভৌম ভারতীয়

সাধারণতন্ত্র। কিন্তু আপস মীমাংসার মূল্য ছিল বিস্তর : ভারত-ভাগ ভারতীয় জনগণের শ্রম ও সম্পদের ওপর ব্রিটিশ লগ্নী-পুঁজির নিরবচ্ছিন্ন কব্জা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভূস্বামী এবং একচেটিয়াপতি-কবলিত সামাজিক কাঠামোর বজায় থাকা। তত্রাচ, বিগত দশকের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে ১৯৪৭-এর মীমাংসার সর্বপ্রকার কৌশল ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাদি দ্বারাও ভারতের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। মাউন্টব্যাটেন ও অ্যাটলীদের গণনা আশা করেছিল ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ধরে রাখবে, কিন্তু বিকাশ অগ্রতর পথে যেতে শুরু করেছে।

স্বাধীন ভারত এগোচ্ছে

বিগত দশকে ভারতীয় বিকাশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্ব পরিস্থিতির একটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য হল, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অধীনে ভারত উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৪৭ পরবর্তী প্রারম্ভিক অবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বের মত ঘনিষ্ঠই ছিল ; ব্রিটেনের সঙ্গে অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক এবং সামরিক বন্ধন ছিল বেশ খানিকটা (সেটা এখনও রয়েছে) ; পাকিস্তান, সিংহল এবং বার্মার মতই ভারতও ব্রিটিশ পুঁজির শোষণের বেশ একটা লাভজনক ক্ষেত্র ছিল ; রণনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, বিন্যাস এবং প্রশিক্ষণ ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের শেষদিকে চীন বিপ্লবের জয় এশিয়ার শক্তিসাম্যে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন, এবং ভারতের ক্ষেত্রে এক নতুন মোড়ের সূচনা এনে দিল। কোরিয়াতে মার্কিন আগ্রাসনের স্বপক্ষে ১৯৫০ সালের জুনে জাতিসংঘে প্রদত্ত ভারতীয় প্রতিনিধির ভোটই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মূল রণনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার শেষ দৃষ্টান্ত। এর অব্যবহিত পরেই, ১৯৫০ সালের জুলাইতে, নেহরু ও স্তালিনের মধ্যে কোরিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হল। কোরিয়াতে যুদ্ধবিরতি আনবার এবং তাকে কার্যকর করার জন্য ; ভিয়েতনামে শান্তি স্থাপন ও সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের মার্কিন পরিকল্পনার বিরোধিতার জন্য পাঁচটি কলম্বো জোটের দেশকে সংগঠিত করার ; এবং বান্দুং-এ আফ্রো-এশীয় সম্মেলন ডাকার জন্যে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে ভারত প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

বিশ্ব রাজনীতির নতুন উপাদান

জাতিসংঘে তথাকথিত আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী কর্তৃক নিরপেক্ষতার স্বপক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনা থেকে নিজেদের বিযুক্ত করার নীতির বিকাশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা নতুন উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছে। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ভারতীয় উপদ্বীপে এই নীতির প্রগতিমুখীনতাকে দৃঢ়তর করেছে। ন্যাটো চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি ও বাগদাদ চুক্তির মত আগ্রাসী সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধজোটকে ভারত প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ জানিয়েছে। নেহরু ও চু-এন-লাই, এই প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের পারস্পরিক সফর বিনিময়, নেহরুর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর ও এখন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের এই ভারত সফর এবং এই তিনটি দেশের উৎসাহব্যঞ্জক গণসম্বর্ধনা শান্তির জন্যে, জাতীয় স্বাধীনতা ও উপনিবেশবাদের অবসান, আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ও অস্ত্র সীমিতকরণের জন্য, এবং ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের অবসানের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা ইত্যাদির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন প্রমাণ করে দিয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যাসমূহ

এই অগ্রগতি কেবলমাত্র বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। একথা সত্য যে, ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল একটা ধ্বংসমুখীন ও ক্রমাবনতি-শীল অর্থনীতি। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের 'এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমীক্ষা' অনুসারে ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যে ভারতের মাথাপিছু জাতীয় আয় স্থির মূল্যে ৮৩ টাকা থেকে দাঁড়িয়েছে ৭০ টাকা, বা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ১৬ ভাগ। ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্তসমূহ, প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত সামাজিক ও শ্রেণীগত পরিবর্তন বিশেষ করে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পথ এখনও উন্মুক্ত করে নি। তাহলেও, ১৯৫১ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, যদিও মূলতঃ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উপযুক্ত করে মানিয়ে নেওয়া, অর্থনৈতিক অগ্রগতির কিছু কিছু সূচনা করেছে। ১৯৫১ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে শিল্প-উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩৭ ভাগ, কৃষি উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ। খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন (এর জন্যে অনুকূল আবহাওয়া অংশত দায়ী)। মাথাপিছু খাদ্য ব্যবহার সরকারী হিসেব অনুযায়ী বেড়েছে ১৯৫০-৫১ সালের ১০৯৮ ক্যালোরি থেকে ১৯৫৩-৫৪তে ১৬২৩ ক্যালোরি।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, যার প্রাথমিক খসড়া কর্মসূচী প্রকাশিত হয়েছে এবং যার প্রস্তুতিতে পরিকল্পনা কমিশন সোভিয়েত সহ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদদের সহায়তা নিয়েছেন, তা' উপনিবেশিক অর্থনীতির ভিতকে আক্রমণ শুরু করার দিকে এক নতুন অগ্র পদক্ষেপ এবং শিল্পায়ন ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা ব্যাপকতর করার লক্ষ্য স্থির করেছে। খসড়া কর্মসূচী ৪২০ কোটি পাউণ্ড নীট নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছে, এর মধ্যে ২৫৫ কোটি পাউণ্ড বা ৬১ শতাংশ হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, এবং ২৬ শতাংশ (প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র ৮ শতাংশ) ব্যয় হবে শিল্প বিকাশে—এক্ষেত্রে মুখ্য জোর দেওয়া হয়েছে লৌহ-ইস্পাত ও ভারী শিল্পের ওপর। জাতীয় আয় ৫ বছরে ২৫ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অবশ্য বাধা দুস্তর। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল একচেটিয়া স্বার্থগোষ্ঠী তীক্ষ্ণ সমালোচনায় মুখর হয়েছে। পরন্তু, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল বিকাশমুখীনতার অনুরূপী অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল বিকাশ সুনিশ্চিত করতে পারে ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য।

সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহায়তা

ভারত, বার্মা ও অন্যান্য এশীয় দেশ যারা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে লড়ছে, একটা নতুন পথ তৈরীর জন্য ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবসানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য জনগণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা তাদের কাছে উপরোক্ত পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীর প্রেক্ষাপটেই এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। ৩·৩ কোটি পাউণ্ড মূলধনে ও সোভিয়েত সাহায্য ও কারিগরী যন্ত্রপাতির দ্বারা দশ লক্ষ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারির ভারত-সোভিয়েত চুক্তিতেই এর যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে। বৃথাই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ায় তাদের 'সাহায্য' ও বিনিয়োগের আয়তন নিয়ে বড়াই করে। কেননা, তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, এই ধরনের 'সহায়তা' অর্থনৈতিক পরাধীনতা দূরীকরণের জন্যে নয়, বরং অর্থনৈতিক, এমনকি রণনৈতিক পরাধীনতা বজায় রাখা এবং বিস্তৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কোন গাঁটছড়া নেই

এশিয়াতে পশ্চিমী ব্যক্তি-পুঁজি বিনিয়োগের সবটাই নিয়োজিত এইসব দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে এবং অর্থনীতিকে পশ্চাৎপদ রেখে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য। সরকারী 'সাহায্য' তো খোলাখুলিই ব্যবহৃত হয় রণনৈতিক উদ্দেশ্যে। সেইজন্যেই, সোভিয়েত প্রস্তাব যে ভারতীয় জনমতের আনুকূল্য পেয়েছে তার প্রতিফলন শুধু সাধারণ সংবাদপত্রেই নয়, পরন্তু বোম্বাইয়ের কমার্স (টাটা-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত)-এর মত একটি মুখ্য আর্থিক মুখপত্রের ২৬শে নভেম্বরের কলমেও পড়েছে :

"তাদের প্রস্তাব এই দেশের বহুর ভাল লেগেছে, তার একটা কারণ হল এর সঙ্গে কোন গাঁটছড়া নেই,...ভারতকে মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়তাদানের প্রশ্ন উঠলেই কিছু মার্কিন কংগ্রেস-সদস্য ও একশ্রেণীর সংবাদপত্র যেসব কঠোর ও শক্রভাবাপন্ন উচ্চারণ করে তার সঙ্গে তুলনায় এই মন্তব্যসমূহ (সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের) "স্নিগ্ধ বিপ্রতীপ।"

সোভিয়েত তেল-বিশেষজ্ঞরা দিল্লীতে এসেছেন, সুযোগ খুঁজতে নয়, ভারতের তৈল-সম্পদ উন্মুক্ত করতে সাহায্যের জন্য। অনুরূপভাবে, সোভিয়েত-বার্মা অর্থনৈতিক চুক্তি শুধুমাত্র শিল্প উদ্যোগ স্থাপন এবং কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ব'বস্থাই করছে না, এমনকি দানরূপে একটি প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ক্রুশ্চেভ লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে উপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সাধারণ সংগ্রামের সাধারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনাড়ম্বর উদ্দীপ্ত ভাষণ দেন যা তাঁর শ্রোতাদের অন্তরকে স্পর্শ করে :

"ওরা বলে যে উপনিবেশে বসে থেকে ওরা পশ্চাৎপদ লোকদের নিকট ওদের সভ্যতা নিয়ে এসেছে।

"আমরা বলি, জনগণ নিজের পরিশ্রম দিয়ে যে রুটী অর্জন করেছে সেই রুটীর শেষ টুকরোটুকুও কেড়ে নেবার জন্য ওরা উপনিবেশে বসেছিল। আর এটাই ওরা পছন্দ করে না।

"সত্য ওদের বিরুদ্ধে। আমি এ কথা বলতে পারছি কেননা আমি শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি। আমি মেহনতী শ্রেণীরই একজন।

"সোভিয়েত জনগণ আনন্দিত যে আপনারা ঔপনিবেশিক নিপীড়নকে উচ্ছেদ করেছেন এবং যাতে উপনিবেশবাদীরা আপনাদের শ্রমের ওপর জীবন

নির্ভর করার জন্য ফিরে না আসতে পারে সেইজন্য তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী সমস্ত সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

"যারা একই লক্ষ্যের জন্য পরিশ্রম করছে এবং নিজেরাও অত্যাচারিত ছিল একমাত্র সেই জনগণই আপনাদের জন্য এই ইচ্ছা পোষণ করতে পারে। আমি আপনাদেরই একজন, কেননা আমাকে ফরাসীদের জন্য কাজ করতে হয়েছে, আমি যে খনিতে কাজ করতাম সেটার মালিক ছিল ফরাসী। আমি ইংরেজদের জন্যে কাজ করেছি, জার্মানদের জন্যেও করেছি। আমি জানি অন্য কারো কাজ করার অর্থ কী।"

এটা কি আর বিস্ময়ের যে এমনকি দি টাইমস্‌ও তার ৫ই ডিসেম্বরের সম্পাদকীয় 'নতুন এশিয়া'য় এই দুঃখজনক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছে? :

"পাশ্চাত্য এশিয়াকে বুঝতে ভুল করবে যদি সে মনে করে যে কমিউনিজম-এর প্রতি এশিয়ার মনোভাবকে নিজের মনোভাবের সঙ্গে সমীকরণ করা যাবে। ...কমিউনিজম নিজেকে দারিদ্র ও অপমান থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তিদাতা বলে ঘোষণা করে। এশিয়ায় এই দুটো থেকে ভুগছে এমন অনেক সাধারণ মানুষ রয়েছে। সে মানুষের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করে, আর সেটা এশিয়াতে অত্যন্ত উষ্ণতার সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়। সে ঘোষণা করে সাম্যবাদ যা এশিয়া গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে চাইছে। তার বাণী সর্বপরিব্যাপী, যারা অনুভব করে যে পুরনো ঐতিহ্য বিমুক্ত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার, যত মূল্যবান বা সম্মানিত বলেই মনে হোক না কেন, আধুনিক জগতে তাদের এগিয়ে নিতে অসমর্থ, কমিউনিজম তাদের নিকট একটা চাবিকাঠিস্বরূপ। এশিয়া প্রশস্ত দৃষ্টিই নিয়েছে কেননা তার পক্ষে অন্য কিছু নেওয়া সম্ভব নয়... "একটা বিকশিত, সুস্থির এবং দায়িত্ববান পুঁজিপতি শ্রেণী না থাকলে এশিয়াতে—ভারতীয় শব্দটি ধার করে বলা যায়—রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র কোন গুরুতর সংঘর্ষের মুখোমুখী হবে না। ভারতে, চীনের মতই, জাতীয় পতাকাতলে একটা 'সমাজতান্ত্রিক ধরন' বিজয়ী হচ্ছে। অথবা, ইউরোপীয় দেশ ও জনগণ যারা নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে ইউরোপীয় আগ্রাসনের ফল বলে মনে করে তাদের নিকট ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর কমিউনিস্ট আতঙ্ক খুব বড় বলে প্রতিভাত হয় না।"

টাইমস্‌-এর বিষণ্ণ সম্পাদকীয়-রচয়িতা ভবিষ্যতের একমাত্র আশা দেখতে পেয়েছেন এশিয়াতে একটি 'বিকশিত, সুস্থির এবং দায়িত্ববান পুঁজিপতি শ্রেণীর

উদ্ভবের মধ্যে। সম্ভবত, কিন্তু আরো অনেক সম্ভাব্য জিনিস আছে' যা আগেই ঘটতে পারে—ইতিমধ্যেই ঘটছে—মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের বাসভূমি, সুপ্রাচীন ও মহিমান্বিত সভ্যতাসমূহের ধাত্রী, এবং এখন নতুন জীবনের স্পন্দনে ঐশ্বর্যময়ী এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

ভবিষ্যতের পথে

এই প্রবন্ধের গোড়ায় উদ্ধৃত লেনিনের বিখ্যাত শেষ ভবিষ্যদ্বাণীতে যখন তিনি ভবিষ্যৎ ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রের জয়ের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মানবজাতির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের আবাস রাশিয়া, ভারত, চীন ও অন্যান্য সমপ্রকৃতির দেশের নির্ধারক ভূমিকার কথা বলছেন, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পথপ্রদর্শন করে নিয়ে এল যে পূর্ববর্তী যুক্তি তার প্রতি প্রায়শই মনোযোগ দেওয়া হয় না। পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিলম্বের ফলে তখনকার দুর্বল সোভিয়েত ইউনিয়ন কি টিঁকে থাকার আশা করতে পারে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন তিনি। তিনি জবাব দিয়েছিলেন এমন একটা উত্তর দিয়ে যা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে সাম্রাজ্যবাদ-অধ্যুষিত পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশের কেন্দ্রসমূহের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে এক বিরাট দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করল :

"যেকালে পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি তাদের সমাজতন্ত্রের জন্য বিকাশের আয়োজন সুসম্পূর্ণ করছে···ততদিন কি আমরা টিঁকে থাকতে পারব? কিন্তু তারা আয়োজন করছে আমরা পূর্বে যেমনটি আশা করেছিলাম সেভাবে নয়। তারা এই আয়োজন সুসম্পূর্ণ করছে সমাজতন্ত্রকে ধীরে ধীরে 'লালনের' মাধ্যমে নয়, পরন্তু কতকগুলি দেশ দ্বারা অপর কতকগুলি দেশকে শোষণের দ্বারা, সমগ্র প্রাচ্যকে শোষণের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যে দেশগুলি প্রথম পরাজিত হবে তাদের শোষণের মাধ্যমে। অপরদিকে, সংক্ষেপে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফল হিসেবে, প্রাচ্য সুনিশ্চিত ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে,সুনিশ্চিতভাবে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের সাধারণ আবর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।"

এইটেই লেনিনের লেখা শেষ প্রবন্ধ। তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তিনি ভবিষ্যতের দিকে চেয়েছিলেন। আমরা সেই ভবিষ্যতে বাস করছি।

[সামান্য সংক্ষেপিত]

অনুবাদ : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রজনী পাম দত্ত ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন

—নির্মাল্য বাগচী

রজনী পাম দত্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র, প্রথম জীবনে "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি" (সংক্ষেপে আই. এল. পি)-র সদস্য, পরে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠিত হবার পর গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০)। ১৯২১ সাল থেকে "লেবার মান্থলি" পত্রিকার আজীবন সম্পাদক।

রজনী পাম দত্তের জন্মভূমি ইংলণ্ড হ'লেও তিনি তাঁর পিতৃভূমি ভারতকে তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম—এই দুই ক্ষেত্রে তিনি নানাভাবে সাহসের সঙ্গে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

শুধু রজনী পাম দত্ত নন, সমগ্র ব্রিটিশ পার্টি বিভিন্ন সময়ে কতভাবে যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সাহায্য করে এসেছেন এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে সাহায্য করেছেন, তা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মার্কস বলেছিলেন, "No nation can be free that oppresses other nations"—যে জাতি অন্য জাতিকে নিপীড়ন করে সে জাতি কোনদিন স্বাধীন হতে পারে না। সর্ববৃহৎ বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এই কথার তাৎপর্য খুব বেশী উপলব্ধি করেছিল এবং অনুভব করেছিল, ব্রিটেনের শ্রমিকদের মুক্তি কখনও হতে পারে না, যতদিন না সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে উপনিবেশগুলি স্বাধীন হতে পারে। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তির প্রশ্নে মার্কস বলেছিলেন, "for them (the English workers) the national emancipation of Ireland is no question of abstract justice or humanitarian sentiment, but the first condition of their own social emancipation". ঠিক সেই অর্থে, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের

সাফল্য ব্রিটেনে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করে তুলবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় সূচিত করবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্য ছাড়া ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও জয়যুক্ত হতে পারে না।

রজনী পাম দত্ত ও হ্যারি পলিটের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের উল্লেখ না করলে কমরেড দত্তের চরিত্রের একটি দিক অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরল সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেও, বিশ্বের একজন সেরা বুদ্ধিজীবী হিসাবে স্বীকৃত হয়েও, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের নিরাপদ জীবনকে তুচ্ছ করে, শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিতে ভরা জীবনকে বরণ করার মধ্যে যে দুর্জয় সাহস ও মননশক্তি ও প্রত্যয়ের পরিচয় দেন, তা গর্ব করার মত। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবী বন্ধু ও সহযোদ্ধা হিসাবে যাকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন—সেই হ্যারি পলিট, একেবারে লাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকের ঘরের সন্তান ছিলেন, বয়লার শ্রমিক হিসাবে জীবন সুরু করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগও যার জীবনে ঘটে নি। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় এই দুই ব্যক্তিকে এক মঞ্চে টেনে আনল, হ্যারি পলিট হলেন বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টির আর একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি সাতাশ বছর ধরে পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। লেনিনের "বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ রোগ" বইখানি পলিটের উপর গভীর প্রভাব রাখে। ফাঁকা, বাক্যসর্বস্ব বুদ্ধিজীবীদের ধিক্কার দিয়ে রজনী পাম দত্ত সারাজীবনের বন্ধু হ্যারি পলিটের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "Pollit had the deeply humane, broad and widely read culture of the finest representatives of the class conscious skilled workers of Britain, which so often puts to shame the hollow smattering and abysmal ignorance of many so-called 'educated' people." (Matkovsky—A true son of the British working class (পৃ: ১৪).

রজনী পাম দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্লিমেন্স দত্ত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রথম থেকে সাহায্য করে এসেছেন। ১৯২৪ সালে কমিনটার্নের নেতৃত্বে প্যারিসে যে ঔপনিবেশিক দেশগুলির সংঘ (Colonial Bureau) গঠিত হয়, সেখানে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দেন ও পরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে যখন League against Imperialism ব্রাসেলসে গঠিত হয়, তিনি তার একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯২৪ থেকে

১৯০৭ সাল স্বাস্থ্যের কারণে আর. পি. ডি. বিলাত থেকে ব্রাসেলসে অবস্থান করেন। র‍্যালফ্ ফক্স ১৯২৫ সালে মস্কোতে কমিনটার্নের ঔপনিবেশিক বিভাগে যোগ দেন। ফিলিপ স্প্রাট, লেস্টার হাচিনসন, ব্ল্যাডিং, এলিসন, ব্র্যাডলি ও সাপুরজী সাকলাতওয়ালা কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠনের জন্য ভারতে বিভিন্ন সময়ে আসেন। বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তিনজন ইংরেজ কমিউনিস্ট অভিযুক্ত হন—ফিলিপ স্প্রাট ; বেন ব্র্যাডলি ; এচ. এল. হাচিনসন। বিলাতে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সমর্থনে সভা, সমিতি, প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষ থেকে যেসব শিক্ষিত যুবকেরা বিলাতে পড়াশুনা করতে যেতেন, কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, আজ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির বহু নেতা সেখানে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত হন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা—জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি—যখনি বিলাতে গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ, সভাসমিতি ডাকার ব্যবস্থা, প্রচার, ব্রিটেনের কমিউনিস্ট নেতারা অকাতরে করেছেন।* ভি. এন প্রিট কায়ুর মামলার ফাঁসী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য এদেশে এসেছেন। ১৯২৯ সালের ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে যে প্রচারপত্র কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করেন, তাতে ভারত সমেত অন্যান্য উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়। সেই নির্বাচনে, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের বিরুদ্ধে হ্যারি পলিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ; স্যার জন সাইমনের বিরুদ্ধে সিকন্দর সুরওসমানি (স্যানিকট ওসমানি) কমিউনিস্ট প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া, এল. এস. আমেরীর বিরুদ্ধে রজনী পাম দত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আন্তর্জাতিক সৌহার্দের নিদর্শনে ভরা দুই পার্টির মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস এইভাবে গড়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামের ক্যাটালগে দেখা যায়, রজনী পাম দত্তের লেখা "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" বইখানি ১৯২৬ সালে প্রথম বোম্বাইয়ে প্রকাশিত হয়, পরের বছর ১৯২৭ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এই বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। কিছু কিছু উদ্ধৃতি নানা বইয়ে পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইণ্ডিয়া

* রজনী পাম দত্ত ভি. কে. কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ও লণ্ডনস্থিত "ইণ্ডিয়া লীগে"র কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

টু-ডে" প্রকাশিত হয়, এবং কিভাবে টুকরো টুকরো অংশ ছাপা হয়ে গোপনে প্রচার হয়, সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। ১৯৬৪ সালের আগে এ বই প্রকাশ্যে বের করা সম্ভব হয় নি।

যে বছর ক্রিপস মিশন এদেশে আসেন, সেই প্রথম পাম দত্ত 'ডেইলী ওয়ার্কারের' প্রতিনিধি হিসাবে এদেশে আসেন। তাঁর সম্পাদিত 'লেবার মান্থলি' ডাক বিভাগের নিষেধের তাড়নায় দুষ্প্রাপ্য ছিল,—১৯৪৬ সালেই প্রথম আইনসঙ্গতভাবে পাওয়া সুরু হল। "লেবার মান্থলি"র "নোটস অফ দি মান্থ" আমাদের চিন্তায় এনে দিয়েছে বলিষ্ঠতা ও সুস্থিরতা। আরও কয়েকখানা চিন্তাশীল বই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন এবং আমাদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন—'ওয়ার্ল্ড' পলিটিকস'; "ফ্যাসিজম ও সোশ্যাল রিভলিউশন"; "ইণ্ডিয়া টু-ডে এণ্ড টু-মরো"; "ক্রাইসিস অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার"; "ছইদার চায়না"; প্রভৃতি। তিন দশকের ভারতীয় মার্কসবাদীরা বিশেষ করে ঋণী তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ পুস্তক "ইণ্ডিয়া টু-ডে"র কাছে। আজকের মূল্যায়নে অস্বীকার করব না, কোন কোন জায়গায় তাঁর কোন বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে, অযথা জোর হয়ত কোথাও বেশী পড়েছে,—এসব ত্রুটি সত্ত্বেও বইয়ের ইতিবাচক বক্তব্য আজও সঠিক এবং সেজন্য classic বা চিরায়তের স্থান পেয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষের কোনও গবেষক এই বইকে বাদ দিয়ে কোনও গবেষণার কাজে হাত দিতে পারেন না।

লেনিন তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে ঔপনিবেশিক থিসিস রচনা করেন, সেই নির্দেশনামা, তার রণনীতি ও কৌশল আর পি. ডি অনুসরণ করে এসেছেন। জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট, কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন করা, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই দুই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, "Unity and struggle" এই দুই কৌশলের প্রয়োগ, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঠিক শক্তি ও অবস্থা নির্ণয়, ও সেই অনুপাতে কৌশল স্থির করা—এই সব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী আর. পি. ডি সর্বদাই প্রয়োগ করেছেন। অবস্থা ও কৌশল বিচারে লেনিন ও এম. এন. রায়ের মধ্যে যে মতপার্থক্য ঘটে আর. পি. ডি ও রায়ের মধ্যে সে পার্থক্য খোলাখুলি কোনও 'পলেমিকস'-এর আকার ধারণ না করলেও আর. পি. ডি-র বিভিন্ন লেখায় তা সুস্পষ্ট।

ঐতিহাসিক বিচারে গান্ধীজীর ইতিবাচক অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে আর. পি. ডি যে বিশ্লেষণ কয়েক দশক আগে সেভাবে করেছিলেন, তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে ; অবশ্য মাঝে মাঝে গান্ধীজী সম্পর্কে কিছু কঠোর বক্তব্য আছে, তাঁর কঠোরতা থাকলেও, গান্ধীজী কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ, গান্ধীজীর অসংখ্য পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে, আর. পি. ডি পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন।

জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর দুইটি বড় অবদানের কথা তিনি দ্বিধাহীন-ভাবে তুলে ধরেছেন—এক, কংগ্রেসের আন্দোলনকে গণরূপ দান ; দুই, জনগণকে সক্রিয় আন্দোলনের মধ্যে পরিচালিত করা।

"The new programme and policy inaugurated by Gandhi marked a giant's advance for the National Congress. The Congress now stood out as a political party leading the masses in struggle against the government for the realisation of national freedom. From this point the National Congress won its position···as the central focus of the national movement" (India To-day, মনীষা, পৃ: ৩৪১)

১৯৬৯ সালের ২রা নভেম্বর 'মনীষা' সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন—"First on the role of Gandhi. The estimation of the parallel positive and negative features of his role given in this book stands up on the whole to the test of subsequent historical research and discussion. The emphasis on his positive role in raising the whole level of the national movementandthe Congress from its previous relatively narrower range to an all national mass movement···was important enough at a time when some left-wing critics tended to treat him in a one-sided dogmatic fashion as simply an enemy of the popular movement or even sometimes as a British agent" (পৃ: iii ও iv) দোটা ভূমিকা উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভবপর নয়, পাঠককে পড়ে নেবার জন্য অনুরোধ করব। নাম উল্লেখ না করলেও, বুঝতে অসুবিধা হয় না—এই "left-wing critic" বলতে তিনি এম. এন. রায়কেই লক্ষ্য করেছেন।

যেখানে এম. এন. রায় জাতীয় কংগ্রেসকে বাতিল করে দিয়ে অবিলম্বে সম্পূর্ণ নূতন গণসংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন,

সেখানে আর. পি. ডি. তাঁর "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে দুইটি মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন—

"The fight for national liberation is a fight of many social strata—of workers, of peasants, of the lower middle class, of the intelligentsia, and even of a section of the bourgeoisie" (লণ্ডন সংস্করণ, পৃঃ ১২৯)

দ্বিতীয়, "Within both the Congress and the Swaraj Party, the Left Nationalist elements should gather themselves round a popular national program" (ঐ, পৃঃ ১১৮)

রায় ও আর. পি. ডি র দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্বেও ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী, ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক আন্দোলন সম্পর্কে যে থিসিস গৃহীত হয়, সেই প্রসঙ্গে আর. পি. ডি. সম্পর্কে যে বক্তব্য বলেছেন, তাকে সঠিক বলে মনে করতে পারছি না। ডঃ অধিকারীর Documents of the History of the Communist Party of India—প্রথম খণ্ডের ৩৬২ পৃঃ, বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৯৭ পৃঃ প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সময় এম. এন. রায়—"ডি-কলোনাইসেসন" নামে একটি তত্ব প্রচার করেন—এই তত্বের সংক্ষেপে অর্থ হল, সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশে শিল্প বিকাশের অবাধ সুযোগ দিয়েছে, দেশী বুর্জোয়াশ্রেণী শিল্প-ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা রফায় এসে যাচ্ছে বা এসে গেছে, উপনিবেশগুলি আর পূর্বেকার উপনিবেশ নয়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ এখন মূল শত্রু আর সাম্রাজ্যবাদ তেমন নয়, মূল প্রধান শত্রু হল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী।

ডঃ অধিকারী লিখেছেন, "This is in germ form the theory of "decolonisation" which M. N. Roy as well as some other international Marxists including R. P. Dutt were putting forward in varied forms and which was finally criticised and rejected in the Colonial thesis of the Sixth World Congress of the C. I. (1928)." (২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৭)

মুস্কিল হচ্ছে ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে যে বিতর্ক হয়, সেই সব দলিলের কোন উল্লেখ বা উদ্ধৃতি ডাঃ অধিকারী দেন নি। আমরা সেই জন্য খুব সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাই। কলকাতায় বসে ইম্প্রেকরের রেকর্ড পাওয়া সম্ভব নয়, আমাদের বাধ্য হয়ে secondary source-এর উপর নির্ভর করতে হয়।

একথা ঠিক ষষ্ঠ কংগ্রেসে ব্রিটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলী, ভারতে যুদ্ধোত্তরকালে শিল্প বিকাশের মাত্রা নিয়ে, বিতর্ক তোলেন এবং ভোটে পরাজিত হন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশের ধারায় সাম্রাজ্যবাদী যুগে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মার্কিন ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেই সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উপনিবেশে 'মূলধনের রপ্তানি' ঘটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ কখনও প্রকৃত শিল্প বিকাশ ঘটতে দেয় নি অর্থাৎ যন্ত্র উৎপাদনকারী যন্ত্র শিল্প গড়তে দেয় নি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে শিল্প বিকাশ, বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব, সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের সংগঠন, ধর্মঘট—এইসব ঘটনাগুলিকে অস্বীকার করলে আর এক বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। জাতীয় বুর্জোয়াদের আমরা আফ্রিকার দেশগুলির মত পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে, জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে মৌল দ্বন্দ্ব তাকে আমরা খাটো করে ফেলতে পারি। এই সরলীকরণের বিরুদ্ধে সেদিন ব্রিটিশ ডেলিগেশন অনমনীয় বিরোধিতা করেছিলেন।*

ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল সেদিন ঘোষণা করেন—"Our line is that, in the era of monopolist finance-capitalism, industrialisation of the colonies, inevitably takes place, despite retarding factors in imperialist policy, which mercilessly cripple the productive forces of the colony, but nevertheless do not prevent the main trend" (Imprecor—পৃঃ ১৬৭৬ ; ম্যাকফারলন—"The British Communist Party, পৃঃ ২০৮এ উদ্ধৃত)

১৯২৮ সালের লেবার মান্থলি জুন সংখ্যায় আর. পি. ডি স্পষ্ট করে লেখেন—"The whole character of the British policy of industrialisation in India is to secure industrialisation under British Control"..."Thus the role of the bourgeoisie in the national struggle is not yet exhausted and may even extend

* Leninism and the World Revolutionary Working Class Movement (Moscow) p 252 পাদটীকা :—

"...Comrade Stalin correctly pointed out that the Indian bourgeoisie wanted a compromise with British imperialism. That is absolutely correct. But this gives no grounds for the very hasty generalisation that as a class the bourgeoisie must be struck out of the national liberation movement"—D Manilsky, July 1928.

under certain conditions" অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি হল, ভারতে শিল্পায়ন সম্পূর্ণ নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে সুরক্ষিত করা, কাজেই জাতীয় সংগ্রামে বুর্জোয়াদের ভূমিকা এখনও নিঃশেষিত হয় নি এবং কোন কোন অবস্থায় তা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রাম' সম্পর্কে থিসিসের মুখবন্ধে জে. আর. ক্যাম্বেল লেখেন, বৃটিশ প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ "defeated a tendency to proceed to the opposite extreme and underrate the extent of industrial development, which is taking place, inspite of imperialism, in some colonial countries". (ম্যাকফারলেন, পৃঃ ২০৮)

'ডি কলোনাইজেসন' তত্ত্ব পরাজিত হলেও ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এমন বাম সংকীর্ণতাবাদী ব্যাখ্যা দেন, যা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন করে—কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে আর. পি. ডি The Internationale গ্রন্থে বলেছেন, "...some trends to sectarianism appeared in some of the formulations of the Sixth Congress in 1928...in some narrowness in the otherwise valuable treatment of the colonial question, the results of which caused some setback in the movement" in India. (পৃঃ ২০১)

অর্থাৎ "সংকীর্ণতা অভিমুখী কিছু কিছু প্রবণতার প্রাথমিক লক্ষণসমূহের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯২৮ সনে গৃহীত ষষ্ঠ কংগ্রেসের কোন কোন সূত্রায়ণে,... ঔপনিবেশিক প্রশ্নের অন্যভাবে মূল্যবান আলোচনার মধ্যে কিছু কিছু সংকীর্ণতার ফলে ভারতবর্ষের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।" অটো কুসিনেনও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। (তৃতীয় দুনিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা, মস্কো,—পৃঃ ১০০)

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এহেন সংকটময় মুহূর্তে মে, ১৯৩২ সনে পার্টির ঐক্যকে গড়ে তুলতে তিন পার্টির—চীন, জার্মানী ও ব্রিটিশ—খোলা চিঠি এসে উপস্থিত হয়। সাধারণভাবে এক দেশের পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য দেশের পার্টি হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দো-

লনের স্বার্থে এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটেছে। ফ্যাসিজমের উদ্ভব, যুদ্ধের আশংকা, গণতন্ত্রের বিপদ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে নতুন চেতনা, বাধ্য করল এই তিন পার্টিকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কিছু নির্দেশ পাঠাতে। (এই চিঠি 'মূল্যায়ন', প্রথম বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে।) সংশ্লিষ্ট দলিলটিতে সেই সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতার সমালোচনা করা হলেও তার মধ্যে সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির প্রভাব ছিল। তবু এই দলিলটির গুরুত্ব অসামান্য। এ দলিল রচনার পিছনে সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায় আর. পি. ডি-র হাত ছিল। এরই ফলে ১৯৩৩ সালে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং ১৯৩৫ সনে রেড্ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভেঙ্গে দিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দেয়।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস (১৯৩৫) নানা কারণে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কংগ্রেসে ডিমিট্রভ যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং বলা হয় সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনকে সমর্থন, প্রসার ও অংশগ্রহণ অবশ্য করণীয়, এমনকি জাতীয় সংশোধনবাদী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হলেও। ওয়াং মিং তাঁর রিপোর্টে ভারতবর্ষের কমরেডদের বাম সংকীর্ণতাবাদী ভুলভ্রান্তির, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতার, তাঁদের বহুধা বিভক্তি প্রভৃতি অনেক ভুলভ্রান্তির কথা বলেন। ওয়াং মিং বলেন, "Both within and without the National Congress the Indian Communists must consolidate all the genuine anti-imperialist forces of the country, broadening and leading the struggle of the masses against the imperialist oppressors." এবং ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলবার উপযোগী একটি কর্মসূচী রাখেন। (Guidelines of the History of the Communist Party of India, পৃঃ ৯৪-৯৫)

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন—যেখানে পণ্ডিত নেহরু সভাপতি হন—তার প্রাক্ মুহূর্তে ২৯শে ফেব্রুয়ারী রজনীপাম দত্ত ও বেন ব্র্যাডলি ভারতীয় কমিউনিস্টদের নিকট একটি থিসিস পাঠান। এখানে উল্লেখ

করা প্রয়োজন ৭ম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির বিকল্প সভ্য হিসাবে আর. পি. ডি নির্বাচিত হন। 'দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিস' নামে বিখ্যাত এই দলিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে এক নতুন জীবন দান করল। (মূল্যায়ন, ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় এই দলিলের পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়)।

ভারতে কি পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট "Anti-imperialist People's Front" গড়ে তোলা যাবে—এই প্রশ্নে দত্ত-ব্র্যাডলি বলেন :

"The National Congress can play a great and a foremost part in the work of realizing the Anti-Imperialist People's Front. It is even possible that the National Congress, by the further transformation of its organization and Programme, may become the form of realization of the Anti-Imperialist People's Front, for it is the reality that matters, not the name". (Guidelines, পৃ: ৪৬-৪৯)

এইটিই মূল সূত্র, কিন্তু এই সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গণসংগঠনগুলির collective affiliation, জনগণের দাবী ও তার ভিত্তিতে সংগ্রাম, গণপরিষদ আহ্বান, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ, প্রভৃতির কথাও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, যা না হলে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে পারবে না।

পার্টির ইতিহাসে বলা হয়েছে :

"The document greatly helped the CPI to make a correct turn and reforge links with the national movement."

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নেহরুর ভাষণে দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিসের অনেক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী স্থান পায়।*

* During his stay in Europe in the spring of 1936, Nehru met Palme Dutt in Lausanne and discussed with him at length the questions raised. To what extent these discussions have been fruitful, but also how vivid the knowledge acquired earlier had remained was convincingly demonstrated by his presidential address at the annual conference of the Indian National Congress in Lucknow. Here Nehru said : "The essence of a joint popular front must be uncompromising opposition to imperialism, and the strength of it must

এখানে উল্লেখ করা যায়, ১২৩৬ সনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুশয্যা পাশে সুইজারল্যাণ্ডে যখন উপস্থিত হন, তখন রজনী পাম দত্তও সেখানে ছিলেন ও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। (পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ; রজনী পাম দত্ত—দিলীপ বসু)

এই সময় রজনী পাম দত্তের তিনখানি বিখ্যাত বই—World Politics, Fascism and Social Revolution এবং India To-day প্রকাশিত হয়। এই বইগুলি একটি যুগের দিগদর্শন যন্ত্রের মত কাজ করেছে।

১৯৩৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। আর. পি. ডি যুদ্ধের নতুন চরিত্র ও কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পর্কে যে চিঠি পাঠান :

"The general line is clear ; maximum mass mobilisation against fascism full co-operation in practical action with all who oppose fascism, irrespective of political differences ; no action of the present rulers so long as they stand by the alliance to resist fascism, should deflect us from this line, which is in the interests, not merely of the world-front of the peoples, but of the Indian people whose future cannot be separated from the world front of the peoples."

(The Peoples War—2nd August, 1942)

১৯৪৬ সনের মার্চের শেষে ক্রিপস মিশনের আগমন উপলক্ষে "ডেইলী ওয়ার্কার"-এর প্রতিনিধি হিসাবে আর. পি. ডি ভারতে আসেন এবং "লেবার মান্থলী"র জন্য 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' কয়েক কিস্তিতে লিখে পাঠান। তার মধ্যে রয়েছে, কিভাবে তিনি দীর্ঘপথ মোটরে অতিক্রম করে কাশ্মীরে পৌঁছান ও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যে এক হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের লেবার মান্থলিতে আর. পি. ডি একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন—যা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি মার্কসবাদবিরোধী ভুল সংশোধন করতে সাহায্য করে—প্রবন্ধটির নাম—"ভারত ও পাকিস্তান"।

---

inevitably come from the active participation of the peasantry and workers".

—Horst Krueger : Jawaharlal Nehru and the League against Imperialism (mimeo)

কিছুদিন যাবৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান দাবির মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু (core) আবিষ্কার করে এবং ধর্মকে জাতি গঠনের উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে।* আর. পি. ডি এই তত্ত্বের ভুলগুলি দেখিয়ে দেন, কিন্তু সে ভুল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃত্ব যে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি, তার প্রমাণ—Party letter—New Series—12th May, 1946, No. 4-এ প্রকাশিত দীর্ঘ ১২ পাতা ব্যাপী যুক্তির কূট জাল।

আর. পি. ডি যে বক্তব্যগুলি বলেন, তা সংক্ষেপে এই—It is doubtful if it is correct to speak of "Moslem nationalities" any more than it would be to speak of Spain, Italy, France and Austria as "Catholic nationalities". The measure of religion is not identical with the measure of nationality." "The identification is dangerous and plays into the hands of Pan-Islamism." (পৃঃ ৮৯)

এখানেই শেষ নয় তদানীন্তন নেতৃত্ব এই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৭টি গণ-পরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব দেন এবং বিচ্ছিন্ন হবার (right to secede) অধিকার স্বীকার করেন।

কমরেড এস. এ. ডাঙ্গে আর-পি-ডি'র স্মৃতিচারণে বলছেন, "Just at that time I received a cable from our leadership in India that I should ask the leadership of the British Party to demand in their resolution on India, which had not yet been partitioned, sixteen constituent assemblies, that is about one each for the different and defined nationalities in India. I showed the telegram to RPD. He turned down the suggestion with the remarks that it would tear India not in two and not sixteen but innumerable dots of states which would be the end of India as such."

(New Age, December 29, 1974)

কমরেড ডাঙ্গে তখন বিলাতে পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত। ভারতবর্ষ তখনও

---

* "The democratic core within the Pakistan demand, the core which the moslem masses really demand, is the right of Moslem nationalities to self—determination." (Adhikari)

বিভক্ত হয় নি। ভারতের পার্টি টেলিগ্রাম পাঠায়, যেন ব্রিটিশ পার্টি ষোলটি স্বশাসিত গঠনের দাবি সমর্থন করে। আর. পি. ডি সেই টেলিগ্রাম দেখে কঠোর মন্তব্য করেন, তিনি বলেন এতে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাবে, ভারত বলে আর কিছু থাকবে না।

"ইণ্ডিয়া টু-ডে" (মনীষা)-র ভূমিকায় আর-পি ডি লিখছেন—The general principles of the analysis there set out stand.....condemnation of any attempt to base nationality on religion as reactionary, divisive and likely to bring harmful and destructive consequences. (p. 5)*

স্বাধীনোত্তর যুগে—স্বাধীনতা মেকি না সত্যি, ভারত স্বাধীন, না অর্ধ-উপনিবেশ, না এখনও উপনিবেশ,—এসব প্রশ্নের সদুত্তর পেতে পার্টিতে অনেক দিন মত বিনিময় চলেছে। আর. পি. ডি-ও যে একবারেই সঠিক বিশ্লেষণে পৌঁছতে পেরেছেন, তা নয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কানভের "দুই শিবিরের" যে তত্ত্ব চালু ছিল, তাও প্রকৃত মূল্যায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

তা সত্ত্বেও আর. পি. ডি আমাদের পক্ষে তিনটি প্রশ্ন সঠিকভাবে তুলে ধরেছিলেন—(১) বিপ্লবের স্তর; (২) বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই ও তাকে রক্ষা করার গুরুত্ব; (৩) জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভাজন, বিশেষ বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সৃষ্টি, বৃহৎ বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধ।

কলকাতায় ১৯৪৮ সনে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদিভের নেতৃত্বে যে বামপন্থী হঠকারী ও সংকীর্ণতার নীতি চালু হয় এবং পার্টির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়, তা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন না করে পারে না। ১৯৫৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী কমিনফর্ম জার্নালে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তা খুব সম্ভবত আর. পি. ডি-র লেখা। এই লেখা সমস্ত পার্টিতে

* পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিগত দিনের বিশ্লেষণ সঠিক ছিল, ইহা এখনও কোন কোন তাত্ত্বিক নেতা মনে করেন। যেমন—"The only really scientific attempt, despite some important flaws". (Marxist Miscellany No.—4. Page—119)

আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পার্টিকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচায়। প্রবন্ধটি এত পরিচিত যে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন :

"The working class must unite with all classes, parties, groups, and organisations willing to fight the imperialists and their hirelings and to form a broad, nationwide front headed by the working class and its vanguard the Communist Party ..."

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে কিছু দুর্বলতা ছিল। পরবর্তীকালে দুইজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে বিলাতে আলোচনা প্রসঙ্গে আর পি ডি বলেন—চীন ও ভারতের মধ্যে যান্ত্রিক তুলনা টানা ঠিক হবে না, চীনের শিক্ষা মনে রেখে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা বিচার করে সঠিক পন্থা স্থির করতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি বলেন, যে ইহা উন্নত স্তরের সংগ্রাম এবং গণচরিত্র ছাড়া সশস্ত্র কার্যকলাপ ব্যক্তিগত বা ছোট ছোট উপদলীয় সন্ত্রাসে পর্যবসিত হয়।

"The directive in the Cominform journal concerning armed struggle need not be taken too seriously."

আর. পি. ডি এই সময় জানান, ভারতবর্ষে যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তাতে যেন ভারতীয় কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করেন। কারণ, হঠকারিতার যুগে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল—সংবিধানকে ভাঙ্গবার জন্য।

নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি যে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে, এ সম্পর্কে আর. পি. ডি প্রথম ইঙ্গিত করেন, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় নেহরু যখন শান্তির প্রস্তাব করেন ও স্টালিন এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান—১৯৫০ সালের লেবার মান্থলির জুন সংখ্যায় "নোটস অফ দি মান্থ"-এ আর পি ডি এই মর্মে লেখেন। শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ভারতে যে বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব রয়েছে, তার তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৫৪ সালের ৮ই অক্টোবর কমিনফর্ম পত্রিকায় "For a Lasting Peace, for People's Democracy" পত্রিকায় আর. পি. ডি-র একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—New Features in National Liberation Struggle of Colonial and dependent peoples—ঔপনিবেশিক ও পরাধীন জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি।

এই প্রবন্ধে বলা হয়, যুদ্ধোত্তর যুগে চীনেরজনগণের বিজয়ের পর থেকে ঔপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এইসব পুরনো উপনিবেশগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য আক্রমণ তীব্রভাবে চালাচ্ছে ; এই আক্রমণ শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নয় ; কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, এমনকি খোদ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রসারিত করেছে।

এই পরিস্থিতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেখা দেয়—প্রথম, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও চালাতে হবে।

আর. পি. ডি স্পষ্ট করে বলেছেন :

"Failure to recognise this new stage of the struggle can lead to the destruction and defeat of the aims of the national liberation movement, if its leadership falls into the trap of regarding American imperialists as the rivals and enemy of the British imperialists—their own enemy and oppressors." মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের একটি অংশকে দলে টানবার বা ক্রয় করার অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে।

"This explains why the battle for national independence in the countries of the British Empire is a combined battle against the immediate domination and oppression of the British imperialists and against the penetration of the American imperialists."

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম এখন ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও প্রত্যক্ষ পরাধীন দেশগুলির সাধারণ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে (has become a common fight).

তৃতীয়তঃ, "The fight for peace against the war drive of the imperialist camp led by American imperialism is closely linked with the fight for national independence" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের যুদ্ধ চালাবার বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রাম, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। "Hence there can be no separation of the fight for independence from the fight for peace".

অতএব, চীনের বিপ্লব ও চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের সাফল্য থেকে এই

শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—"to build the united national front of the working class, the peasantry, the intellectuals and urban petty bourgeoisie and the national bourgeoisie". কি উদ্দেশ্য—"for the victory of the democratic anti-imperialist revolution".

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপদ, শান্তি আন্দোলনের গুরুত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র, ব্যাপকতম যুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের দায়িত্ব, এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা —এই বৈশিষ্ট্যগুলি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির কাছে আর. পি. ডি তুলে ধরেন। এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের নতুন বিশ্লেষণগুলির পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু কি হল? আমাদের তৎকালীন পার্টি নেতৃত্ব ডিমত পোষণ করলেন। তাঁরা লিখছেন :—

"And when RPD once wrote in the journal : **For a lasting peace, For a People's democracy** : an article on the new perspectives for the third world countries and their newly won independence, though under the "indirect" shadows of imperialism, our party made it a question to argue.

"In fact, as was found later, RPD had actually foreshadowed in a big way the onrush of the incoming free and independent states from out of old colonial world".

(New Age—২৯শে ডিসেম্বর,'৭৪)

পার্টির ইতিহাস লেখা চলছে—সেদিনকার মতান্তরের কাহিনী নিশ্চয়ই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

আমরা অহরহ একটি কথা বলি—নয়া-উপনিবেশবাদ বা neo-colonialism; কিন্তু আমরা কয়জন জানি রাজনৈতিক শব্দকোষে এই কথাটি আর. পি. ডি-র সংযোজন। বিলাতের সাপ্তাহিক "New Statesman" পত্রিকায় (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪) এক চিঠিতে আর. পাম. দত্ত লেখেন—

"Where and when did the term 'Neo-colonialism' first came into use? In the second edition of my book **Crisis of Britain and the British Empire**, written in 1956 and published at the beginning of 1957, I find that I suggested that a new term was necessary to describe these new tactics of imperialism

and very tentatively offered as a possible new term in quotation marks "The New Colonialism". In the course of translation into various languages this became **le neo-colonialisme** or **Das Neokolonialismus.** It would thus appear that at the date when this was writien, in 1956, the term was not yet a familiar one, and that I was offering it somewhat diffidently as a possible new coinage."

রজনী পাম দত্ত ছিলেন একজন লেনিনিস্ট বা প্রকৃত লেনিনবাদী—এর থেকে বড় আখ্যা তাঁকে বোধহয় আর কিছু দিতে পারি না। তত্ত্ব ও প্রয়োগের এমন সমন্বয় তাঁর জীবনে যা ঘটেছে, তা আমাদের অনুকরণীয়। তিনি শুধু চিন্তাশীল লেখক হয়েই পরিচিত হবেন না; তিনি বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যোদ্ধা ও পথিকৃৎ হিসাবে পরিচিত থাকবেন। আমরা যারা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁর কাছে আমাদের ঋণ সীমাহীন। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বামপন্থী বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি একাধিকবার সাহায্য করেছেন। আমরা শুধু মামুলি ঋণ স্বীকার করি না, সেই শিক্ষার আলোকে ইতিহাসের অগ্রগতির সঠিক পন্থার সন্ধান করি ও সেই শিক্ষাকে আমরা কাজে লাগাই।

রজনী পাম দত্তের সঙ্গে পত্রালাপ

প্রয়াত কমরেড রজনী পাম দত্তের ৭৫ বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'মূল্যায়ন' তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। মূল্যায়নের এই অভিনন্দন ও কমরেড দত্তের জবাবী পত্র এখানে প্রকাশ করা হল —সম্পাদক

প্রিয় কমরেড রজনী পাম দত্ত,

আপনার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে, আমাদের পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে, বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ঘটনার স্মারক হিসেবে, পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় আপনার নিবন্ধ 'লেনিন শতবর্ষের শিক্ষা' লেসন্‌স্ অব্ লেনিন সেন্টিনারী,—(পীস, ফ্রীডম অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম, ১৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা), বাংলায় ভাষান্তরিত করে, প্রকাশ করছি।

কমরেড, আমাদের, বিশেষ করে যাঁরা শোষণের ভগ্নস্তূপ থেকে সদ্য আত্ম-প্রকাশ করছে, সেই তৃতীয় বিশ্বের নিকট আপনি পরম সুহৃদ। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শুরু থেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল আদর্শের বিভিন্ন দিকে আপনার গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে এবং পথ দেখিয়েছে। আপনার অবদান অবিস্মরণীয়।

আপনার রচনার প্রতি আমাদের উৎসাহ পূর্বাপর গভীর এবং আমাদের পত্রিকায় আপনার ইদানীংকার পাঁচটি নিবন্ধের (লেবার মান্থলী ও পীস, ফ্রীডম অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম-এ প্রকাশিত) বঙ্গানুবাদ আমরা প্রকাশ করেছি। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে গভীর আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ২৮শে আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত আমাদের পত্রিকার ষষ্ঠ বার্ষিকী সভা আপনার পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে আপনাকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

এই সুযোগে, লেবার মান্থলীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। লেবার মান্থলী

রজনী পাম দত্তের সঙ্গে পত্রালাপ

আপনার অনুসন্ধিৎসা, যা সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের নিকট পরম সম্পদ, তার সুগভীর সাক্ষ্যবাহী। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে লেবার মান্থলীর ভূমিকা বাড়িয়ে বলা যায় না।

কমরেড, আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করার মত সুখকর আমাদের নিকট আর কি হতে পারে।

পুনরায় বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
আপনার একান্ত
মূল্যায়নের পক্ষে
স্বাঃ নরহরি কবিরাজ
সম্পাদক

লেবার মান্থলী
লণ্ডন
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় কমরেড নরহরি কবিরাজ,

আমাদের পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর ও আমার পঁচাত্তর বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে মূল্যায়ন-এর সম্পাদকমণ্ডলীর উষ্ণ ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানিয়ে আপনি যে চিঠি লিখেছেন তাতে আমি গভীর অভিভূত হয়েছি। এটা আরও বেশী আবেগের এই জন্যে যে আমি জানি কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আপনাদের সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে। আমার লেখায় আপনারা যদি ব্যবহার-যোগ্য কিছু পেয়ে থাকেন এবং তার বাংলায় ভাষান্তর ও প্রকাশ করে থাকেন তাতে আমি গভীর আনন্দিত। আমাদের সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে মূল্যায়ন-এর শক্তি ও সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই।

ঐকান্তিক কমরেডসুলভ অভিনন্দনসহ
স্বাঃ আর পাম দত্ত
সম্পাদক

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতার ভাষণ

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর বিকল্প সদস্য ও উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এস. আর. রশিদভ ১৯৭০ সালের ২৮ জানুয়ারি বিজয়ওয়াদাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার পূর্ণপাঠ নীচে দেওয়া হল।

প্রিয় কমরেড ও বন্ধুগণ,

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী এবং এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সোভিয়েত কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ও সমস্ত ভারতীয় কমিউনিস্টদের সৌভ্রাত্রপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সৌভ্রাত্রপূর্ণ সংযোগ রয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্টরা তার উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন। আপনাদের কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ করার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তাকে আমরা বিরাট সম্মান বলে গণ্য করি, গণ্য করি সহযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ এবং দুই পার্টির মধ্যেকার বিবর্ধমান মৈত্রী ও সংহতির প্রকাশ হিসাবে।

ভারতের কমিনিস্ট পার্টি'র নবম কংগ্রেসের পর তিন বছরে আপনাদের পার্টি'র কাজকর্মকে পর্যালোচনা করে এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের জন্য সংগ্রামে করণীয় কাজগুলি ছকে দিয়ে ভারতের

প্রতিনিধিদলের নেতার ভাষণ

কমিউনিস্ট পার্টি'র জাতীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেশ্বর রাও জাতীয় পরিষদের যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তা আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি।

কংগ্রেসের দলিলপত্রে ও প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিকামী পররাষ্ট্র নীতির এবং কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মে সোভিয়েত জনগণের কৃতিসমূহের যে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে তার জন্য আমরা কংগ্রেসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তার অর্থনৈতিক বিকাশের নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত বছরে প্রবেশ করেছে এবং দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিবিড়ভাবে তার অর্থনৈতিক শক্তিকে গড়ে চলেছে। হালকা ও খাদ্য শিল্পের বিভিন্ন ধরনের বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সমেত শত শত প্রধান শিল্প কারখানা, বিরাটাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশন, অনন্য ব্লাস্ট ফার্নেস, রোলিং মিল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেশে চালু হয়েছে। শ্রম উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদন ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ আরো অগ্রসর হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ফলে দেখা দিয়েছে অনেকগুলি একেবারে নতুন ধরনের শিল্প। সামাজিক উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গোটাটাই আরো বেশী দক্ষ উঠেছে।

কৃষিতে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আস্থা সহকারে এটাকে সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার একটা উচ্চ বিকাশপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে।

খামারজাত উৎপন্নের ব্যাপারে দেশের সমস্ত চাহিদার পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য এবং এমন কি প্রতিকূল আবহাওয়ার অবস্থাতেও খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহার্য ফসলের ফলন আর গবাদি পশুজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েত কৃষক-সমাজ ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে কাজ করছেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সোভিয়েত সরকার কৃষির বিকাশ, তাকে সর্বাত্মকভাবে যন্ত্রায়িত করা, জমির উন্নয়ন ও উদ্ধার এবং রাসায়নিক সারের উৎপাদন আরো সম্প্রসারিত করার জন্য শত শত কোটি রুবল বিনিয়োগ করছে।

তাঁদের আত্মনিবেদিত কর্মের ফল থেকে সোভিয়েত নরনারী ইন্দ্রিয়-গোচরভাবেই লাভবান হচ্ছেন। সমস্ত ভোগ্যপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকার

অবস্থায় মজুরির অবিচল বৃদ্ধি জনসাধারণের হিতব্যবস্থাকে নিয়ত উন্নত করছে। পেনশন, পারিবারিক ভাতা ও ছাত্রদের জলপানি বৃদ্ধি পাওয়ায় একমাত্র গত চার বছরেই তিন কোটিরও বেশী মানুষ লাভবান হয়েছেন। চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ উঠে গিয়েছেন নতুন ফ্ল্যাট বাড়িতে। সারা দেশে গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুতহারে। আমাদের সহর ও গ্রামগুলি আগের চেয়ে আরো বেশী আরামদায়ক ও সুন্দর হয়ে উঠছে। এগুলি থেকে এরই প্রত্যয় উৎপাদক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মধারাকে, যার লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের সর্বাধিক উন্নতিসাধন, বাস্তব, ইন্দ্রিয়গোচর কাজকর্মে পরিণত করা হচ্ছে।

প্রিয় কমরেডগণ,

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবগুলি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও অধিজাতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তাদের সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মে। পার্টি ও সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত কর্তব্যকর্মগুলি পরিপূরণ করে রুশ ফেডারেশন এবং উক্রাইন, বিয়েলোরুশিয়া ও মোলদাভিয়া, সোভিয়েত বাল্টিক প্রজাতন্ত্র, ট্রান্সককেশিয়া, কাজাখস্তান ও মধ্য এশিয়ার শ্রমিক, যৌথ খামারী ও শ্রমজীবী-বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিরাট উদ্দীপনা সহকারে কাজ করছেন।

আমাদের সমস্ত কৃতিত্বই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী জাতীয় সংক্রান্ত কর্মনীতিকে অবিচলভাবে রূপায়িত করার ফল। যারা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার পতাকার নীচে এক বিরাট সোভিয়েত ভ্রাতৃত্বকে গঠন করার জন্য সমবেত হয়েছে এগুলি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই জাতিসমূহের যৌথ প্রচেষ্টা, সৌভ্রাত্রপূর্ণ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার চমৎকার ফল।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণে সাফল্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় উজবেকিস্তানের কৃতিসমূহের দ্বারা। এই উজবেকিস্তান পূর্বে ছিল জার-শাসিত রাশিয়ার একটি প্রত্যন্তবর্তী পশ্চাৎপদ ঔপনিবেশিক প্রদেশ। উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও মহামতি লেনিনের পার্টির অন্যতম জঙ্গী বাহিনী উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

এই কালপর্বে উজবেক জনসাধারণ এক বিরাট লাফে তাঁদের যুগসঞ্চিত পশ্চাৎপদতা থেকে আধুনিক সভ্যতার শিখরে পৌঁছেছেন। তাঁরা এমন শিখর প্রদেশ স্পর্শ করেছেন যা অতীতকালে কয়েক শতাব্দীতেও অর্জন করতে পারা যেত না। পঞ্চাশ বছর আগে স্থানীয় কৃষকরা যা ব্যবহার করে এমন কি সেই নিড়ানি ও অন্যান্য সরলতম যন্ত্রপাতিও উজবেকিস্তানে নিয়ে আসতে হত। সোভিয়েত উজবেকিস্তানের আজকের জীবন ও তার অতীত দিন ও রাত্রির মতই পৃথক। আজ প্রজাতন্ত্রটি বহু সামগ্রী উৎপন্ন করে ও খনি থেকে আহরণ করে। এর মধ্যে রয়েছে বিবিধ বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য থেকে গ্যাস ও তেল, কয়লা ও সোনা, রাসায়নিক ও ট্রাকটর, শক্তিশালী তুলা চয়ন যন্ত্র ও কংক্রিটের জমানো নির্মাণের উপকরণ, এক্সকাভেটর, এবং সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও জটিল রেডিও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। কয়েকটি মাত্র তথ্য এখানে উদ্ধৃত করছি। উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের বছরগুলিতে তার শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৪ গুণ। ১৯২২ সালে আমাদের দেশের সবগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করত আজ উজবেকিস্তানের বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশনগুলিই তার চেয়ে ৩৪ গুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে এই প্রজাতন্ত্রে শুধু বিরাট বিরাট শিল্প কারখানাই নির্মিত হয় নি, এখন সেখানে তার বিশাল প্রান্তরে রয়েছে মনুষ্য-নির্মিত সমুদ্র ও নদী, চমৎকার জলপ্রযুক্তিবিদ্যাগত সাজসরঞ্জাম, রেলপথ, রাস্তাঘাট এবং হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বিদ্যুৎ বহন লাইন। প্রজাতন্ত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। যৌথ খামার ব্যবস্থা একে প্রাগ্রসর সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা সমন্বিত এক সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছে। কৃষি ও পশুপালন থেকে উৎপন্ন সমস্ত সামগ্রীর উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বেড়েছে উজবেকিস্তানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তুলার উৎপাদন। এর মোট উৎপাদন ২,০০,০০০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৩,০০,০০০ টন।

জনগণের আত্মিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। অক্টোবর মহাবিপ্লবের আগে সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ লিখতে ও পড়তে পারত। আজ উজবেকিস্তান হয়ে উঠেছে সর্বজনীন সাক্ষরতা বিশিষ্ট এক প্রজাতন্ত্র।

সোভিয়েত জনগণ আস্থাভরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে এই আস্থার ভিত্তি তারই উপরে। এই আস্থা এ বোধের উপরেও প্রতিষ্ঠিত যে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি বা

মুদ্রাস্ফীতি আমাদের নেই, আর তা থাকতেও পারে না। আমরা এটা ভাল করেই জানি যে আজকের চেয়ে আগামীকাল আমাদের অবস্থা আরো ভাল হবে।

আমাদের পার্টি কখনো থেকে থাকে না। বিদ্যমান ত্রুটিগুলিকে সে সাহসের সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে দেয় এবং যে সমস্যাগুলি এখনও সমাধান করা যায় নি সেগুলির দিকে কমিউনিস্টদের ও আমাদের দেশের নরনারীর প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ করে থাকে। এ ধরনের বহু সমস্যাই রয়েছে। আমরা যত এগিয়ে যাই ততই এগুলি দেখা দিতে থাকে।

আমাদের দেশের রয়েছে চমৎকার বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। পশ্চিম সাইবেরিয়ার সুপ্রচুর তেল ও গ্যাসের সঞ্চয় ভাণ্ডার ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠছে। কামা নদীর উপরে নির্মীয়মান রয়েছে একটি বিরাট লরী কারখানা। ৩০০০ কিলোমিটারেরও বেশী দীর্ঘ বৈকাল-আমুর রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর সঙ্গেই সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও সোভিয়েত দুর প্রাচ্যের বিকাশসাধনকে আমরা যুক্ত করে থাকি। অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমাহার নির্মিত হচ্ছে। মধ্য রাশিয়ার অকৃষ্ণ মৃত্তিকা এলাকায় ৬ কোটি লোক বসবাস করে। এই এলাকার কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরাট কাজ আমরা সম্পাদন করছি। আমাদের দৃঢ়-প্রত্যয় এই যে আমাদের সবগুলি পরিকল্পনাই সাফল্যজনকভাবে কার্যকর হবে। আমাদের লেনিনবাদী পার্টির ও তার কেন্দ্রীয় কমিটির সুসঙ্গত নেতৃত্বের মধ্যে এবং আমাদের জনগণ কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের জন্য যে উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করছেন তার মধ্যেই আমরা এর গ্যারান্টি দেখতে পাই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মধারাকে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই লেনিনবাদী কর্মধারা বলে অভিহিত করে থাকি। ভি. আই. লেনিনের শিক্ষা, তাঁর নির্দেশ ও রচনাসমূহ হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞান-সম্মত দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। তার বহুমুখী কার্যকলাপের প্রতিটি পদক্ষেপকে এরই কষ্টিপাথরে যাচাই করে আমাদের পার্টি দেশকে কমিউনিজমের দিকে সঠিক পথে অবিচলভাবে পরিচালনা করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী যে অবিরত কার্যে রূপায়িত করা হচ্ছে সেটাই তার শক্তি ও প্রাণবন্তাকে, আমাদের পার্টি, তার কেন্দ্রীয় কমিটি

ও সবগুলি স্থানীয় পার্টি ইউনিট যে বিরাট সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শগত কাজ করছে তাকে প্রকাশ করে।

সোভিয়েত সমাজে নেতৃভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এ বিষয়ে নিয়ত সতর্ক থাকে যাতে করে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক জীবনকে আরও পূর্ণতরভাবে প্রভাবিত করার রূপ ও পদ্ধতিগুলি যুগের মর্মবাণী এবং পার্টির কর্তব্যকর্মসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। পার্টির ভিতরে সম্পর্কের উন্নতি, পার্টিজীবনে লেনিনীয় আচার আচরণ এবং যাতে পার্টির ভিতরে গণতন্ত্রের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয় সর্বোপরি সেই গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূল নীতিসমূহকে অবিচলভাবে মেনে চলা, কমিউনিস্ট-দের জঙ্গী মনোভাব বৃদ্ধি করা, তাদের ঐক্যকে, নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠনকে জোরদার করা, পার্টি ইউনিটগুলির আরও সংযোগ সাধন ও আরও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়গুলির প্রতি পার্টি অপরিহার্যভাবেই বিরাট মনোযোগ দিয়ে থাকে।

প্রিয় কমরেডগণ,

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ অপরিহার্যভাবেই সারা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা ও তা সংহত করার সঙ্গে যুক্ত। এই মহৎ ও মানবিক লক্ষ্য সমগ্র মানব-সমাজের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই মহৎ ও মানবিক লক্ষ্যের স্বার্থে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস কর্তৃক রচিত শান্তির কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য অবিচলভাবে কাজ করে চলেছে।

আমাদের প্রয়াসের ফলাফল সুবিদিত। সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিভূমিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করা এবং একটি তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কাকে হ্রাস করা লক্ষণীয়ভাবে সম্ভবপর হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবার-ভুক্ত সমস্ত দেশ কর্তৃক অবিচলভাবে অনুসৃত শান্তিকামী পররাষ্ট্রনীতি এবং সকল শান্তিকামী জাতির প্রচেষ্টা আমাদের এই গ্রহে সৃষ্টি করছে এক নতুন রাজনৈতিক বাতাবরণ।

এখন এই সহজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় করে তোলাই হয়ে উঠেছে বাস্তবসম্মত কর্তব্যকর্ম। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও

পশ্চিম জার্মানীর নেতৃবৃন্দের সম্প্রতি যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা এই প্রসঙ্গে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অন্যান্য পদক্ষেপের মতই এইসব আলাপ আলোচনার বেলাতেও আমাদের পার্টির নেতৃত্ব পরিচালিত হন শ্রেণীগত মূলনীতিসমূহের দ্বারা, এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে সংহত করার জন্য, শান্তিকে জোরদার করার, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ও সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য সর্বাধিক পরিমাণে অর্জন করার চেষ্টা তাঁরা করেন।

এই মহৎ কর্মে ক্লান্তিহীন কার্যকলাপের দ্বারা কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভ বিরাট ব্যক্তিগত অবদান রাখছেন।

কমরেডগণ,

বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়নি অবশ্য এখন সবচেয়ে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্তিসমূহের অনুবন্ধ সুনিশ্চিতভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অনুকূলে, নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জাতিসমূহের অনুকূলে।

শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির সংগ্রামে অন্যতম বৃহত্তম সাফল্য হচ্ছে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পরাজয় ও লাওসে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আরব জাতিসমূহ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সম্ভবপর সবকিছুই করছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় রাষ্ট্রসত্তার জন্য প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের বৈধ অধিকারকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি।

পর্তুগালের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিপ্লব মিশে গিয়েছিল গিনি-বিসাউ' মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলার জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে। তারই চাপে সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যটি ধ্বসে পড়েছে। পর্তুগালে অর্দ্ধশতাব্দীর ফাসিস্ত শাসনের পর সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে সেইসব গণতান্ত্রিক শক্তি যারা জনগণের ব্যাপক অংশের স্বার্থকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে তার পূর্বতন উপনিবেশগুলিতে সেইসব

নতুন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিই ক্ষমতায় আসছে যে শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে।

গ্রীসে ফ্যাসিস্ত জুন্টা রাজের পতন, সেখানে বেসামরিক সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি সমেত গণতান্ত্রিক গণসংগঠনগুলিকে বৈধ করা একটি প্রধান ঘটনা।

এই সবকিছুই শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজপ্রগতির স্বার্থে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্তিসমূহের নতুন অনুবন্ধকে প্রমাণ করে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন অর্জন করার জন্য শান্তির কর্মসূচীকে উদ্দেশ্যময়ভাবে রূপায়িত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবার নেতৃভূমিকা পালন করছে। এই আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনই বিভিন্ন দেশে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির সম্মুখে ঘটনার গতিধারাকে প্রভাবিত করার ব্যাপক সুযোগ এনে দিয়েছে। সমাজপ্রগতির জন্য এবং একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সামাজিক শ্রেণী ও পার্টিগুলি লড়াই করছে তারা আজ কাজ করে চলেছে আরও বেশী দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

এই সংগ্রামের গতিপথ জটিল। বিনা যুদ্ধে নতিস্বীকার করার অভিপ্রায় প্রতিক্রিয়া ও ফ্যাসিবাদের নাই। চিলিতে তারা সাময়িকভাবে কর্তৃত্ব দখল করতে পেরেছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে গণতন্ত্র ও প্রগতির শক্তিরাই চূড়ান্ত জয় অর্জন করবে। লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেছেন, "চিলির ঘটনাবলী নয় বরং পর্তুগালের ঘটনাবলীই সমাজবিকাশের মূল স্রোতধারায় নিহিত।"

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধনের আনুকূল্য করা এবং তাদের সঙ্গে ফলপ্রদ সহযোগিতা জোরদার করে তোলাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য বলে গণ্য করে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনজাত দুনিয়ার বিরাট মৈত্রীর, বন্ধুপ্রতিম স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক মূর্ত হয়েছে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার সোভিয়েত-ভারত চুক্তির মধ্যে। শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার ক্ষেত্রে দুই দেশের জাতিসমূহের অভিন্ন লক্ষ্যের উপর এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের সঙ্গে তাঁদের মৈত্রী ও সর্বাত্মক সহযোগিতাকে জোরদার ও আরও বিকশিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, সরকার ও

সমগ্র জনসাধারণ দৃঢ় ও অবিচলভাবে কাজ করে চলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের, জনগণের, এশিয়া ও সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এ হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এটা সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয় যে এ ব্যাপারে ভারতীয় জনসাধারণের ব্যাপক অংশ, সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের অবস্থান সম্পূর্ণ উপলব্ধি করছেন। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের সরকারী মৈত্রী সফরকালে অনুষ্ঠিত বৈঠক, আলাপ-আলোচনা ও স্বাক্ষরিত দলিলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধির এবং মৈত্রী ও সহ-যোগিতাকে আরও বিকশিত করার জন্য উভয় পক্ষের আগ্রহের প্রত্যয় উৎপাদক প্রমাণ মেলে।

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা শক্তিশালী করায় ও তার বিকাশ-সাধনে আপনাদের পার্টির সদস্যরা এবং তার নেতৃত্ব যে বিরাট ভূমিকা পালন করছেন সে-কথা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টরা ও সমগ্র জনসাধারণ ভাল করেই জানেন এবং তারা তার উচ্চ মূল্য দেন। আপনারা জানেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী গতবছর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান অর্ডার অব লেনিন কমরেড ডাঙ্গে ও কমরেড রাজেশ্বর রাওকে প্রদান করেছেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট, শ্রমিকশ্রেণীর ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তাঁদের বিরাট কাজের এবং সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী জোরদার করায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হচ্ছে এই পুরস্কার।

কমরেডগণ!

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস এবং জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের একটি সীমাবদ্ধ এলাকার বিশেষ সুবিধা হতে পারেনা। শান্তি অবিভাজ্য, আর ভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক সহাবস্থান ও পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার নিয়মসমূহ সমস্ত জাতি ও মহাদেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে হবে।

এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন করার ধারণাটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বহুদিন যাবতই এশিয়ার বহু দেশ এমন সব মূল নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম উপস্থিত করছেন যা যৌথ

প্রচেষ্টায় বিতর্কিত সমস্যাসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জন করায় এবং এশিয়াতে সুপ্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক ও সহযোগিতার আবহাওয়া রক্ষা করায় সংশ্লিষ্ট সবগুলি দেশকেই সক্ষম করবে। একথা খুবই স্পষ্ট যে যৌথ নিরাপত্তা ও এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতার ধারণাটিকে বাস্তব রূপ দিতে হলে এবং সেটা বাস্তবত হয়ে উঠতে গেলে অনলস প্রচেষ্টা, অবিচল বাস্তব পদক্ষেপ এবং শুভ ইচ্ছা দরকার।

আপনারা সকলেই জানেন যে এশীয় জাতিসমূহের মৌলিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই গঠনমূলক কাজ থেকে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বর্তমান নেতৃত্ব নিজেদের সরিয়ে রাখছেন। তাদের কার্যকলাপের দ্বারা মাওবাদীরা কার্যত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে আগ্রাসী শক্তিগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হচ্ছে, উত্তেজনা হ্রাস ও শান্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টার বর্শামুখ উদ্যত করছে, বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে হেয় করার কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষতি করছে সমস্ত জাতির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় পিপল্‌স কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে চীনা নেতাদের বক্তৃতা এটাই আর একবার দেখিয়েছে যে সোভিয়েত বিরোধিতাই বর্তমান চীনের রাষ্ট্রীয় নীতি হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পিকিং নেতৃবৃন্দের বিভেদকামী, অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে লেনিনবাদী ও অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত সরকার চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ও মহান চীনা জনগণের সঙ্গে মৈত্রী পুনঃস্থাপনের জন্য অবিচলভাবে কাজ করে চলেছে।

প্রিয় কমরেডগণ, বহু ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের পার্টি আপনাদের কংগ্রেসে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে অথবা অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেছে। এই ঘটনাই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিবর্ধমান ঐক্য ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মূল নীতিসমূহের সংহতিসাধনের এবং কমিউনিস্টদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংহতির নতুন, গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দেয়। এই ঘটনা এটাও প্রমাণ করে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অঙ্গী বাহিনী এবং সে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের যৌথ সংগ্রামে এক বিরাট অবদান রাখছে।

আপনাদের কংগ্রেসে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এটাও

দেখায় যে তারা দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমাবিষ্ট করার ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম সম্পর্কে বিপুলভাবে আগ্রহী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই বছর তার ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির আনুকূল্য করার জন্য দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সে সম্মুখ সারিতে রয়েছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক মহলের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্টরা ভারতীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক প্রাপ্তিগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

আপনাদের কংগ্রেসের দলিলগুলি থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভ্রাতৃপ্রতিম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পার্টির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ, যুব ও মহিলা আন্দোলনে তার প্রভাব জোরদার হয়েছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য, ভারতীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত গণ-অভিযান যে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগিয়েছে সে-কথা আমরা জানি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ও আপনাদের পার্টির বিশিষ্ট নেতা কমরেড অচ্যুত মেনন পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট সরকার কেরালা রাজ্যে সাফল্যজনকভাবে কাজ করে চলেছে। সেই সরকারের এটা পঞ্চম বছর এবং সে রাজ্যে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও প্রগতিশীল কৃষি-সংস্কার কার্যকর করতে এই সরকার সক্ষম হয়েছে।

প্রিয় কমরেডগণ,

আমরা ভালভাবেই জানি যে আপনাদের দেশের অভ্যন্তরে বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনা-বিকাশ আপনাদের পার্টির এবং বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সামনে জটিল সমস্যাসমূহকে তুলে ধরেছে।

সবখানেই এবং সর্বকালেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জনগণের স্বার্থে সাধিত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। এইসব

শক্তি যে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতিরও বিরোধিতা করবে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে আপসের দিকে ঝুঁকবে এটাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে জনগণের গণতান্ত্রিক প্রাপ্তিসমূহের এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এটা একটা বিপদস্বরূপ।

বিশ্বের ইতিহাস দেখায় যে জনবিরোধী ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে হলে গণতান্ত্রিক, প্রকৃত দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির দৃঢ় ঐক্য একান্তই আবশ্যক।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও সামাজিক প্রগতির দৃঢ় সমর্থক। সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে দৃঢ় ঐক্য অর্জন করার এবং দেশের বাম-গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক মহলের সঙ্গে সহযোগিতা করার যে কর্মধারা আপনাদের পার্টি রচনা করেছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জনগণের প্রাপ্তিসমূহকে তুলে ধরার ও তা প্রসারিত করার জন্য এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির পথে দেশের বিকাশকে পরিচালিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের পার্টি এবং ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির আরও সাফল্য আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রিয় কমরেডগণ,

এই সমুচ্চ মঞ্চ থেকে আমি আমাদের প্রতিনিধিদল এবং সমস্ত সোভিয়েত কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে আপনাদের কংগ্রেসের কাজকর্মে এবং ভারতীয় জনগণের মঙ্গলের জন্য আপনাদের পার্টির কার্যকলাপে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য আপনাদের সংগ্রামে সাফল্য কামনা করি।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো ও ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের আন্তরিক অভিনন্দন আপনাদের জ্ঞাপন করছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার, সোভিয়েত ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার সৌভ্রাত্রপূর্ণ মৈত্রী ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হোক ও বিকাশ লাভ করুক।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা

[শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর অনুরোধে বিলম্বে হলেও আমরা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করছি। শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবাব একই সঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে আর কোন বাদানুবাদ প্রকাশ করা হবে না। —সম্পাদক]

১

"জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্ন"-এর জবাব "মূল্যায়ন" ১০ম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৯৮১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) শ্রীনরহরি কবিরাজ তাঁর প্রকাশিত রচনায় দিয়েছেন। তিনি সঠিকভাবেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর রচনায় বলেছেন, মার্কসবাদী মাত্রেই স্বীকার করেন যে, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা বিচারের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বারবার দেখা গেছে যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা খাটো করে দেখার ফলে এই সব দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনে মহা বিপত্তি ঘটেছে। উপরোক্ত বক্তব্যটি সঠিকভাবে উত্থাপিত হলেও সামগ্রিক-ভাবে রচনাটির সুর একরূপ ছিল না। শুধু একরূপ ছিল না তা নয়, তিনি নিজের বক্তব্যেরই বিরোধিতা করেছেন। নরহরিবাবু বলেছেন,...গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে প্রতিনিয়ত শ্রেণী-সংগ্রাম চলবে। এই সম্পর্ক অ-বৈর বলার অর্থ হবে এই শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্যতা অস্বীকার করা। শ্রম ও পুঁজির বিরোধ ছোট করে দেখলে শ্রমিকের মতাদর্শ ও বুর্জোয়ার মতা-দর্শের মধ্যে পার্থক্যও বিলীন হয়ে যাবে—জন্ম নেবে শ্রমিকের মতাদর্শ ও বুর্জোয়া মতাদর্শের সহ-অবস্থান। তিনি আরও বলেছেন, শ্রমিক ও জাতীয় বুর্জোয়ার বিরোধ অ-বৈর মনে করার অর্থ হবে, এই যুগের প্রধান বিরোধ শ্রম ও পুঁজির—এটি বিস্মৃতি।

নরহরিবাবুর এই বক্তব্য আমাদের মেনে নিলে আমাদের দুটি জিনিসকে

অস্বীকার করতে হয়। তা হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়া এবং পুঁজির কোন ভূমিকা থাকে না। নরহরিবাবু এ প্রসঙ্গে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, শ্রম ও পুঁজির বিরোধকে অ-বৈর বলে ধরে নিলে যুগের মূল ধারা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। আমরা কিন্তু নরহরিবাবুর সাথে একমত হতে পারলাম না। এ যুগের প্রধান বিরোধ শ্রম ও পুঁজির বিরোধ বলে নরহরিবাবু যা বলেছেন, কিন্তু আমরা যতদূর জানি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এ যুগের প্রধান বিরোধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধকে। নরহরিবাবু কি করে এ যুগের প্রধান বিরোধ হিসাবে শ্রম ও পুঁজির বিরোধকে চিহ্নিত করলেন! আশাকরি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি আমাদের দেবার চেষ্টা করবেন।

এ যুগের প্রধান বিরোধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বক্তব্য আমরা এখানে উত্থাপন করছি। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলির সম্মেলনে সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধকে প্রধান বিরোধ হিসাবে উল্লেখ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশ্বের তিনটি শক্তিকে সমন্বয় করার কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি শক্তি হল: (১) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, (২) সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রেণী-সংগ্রাম এবং (৩) জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মিলিত কর্মোদ্যোগের প্রধান যোগ সূত্রটি হল বিশ্বশান্তির জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানবজাতির উপর তাপ-পারমানবিক বিশ্বযুদ্ধ ও গণ হত্যার যে বিপদ উদ্যত খড়্গের মত ঝুলছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একটা নতুন বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সমস্ত শান্তি-প্রিয় দেশ, গণ-সংগঠন ও আন্দোলনের যুক্ত প্রচেষ্টায়।

প্রথমতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাজিত করতে হবে। যুদ্ধের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে টেনে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে হবে। এইসব দেশের শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা সাম্রাজ্যবাদকে

দুর্বল করে। এখানে পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট যুদ্ধ-জোটগুলি ভাঙবার চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটানো। আফ্রিকা এশিয়ার সদ্য-স্বাধীন দেশসমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। এই সব দেশসমূহে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বাধীন জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করে জনসাধারণের জীবনমান উন্নত করতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে হবে। বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের অবসান, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আমূল গণতন্ত্রীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও তার প্রগতিশীল ঐতিহ্যের বিকাশ, বিপ্লবী পার্টির অস্তিত্ব যেখানে নেই, তা প্রতিষ্ঠা করা।

এই তিনটি শক্তিকে একত্রিত করে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রধান লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং নরহরিবাবু যেখানে শ্রম ও পুঁজির বিরোধকে এ-যুগের প্রধান বিরোধ বলেছেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কিন্তু তা অস্বীকার করছে। ভারতবর্ষের মত দেশে পুঁজির বিকাশ ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব। সেখানে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করে কার স্বার্থ রক্ষিত হবে? দেশের শিল্প-বিকাশের ফলে পুঁজির বিস্তৃতি বাড়বে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাও বাড়বে। লেনিন পুঁজির বিকাশ সম্পর্কে বলেছেন, একটা স্পষ্ট নির্দিষ্ট মাত্রায় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ না থাকলে আমরা সাফল্য লাভ করতাম কিনা সন্দেহ। সুতরাং জাতীয় মুক্তির বর্তমান স্তরে যদি শুধুমাত্র পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে। জাতীয় মুক্তির বর্তমান স্তরকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের সঙ্গে এক করে দেখলে ভুল হবে। কারণ বর্তমান স্তরটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর হিসাবেই গণ্য করা হয়। জাতীয় মুক্তির বর্তমান স্তরের লক্ষ্য হল সাধারণ গণতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট দেশটি সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজ হাতে দেয়। কাজেই বেশি ভাগ মুক্ত দেশে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের পথে যে উত্তরণের কাল-পর্যায় আসে তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আরব্ধ পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়কে এক এবং অভিন্ন করে দেখাটা ঠিক হবে না। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পরে উল্লেখযোগ্য হল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী এবং

তার পার্টির পরিচালনা। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্তরে নেতৃত্বের মধ্যে থাকে জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং অ-প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এ কথা সত্য যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাহায্য করবে। কিন্তু কৌশলের দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী ভুল করলে বিপদ আছে। এ বিপদ সম্পর্কে নরহরিবাবুও সতর্ক করে দিয়েছেন। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে। জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনকে দ্রুতহারে সমাধা করতে হবে। ভারতের মত দেশে যেখানে পুঁজির কিছুটা পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছে, সেখানকার পরিস্থিতি আরও জটিল। পথ ধনতান্ত্রিক হোক আর অ-ধনতান্ত্রিকই হোক না কেন, পুঁজি বিকাশ ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব।

পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ককে কেহ অ-বৈর বলে না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একটা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যার দ্বারা সে নিজেকে চালিত করে। আন্তর্জাতিকতার বিচারে যদি আজকের দিনের প্রধান বিরোধ সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণী তার পরিপ্রেক্ষিতেই সমগ্র সমস্যাটি বিচার করবে। শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে কিন্তু সংগ্রামের লক্ষ্য থেকে নিজেকে সে কোন মতেই বিচ্যুত করবে না। সে জন্যই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে শ্রমিকশ্রেণী শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ককে বৈর পর্যায়ে নিয়ে যায় না। শ্রমিকশ্রেণী আজকের লড়াইকে তার মুক্তি-সংগ্রাম হিসাবে দেখে না। কিন্তু সে একথাও বোঝে যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা না হলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথও প্রশস্ত হবে না। এখানে নরহরিবাবু জোর তাঁর সিদ্ধান্ত চাপাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি অযথা শ্রম ও পুঁজির বিরোধের পার্থক্য বিলীন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। এ ধরনের বক্তব্য অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সরাসরি বলে। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এ ধরনের যাঁরা তাত্ত্বিক আছেন তাঁরা বক্তব্যটা এমনভাবে উত্থাপন করেন যে, তাঁরা ওসব লাইনের বিরোধী কার্যতঃ তাঁরা একই লাইনের সমর্থক হয়ে পড়েন। ঐ সকল বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের বক্তব্যও একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই সকল তাত্ত্বিকগণ পুঁজির বিপদ সকল সময় দেখেন। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজির বিরোধ কখনও প্রকাশ করেন না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজির

বিরোধে, পুঁজির ভূমিকা নিশ্চয়ই প্রগতিশীল। এ সকল প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু ঐ সকল তাত্ত্বিকগণ আলোচনা করেন না। দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের শোষণে নিপীড়িত ছিল। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থা বাসা বেঁধে আছে। তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার দায়িত্ব কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকদের আছে। কিন্তু তাঁরা এসব ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

পুঁজির বিকাশ সম্পর্কে লেনিন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন, পুঁজিবাদের আরো বিকাশ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সন্ধান করতে হবে, এই চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল। রাশিয়ার মত দেশে শ্রমিকশ্রেণী যন্ত্রণা ভোগ করে পুঁজিবাদের জন্য ততটা নয়, যতটা পুঁজিবাদের অ-পর্যাপ্ত বিকাশের জন্য। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, সর্বাপেক্ষা স্বাধীন এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুত বিকাশে দ্বিধাহীনরূপে আগ্রহী। পুরানো ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশের যা কিছু পুঁজিবাদের ব্যাপক, স্বাধীন এবং দ্রুত বিকাশের অন্তরায়, তার অবসান ঘটানো শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অবধারিতরূপেই সুবিধাজনক। লেনিন আরও বলেছেন, বুর্জোয়া-বিপ্লব যত বেশি পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত, যত বেশি সংগঠিত পূর্ণ হবে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম হবে তত বেশি সুনিশ্চিত। একমাত্র যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অ-আ-ক-খ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের কাছেই কেবল এই সিদ্ধান্ত অভিনব বা অদ্ভুত এবং আপাত বিপরীত লাগবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত থেকে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে প্রতিপাদ্যও বেরিয়ে আসে যে, একটা বিশেষ অর্থে বুর্জোয়া বিপ্লব বুর্জোয়াদের থেকেও প্রলেতারিয়েতদের কাছে বেশি লাভজনক।

নরহরিবাবু এ যুগের প্রধান বিরোধ হিসাবে পুঁজি ও শ্রমকে চিহ্নিত করেছেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বলেছে, স্বাধীন জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করে জনসাধারণের জীবনমান উন্নত করতে হবে। এখানে পুঁজির সাথে শ্রমের বিরোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। বরং পুঁজির বিকাশের কথাই বলা হয়েছে। এমন কি সম্প্রতি উত্তর ইউরোপের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সামগ্রিকভাবে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল : **Ending the omnipotence of multinational monopolies is now decisive for the national**

independence of small countries and for the working class movement's struggle for socialist development in each country.

নরহরিবাবু জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করে বলেছেন,... জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে মিত্র হিসাবে যোগ দেবে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়ার একাংশ। এই ফ্রন্টের স্তম্ভ বা মেরুদণ্ড হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ারা। সমগ্র রচনাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, এটিই হল মূল সুর। অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ার প্রশ্নটি কৌশলে বাদ দিয়েছেন। নরহরিবাবু কি করে আশা করলেন যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তাঁদের গঠিত ফ্রন্টে যোগ দেবে এবং তারা ফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকবে না। এ ধরনের চিন্তা অবাস্তব তো বটেই, অ-বৈজ্ঞানিক এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। এই সংকীর্ণ চিন্তার দ্বারাই চালিত হচ্ছে ট্রট্স্কী-পন্থীরা। চতুর্থ আন্তর্জাতিকেরও এটাই লাইন। তাঁরা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন কর। জাতীয় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে চ্যুত কর। সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করার জন্যই চতুর্থ আন্তর্জাতিকবাদীরা এই লাইন গ্রহণ করেছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অন্দোলন দুর্বল হয়ে যাবে। আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে, নরহরিবাবু এবং আরও কয়েকজন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ অথবা অ-প্রত্যক্ষভাবে ট্রট্স্কীবাদের স্বপক্ষে প্রচারে নেমেছেন। নরহরিবাবুকে আমরা পুনরায় বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে বলব।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলছে, সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক ও কৃষকরা নিশ্চয় ফ্রন্টে থাকছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রশ্নটিও রাখা হয়েছে। নেতৃত্ব সম্পর্কে পূর্বসর্ত হিসাবে কিছু রাখা হয় নি। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান সংখ্যার দিক থেকে অত্যন্ত নগণ্য। শিল্প বিপ্লব দ্রুত সমাধা না হ'লে এর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই এবং সেটাও সম্ভব নয় দ্রুত পুঁজির বিকাশ ছাড়া। নরহরিবাবু শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন কোন সদ্য-স্বাধীন দেশে (যেমন আফ্রিকার দেশগুলি)

শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাই খুবই দুর্বল। সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না। এমন কি ভারতের মত দেশেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বসর্তগুলি তৈরী নয়। নরহরিবাবুর বক্তব্য অনুসারেই শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানের এবং নেতৃত্বের প্রশ্নটি বাদ দিতে হয়। শ্রমিকের সাথে কৃষকের প্রশ্নটিও আলোচনা করা দরকার। শ্রমিকের সাথে কৃষকের মৈত্রীর বিষয়টির উপর নরহরিবাবু জোর দিয়েছেন। জোর অবশ্য লেনিনও দিয়েছেন। আমরাও এ ব্যাপারে একমত। দ্বিমতের কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ অনগ্রসর এবং অগ্রসরমান দেশগুলিতে সংখ্যায় কৃষকের অংশই সবচেয়ে বড়। কৃষককে বাদ দিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব। এখানে নরহরিবাবুর একটি বক্তব্য উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি বলেছেন, ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১— এটা হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ।...বিদেশী ধনতন্ত্রের কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করে দেশীয় ধনতন্ত্র গড়ে তোলাই ছিল এই যুগের জাতীয় সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য। এই যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ধনতান্ত্রিক প্রবণতা (capitalist orientation) স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে যুগ আর নেই।...এখনকার দিনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আজকের দিনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সামনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সে আকর্ষণ নেই, আজ তার প্রধান আকর্ষণ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি। সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা (socialist orientation) আজকের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যুগগত বৈশিষ্ট্য। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে এক করে দেখটা ঠিক হবে না। কৃষকদের ভূমিকাও সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য আমরা উল্লেখ করছি। লেনিন বলেছেন, কৃষকেরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অর্থে বিপ্লবী, কিন্তু তাদের মধ্যে নিহিত আছে সমাজতন্ত্রীকরণের' ভাবনা নয়, কৃষক-বুর্জোয়া এবং পল্লী প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার এক নতুন শ্রেণী-সংগ্রাম।

তৃতীয় শক্তির কথা নরহরিবাবু উল্লেখ করেছেন। পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের অন্যতম শক্তি হিসাবে মার্কসবাদীরা মনে করে কিনা আমাদের জানা নাই। সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পৃথক সত্তা থাকতে পারে না। তারা হয় জাতীয় বুর্জোয়াদের অথবা শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী হিসাবে কাজ করতে পারে। ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট

ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলির অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আন্তর্জাতিক দলিলে এক জায়গায় "পেটিবুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশ" কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বে নিয়ে আসার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে নরহরিবাবু আরও একটি কথা বলেছেন, আজ তৃতীয় বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বুর্জোয়াশ্রেণী পরিচালিত রাষ্ট্রগুলি প্রধান আকর্ষণের বস্তু নয়, প্রধান আকর্ষণের বস্তু সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার দেশগুলি যাদের নেতৃত্বে রয়েছে মূলতঃ পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী। বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার দেশগুলি আজ তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রামে অগ্রবাহিনী। মূল্যায়ন লেখক-গোষ্ঠীর মতে পেটি-বুর্জোয়ারাই হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অন্যতম বিপ্লবী এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা নগন্য হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। নরহরিবাবু পেটিবুর্জোয়াদের নেতৃত্বে গঠিত কোন আকর্ষণযোগ্য রাষ্ট্রের কথা বলেছেন আমাদের জানা নেই। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কোন দেশের তুলনায় কিছু কম হয় নি। এখানে সমস্যার প্রাচুর্য থাকলেও গতি আজ পর্যন্ত ব্যাহত হয় নি। যার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বর্তমান সরকারকে গদীচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনও কিন্তু নরহরিবাবুর বক্তব্যের সাথে একমত নয়। এ যুগের প্রধান বিরোধ সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ। বিশ্বের তিনটি শক্তি একত্রিত হয়ে লড়ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সেখানে নরহরিবাবুর বক্তব্য তৃতীয় দুনিয়ার অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। ট্রটস্কীপন্থীরাও একই রাস্তায় চলছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকাকে কোন মতে ছোট করে দেখে না বরং উচ্চে তুলে ধরতে প্রয়াসী।

পরিশেষে আমরা লেনিনের বক্তব্য দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। লেনিন বলেছেন :

On the bourgeois nationalism which is awakening and must awaken, among those peoples, and which has its historical justification.

সুতরাং জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। নরহরিবাবুকে অনুরোধ জানাব, সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সীমাবদ্ধ করতে। কারণ তাঁরা শুধুমাত্র পুঁজি এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, এক-

চেটিয়া পুঁজি এবং সামন্তবাদের শোষণ আমাদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এদের সাহায্য করার জন্য দেশে আন্দোলন সংগঠিত করছে। কোন কোন বামপন্থী দলের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে ছোট করে দেখার প্রবণতা আছে। এ ধরনের প্রবণতা কোন কোন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকেরও আছে। সামন্তবাদের শোষণ এখনও দেশে বিদ্যমান। সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল এখনও ঘাড়ে চেপে আছে। একচেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধি গত কয়েক বছরে হয়েছে। এই সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র পুঁজি বা জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোন লাভ হবে না।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

২

শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটি আলোচনা উত্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হল মূল্যায়নের পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় (১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত শ্রীনরহরি কবিরাজের একটি প্রবন্ধ "জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্ন।" বিশ্বনাথবাবু শ্রীকবিরাজের প্রবন্ধে কতিপয় আপত্তিকর সূত্রায়ন পেয়েছেন। নরহরিবাবুর প্রবন্ধ থেকে তিনি একটি অংশ তুলে ধরেছেন—"গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে প্রতিনিয়ত শ্রেণী-সংগ্রাম চলবে। এই দুইয়ের সম্পর্ক অ-বৈর বলার অর্থ হবে এই শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্যতা অস্বীকার করা—শ্রম ও পুঁজির বিরোধ ছোট করে দেখলে শ্রমিকের মতাদর্শ ও বুর্জোয়ার মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্যও বিলীন হয়ে যাবে—জন্ম নেবে শ্রমিকের মতাদর্শ ও বুর্জোয়া মতাদর্শের সহ-অবস্থান।" তাঁর মতে নরহরিবাবুর এই বক্তব্য ভুল এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

যুগ বিচারের প্রশ্ন

শ্রীরায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্য সপ্রমাণ করার জন্য ১৯৬৯ সালের মস্কো বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনের নজির টেনে দেখিয়েছেন যে "এ যুগের প্রধান বিরোধ"—সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে শ্রীকবিরাজ তাঁর প্রবন্ধের ভূমিকায় জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা বিচারের গুরুত্ব অনুধাবনের উদ্দেশ্যে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন—প্রথমটি হচ্ছে—যুগবিচারের প্রশ্ন অর্থাৎ আমরা কোন যুগে বাস করছি তার চরিত্র কি একে অনুধাবনের প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি হল জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আলোচ্য দেশগুলির ক্ষেত্রে কোন স্তরে রয়েছে। এই দুটি প্রশ্ন যেমন একই সঙ্গে তেমনি আবার পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হওয়া দরকার—বিপ্লবের সাধারণ সূত্রায়ন ও বিশিষ্ট দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে।

শ্রীকবিরাজ তাঁর আলোচনায় লেনিন কিভাবে যুগবিচারের প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ করেছেন এবং তিনি লেনিনের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন: 'প্রথমেই বুঝতে হবে কোন শ্রেণীর হাতে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি রয়েছে।' আমরা সে আলোচনায় আর প্রবিষ্ট হচ্ছি না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কিভাবে যুগবিচার করছে দেখা যাক:

"আমাদের যুগের মূল মর্মবস্তু হচ্ছে পুঁজিবাদ" থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ··· (১৯৫৭ মস্কো সম্মেলন)

"আমাদের সময়, যার মূল মর্মবস্তু হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ···" (১৯৬০, মস্কো সম্মেলন—৮১ পার্টির দলিল)

"আমাদের যুগ হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ।" (১৯৬৯ মস্কো সম্মেলন—৭৫ পার্টির দলিল)

আন্তর্জাতিক দলিলের উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে বিশ্বনাথবাবু একেবারে নীরব কেন?

লক্ষ্য করার বিষয়, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে বারে বারে বলা হয়েছে—এ যুগ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ।

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতে—এ যুগের প্রধান বিরোধ ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা বনাম সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে: ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা হল ধনের প্রতিভূ আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা হল: শ্রমের প্রতিভূ।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক আফানাসিয়েভ যুগ বিচার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা তুলে ধরতে চাই। তিনি লিখেছেন—

The basic contradiction of our age is the contradiction

between socialism and capitalism between different socia-economic systems. This contradiction is the highest manifestation of the contradiction between the classes of society, between labour and capital. Never in the history of class struggle have two so well organised and forceful class forces, concentrated in the socialist and capi talist social systems, opposed each other. These systems embody two class lines, two historical tendencies in human development. One, represented by the world socialist system, is the line of labour, peace, democracy, socialism, progress. The other, represented by imperialism, is the line of capital, reaction, oppression and war." (V. Afanasyev and others-"Fundamentals of Scientific Socialism". P. 55)

শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রাম, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে মীমাংসাতীত বিরোধ, এখন বিশ্ব অঙ্গনে ব্যাপ্তিলাভ করেছে এবং এই বিরোধ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক এই দুই বিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

(ও. কাপুস্তিন : বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বর্তমান স্তর ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ১৭)

বিশ্বনাথবাবুর নিশ্চয়ই জানা আছে—"প্রধান বিরোধ" কথাটার মার্কসবাদী অভিধানে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে এক কল্পিত ব্যবধান খাড়া ক'রে তিনি নিজের চিন্তার দৈন্যের পরিচয় দিয়েছেন। মার্কসবাদী মাত্রেই জানেন সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তর। লেনিনের ভাষায় "সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর"—একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশের স্তর।

কাজেই বিশ্বনাথবাবু ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এক মনগড়া ব্যবধান রচনা করার চেষ্টা করে পাঠকদের মধ্যে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন ?

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই যুগটি শুরু হয়েছে একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে—মহান অক্টোবর বিপ্লবের জয়ে। এই যুগ-বৈশিষ্ট্য উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করেছে ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে ফ্যাসিবাদী ধ্বংসের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের জয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নির্ধারক শক্তিতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ

বিশ্বপর্যায়ে বিপ্লবী প্রক্রিয়া ও মানবজাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতির চাবিকাঠিটি রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই।

কোনো বিশিষ্ট দেশ বা দেশসমূহের বিপ্লবী বিকাশের প্রশ্নটি এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডেই বিচার করা দরকার।

যুগটা যদি হয় ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তাহলে স্বভাবতই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উপাদানগুলিও এরই সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও এর প্রতিষ্ঠার পরে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যে গুণগত পরিবর্তনসমূহ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তাকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে কেবলমাত্র ইতিহাস বিচারেই ভুল থেকে যাবে তাই নয়, উপরন্তু জাতীয় বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে পিছনপানে আটকে রাখা হবে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা সম্পর্কে

নরহরিবাবু বলেছেন—শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্ক অ-বৈর বলার অর্থ হবে : শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতা অস্বীকার করা ; এতে বিশ্বনাথবাবুর ভারী আপত্তি। তাঁর মতে "ভারতবর্ষের মত দেশে পুঁজির বিকাশ ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব। সেখানে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করে কার স্বার্থ রক্ষিত হবে!" শুধু তাই নয়, "দেশের শিল্প বিকাশের ফলে পুঁজির বিস্তৃতি বাড়বে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়বে।..." এই যুক্তি দিয়ে তিনি পুঁজির তথা পুঁজিবাদের বিকাশের সাফাই গেয়েছেন।

নতুন যুগে ঔপনিবেশিক ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যসমূহ যা লেনিন নির্দেশ করেছিলেন ও পরবর্তীকালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুন নতুন সাফল্যের ও জয়ের মাধ্যমে বিস্তৃত করেছেন সেই বৈশিষ্ট্যসমূহকে তিনি অনুধাবন করতে পারেননি অথবা উপেক্ষা করেছেন।

সমাজতন্ত্রের জয়ে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংকট শুরু ও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ যে সার্বিক সংকটে পর্যবসিত, সেই সংকটের যুগে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার ক্রম-অবলুপ্তিকে যথার্থ গুরুত্ব না দিয়ে বিচার করার ফলে তিনি একটির পর একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ; সমাজ-তন্ত্রের জয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলির সম্মুখে যে নতুন সম্ভাবনাসমূহ দেখা দিল ও যে নতুন বিপ্লবী উপাদানসমূহ সংযোজিত হল তার ব্যাখ্যা করে লেনিন এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে "পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের আন্দোলন গোড়ার দিকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্য-

বাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সম্ভবত আমরা যা আশা করি তার চাইতে অনেক বেশী বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করবে।" লেনিনের উক্তির 'পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে' এই অংশটির প্রতি বিশ্বনাথবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

নিপীড়নকারী ও নিপীড়িত দেশসমূহের বুর্জোয়াদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লেনিন তাঁর বিখ্যাত ঔপনিবেশিক থিসিসে "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক" শব্দনিচয় পাল্টে "জাতীয় বিপ্লবী" কথাগুলি ব্যবহার করেন। এর গুরুত্বও আমাদের আলোচনায় অপরিসীম। তিনি বলেছিলেন—যে কোন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' বদলে "জাতীয় বিপ্লবী" শব্দসমষ্টির উল্লেখ এই বিপ্লবে নতুন যুগে নতুন উপাদান সমূহের অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার দরুণ। জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্র অনুধাবন ও তার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের চরিত্র বুঝতে না পারলে হয় জাতীয় বুর্জোয়ার (সীমিত হলেও) বিপ্লবী ভূমিকা অস্বীকার করা হবে, নয়তো সেই বিপ্লবী ভূমিকাকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার সঙ্গে এক করে দেখার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। শ্রীকবিরাজ তাঁর প্রবন্ধের ভূমিকায় অত্যন্ত উপযুক্ত সময়েই এই সম্পর্কে সাবধানবানী উচ্চারণ করেছেন।

এ যুগের পুঁজিবাদের চেহারা ও চরিত্র উভয়ই অবক্ষয়ের। পুঁজিবাদের পক্ষে সম্ভব নয় (এমনকি সদ্যস্বাধীন দেশসমূহেও) সঙ্গতিপূর্ণ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প পলিটব্যুরো সদস্য রুশিদভ ১৯৭২এ তাশখন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের মূল রিপোর্টে যা বলেছিলেন তা পুনরায় স্মরণযোগ্য: "ধনতন্ত্র মৃত্যুর দিন গুনছে। কি "স্বদেশে"—ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, কি তৃতীয় বিশ্বে, তার আর ভবিষ্যৎ নেই। তৃতীয় বিশ্বে ধনতন্ত্র এখনও অপরিণত, কিন্তু সেখানেও তার অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।" আর সেইজন্যেই তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশসমূহকেও শিল্পায়নের জন্য আরো বেশী করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হচ্ছে, এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা যেহেতু পুঁজিবাদের পথেই দেশকে পরিচালিত করে, সেহেতু চূড়ান্ত ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাকে সমস্ত বিরোধ সত্ত্বেও আপসে আসতে হয়। বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে ধনতান্ত্রিক পথের সম্ভাবনা বিশেষ সীমিত। এই কারণেই বিশ্ব কমিউনিস্ট

আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক পথের বিকল্প হিসাবে অধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের কথা বলছে।

ধনতান্ত্রিক পথের বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে যে এতে একচেটিয়া পুঁজির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু এতে যে পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে তা কি সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক? এ প্রশ্নে সকলেই একমত হবেন যে পুঁজির বিকাশ ঠিক এর বিপরীত ফলটাই আনে। কেননা তার স্বাভাবিক চরিত্রই শোষণের।

এই কারণেই, উপযুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গত ও বিষয়ীগত পরিস্থিতির আনুকূল্য উপস্থিত হওয়ায় এই সময়টায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিকট অ-ধনতান্ত্রিক পথ এতটা কাম্য হয়ে দেখা দিয়েছে। অ-ধনতান্ত্রিক পথ যেমন অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে, তেমনি পুঁজির শোষণকে ক্রমে ক্রমে অবলোপ করার পথও প্রশস্ত করেছে।

অ-ধনতান্ত্রিক পথ আজ আর কেবলমাত্র তত্ত্ব নয়, এই তত্ত্ব আজ তৃতীয় বিশ্বের অনেকগুলি দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পথে যাত্রার শুরু সব দেশের পক্ষে একইভাবে হবে না—বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতির উপর এটা নির্ভরশীল। যে সব দেশে প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ছিল সেখানে সমাজতন্ত্রের সহায়তায় সরাসরি পুঁজিবাদী বিকাশের পথকে পরিহার করেই "দীর্ঘমেয়াদে সমাজতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে" অ-ধনতান্ত্রিক পথকে রূপ দেওয়া সম্ভব। আর যে সব দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন অবস্থান করেছে ও বিকাশ অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত সেখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথ একমাত্র আসতে পারে ধনতন্ত্রের পথটিকে পালটে দিয়েই। মাঝারী ধরনের পুঁজিবাদী দেশসমূহে (যেমন, ভারত) এই সংগ্রাম করতে গেলে কিছু পরিমাণে পুঁজির অধিকার খর্ব না করেন হতে পারে না—কেন না—পুঁজির বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে একচেটিয়ার বিকাশ পুনরায় ঘটবার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

বিশ্বনাথবাবু বলেছেন—"বরং পুঁজির বিকাশের কথাই" নাকি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বলছে। তিনি কি জানেন না যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদ প্রধান শত্রু হলেও শ্রম ও পুঁজির বিরোধের প্রশ্নটিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক দলিলগুলিতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে?

১৯৬৯ সালের মহা-সম্মেলনে গৃহীত মূল দলিলে বলা হয়েছে—"কতকগুলি দেশে এই আন্দোলন ধনতন্ত্রবিরোধী উপাদান গ্রহণ করছে।"

কমরেড ব্রেঝনেভ-এর বক্তব্যও পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক কি এসব দেশে তার পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত করে: "বহুদেশেই জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম বাস্তব অর্থে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধ শোষণমূলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে।" (সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট)। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বোরিস পনোমারিয়ভ এই সূত্রায়নকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুঁজিবাদ-বিরোধী ধারা কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়েছে।" (বোরিস পনোমারিয়ভ—বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক সমস্যাদি)।

জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা

স্বাভাবিকভাবেই, জাতীয় বুর্জোয়া যারা একই সঙ্গে সাধারণ গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ আনার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আগ্রহী এবং অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করে, তারা একচেটিয়া পুঁজির বিরোধিতা ও খর্ব করার সংগ্রামে চূড়ান্তভাবে আসতে পারে না, কেননা তাতে পুঁজিকেই সংকুচিত করার প্রশ্ন একেবারে সামনে এসে যায়। "যদিও বিষয়গত-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থের সংঘাত ঘটছে, তবুও জাতীয় বুর্জোয়ার প্রবণতা হল বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা এবং এরা বিপ্লবের মৌল শক্তি হতে পারে না।" (ভ. রাইবাকভ, নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব, শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, জানুয়ারী ১৯৭৫)

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও দেশীয় একচেটিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একত্রে চলার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু, এ যুগে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ক্রম-অবলুপ্তির পথে, অতএব জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের লক্ষ্যের সঙ্গে সামাজিক মুক্তির প্রশ্নটি বিজড়িত হওয়ায় পুঁজির সঙ্গে শ্রমের বিরোধটি তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ ধারণ করতে বাধ্য। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ার একটি অংশের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হলেও নেতৃত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়।

জাতীয় বুর্জোয়াদের ভিকার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করায় বিশ্বনাথবাবুর

হরিবাবু সম্পর্কে বলেছেন—তিনি নাকি ট্রটস্কিবাদী। প্রমাণ কি? যেহেতু রহরিবাবু বলেছেন—জাতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় ফ্রন্টে থাকবে, কিন্তু এর নেতৃত্বে থাকবে না—তাই তিনি ট্রটস্কিবাদী! ট্রটস্কিবাদের কি মনোরম ব্যাখ্যা। নরহরিবাবু—জাতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মিত্র বলে মনে করেন, কিন্তু বিশ্বনাথবাবু এতে খুশী নন! তিনি যেহেতু খাঁটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাই তিনি জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত না করে ছাড়বার পাত্র নন। পাঠকদের অবগতির জন্য বলি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগারিয়া প্রভৃতি দেশে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি অংশ যোগ দেয়, কিন্তু তারা অবশ্যই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল না। চীন বিপ্লবে (১৯৪৯) জাতীয় বুর্জোয়ার একটি অংশ মিত্র হিসাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ দেয়, কিন্তু তারাও নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল না।

আসল কথা, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে অবস্থানে বাধা সৃষ্টি করে তার দ্বৈতচরিত্র (Dual role)।

অবশ্য, বিশ্বনাথবাবু শুধু জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা বাড়িয়ে দেখেছেন তাই নয়; পরন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা অত্যধিক বড় করে দেখাতে গিয়ে তীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকের ভূমিকা, শহরের পেটিবুর্জোয়ার ভূমিকাকে বই ছোট করে দেখেছেন। কৃষক ও পেটিবুর্জোয়া সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছেন তা তাঁর নিজস্ব "আবিষ্কার"। মার্কস ও লেনিনের এ-সম্পর্কিত যে চিরায়ত সূত্রগুলি রয়েছে তার সঙ্গে বিশ্বনাথবাবুর এই "আবিষ্কার"কে পাঠকদের যাচাই করে নেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নরহরিবাবু ট্রটস্কিবাদী, তিনি কোনো বামপন্থী দলের ছদ্মবেশী সমর্থক ইত্যাদি ব'লে বিশ্বনাথবাবু সস্তায় বাজিমাৎ করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিশ্বাস আছে—পাঠকবর্গ এই কুৎসা প্রত্যাখ্যান করবেন।

—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য্য

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের অকালপ্রয়াণ ভারতের প্রগতিশীল আন্দোলনে অতীব বেদনাদায়ক ঘটনা। গত ২৫ ডিসেম্বর '৭৪-এ মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতের ছাত্র আন্দোলন যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মেজাজে ভরপুর, সেই সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষে ছিলেন অন্নদাশংকর। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব সেই সময়ে তিনি পালন করেছিলেন।

১৯৪৮ সালে প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ছাত্র সম্মেলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। উত্তরকালে তিনি মূলত একজন শিক্ষাকর্মী ছিলেন—শিক্ষক আন্দোলনে সেই সময়টা আত্মনিমগ্ন ছিলেন। পেশা ছিল অর্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা। সেই সঙ্গে চলত তাঁর লেখনী—নানা সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে আলোকপাত করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদের সদস্যও ছিলেন কিছুকাল। শেষ দিকটায় ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং আমৃত্যু তার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঐতিহাসিক ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিভেদপন্থীদের চক্রান্তে দ্বিধাবিভক্ত হবার পর যখন গণসংস্কৃতি সংঘ দানা বাঁধছিল, ঠিক সেই সময়ে অন্নদাশংকরের জীবনাবসান ঐ সংস্থার পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি। জীবনের পাঠশালায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কিভাবে মানুষকে দীক্ষিত করে তোলে ঘাত প্রতিঘাতে, অন্নদাশংকর তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

MULYAYAN Regd. No.—V
Paush-Magh-Falgun-Chaitra (1381 B.S.) R.N

এই প্রতীক কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

2 APR 1975

মূল্যায়ন

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য / লাতিন আমেরিকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রক্রিয়া / আরব দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতি / ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অধনতান্ত্রিক পথ

ভারতে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ার পরিপ্রেক্ষিত / কংগ্রেসে প্রগতিশীল কারা ? / ভারত সরকারের নীতি—ভারতে ধনতন্ত্রের প্রসার

পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকট / ফোর্ড ফাউণ্ডেশন—ভারতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোপন হাত

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE

শারদীয়
১৩৮১

চার টাকা

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার তিনটি ধারা—

- ★ সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র গঠন,
- ★ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক আন্দোলন,
- ★ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

এই তিন ধারার তাত্ত্বিক সমস্যা ও তথ্য জানার একমাত্র মাধ্যম বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষ্যে সেপ্টেম্বর '৭৪ থেকে জানুয়ারী '৭৫ পর্যন্ত প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করুন !

এক বছরের জন্য গ্রাহক চাঁদা ১০·০০ টাকা মাত্র

মূল্য প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সাধারণ গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক সডাক ১৫·০০ টাকা

ষাণ্মাষিক সডাক ৮·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ

৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

সম্পাদকীয় অফিস

৪/৩ এ ওরিয়েন্ট রো

কলিকাতা-১৭

বিশেষ উৎসবের
বিশিষ্ট উপকরণ

কেয়ো-কার্পিন
কেশ তৈল

ডি'জ
মেডিকেলের
তৈরী

অন্ধজনে দেহ আলো

★ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে অন্ধত্ব দূর করা আজ আর কঠিন কাজ নয়। চক্ষুষ্মান কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর চোখ তুলে নিয়ে সেই চোখের কর্নিয়া যদি কোনো অন্ধের চোখে লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

★ চোখ এমনভাবে তোলা হয় যাতে মৃতের মুখমণ্ডলের কোনো বিকৃতিই ঘটে না!

★ দেশের লক্ষ লক্ষ অন্ধজনের কথা ভেবে আপনিও আপনার চোখ দান করে যেতে পারেন। আপনার সেই মহৎ দানে একজন অন্ধ নবজন্ম লাভ করবে, দেখতে পাবে পৃথিবীর আলো।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের

আই ব্যাংকের

স্বেচ্ছাকৃত চক্ষুদাতার তালিকায়

আজই আপনার নাম তালিকাভুক্ত করুন

আই ব্যাংক দিবারাত্র খোলা থাকে

(ফোন : ৩৪-৯২৫২)

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৩৫৬৭।৭৪

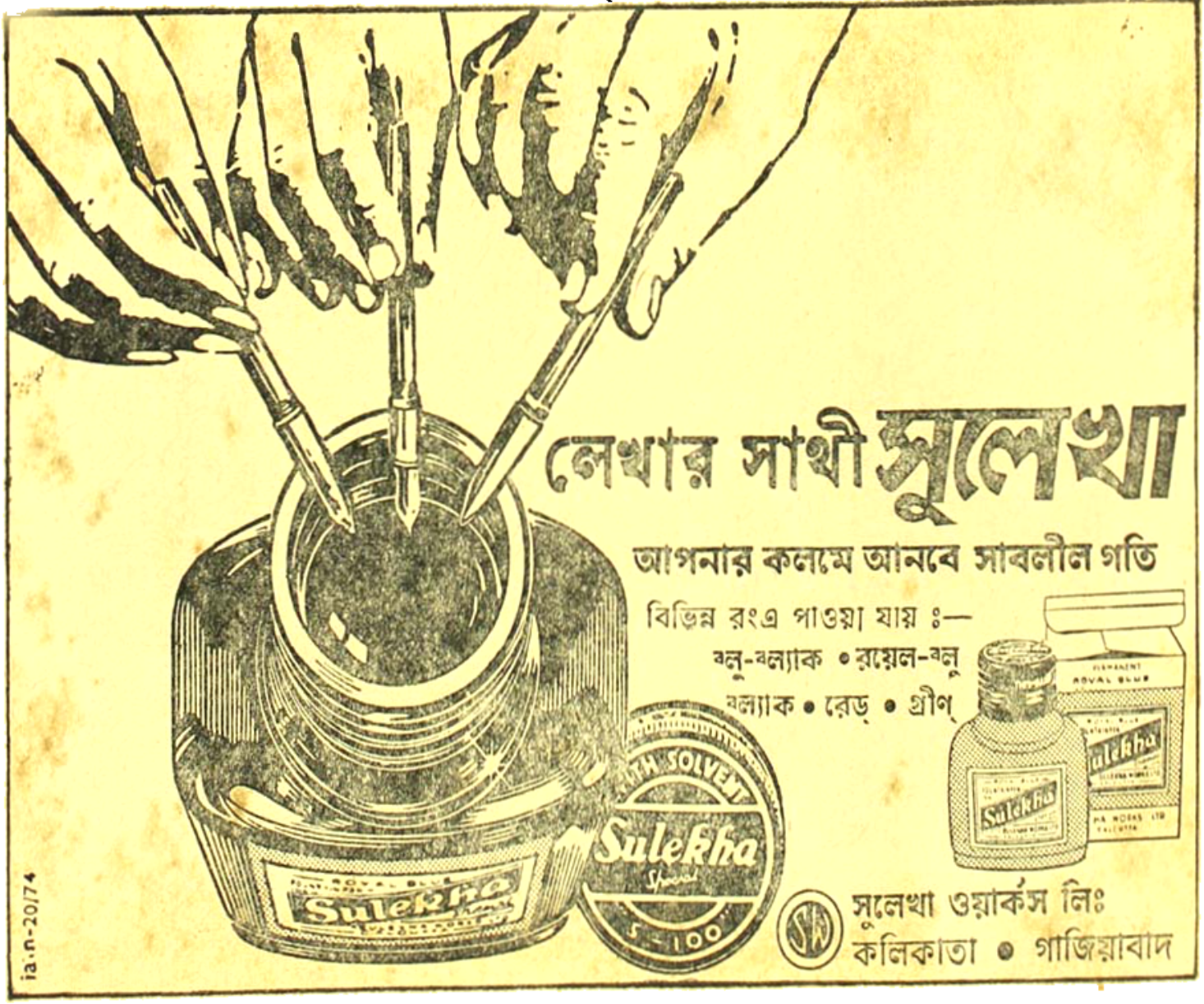
লেখার সাথী সুলেখা
আপনার কলমে আনবে সাবলীল গতি
বিভিন্ন রংএ পাওয়া যায় ঃ—
ব্লু-ব্ল্যাক • রয়েল-ব্লু
ব্ল্যাক • রেড্ • গ্রীণ্
Sulekha
WITH SOLVENT
Sulekha
INK
100
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ
ia.n-20/74

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ : শংকর চক্রবর্তী	৮·০০
কলিযুগের গল্প সোমনাথ লাহিড়ী	৪·৫০
শব্দের খাঁচায় : অসীম রায়	৬·০০
লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস	১৫·০০
রূপনারায়ণের কূলে : গোপাল হালদার	৬·০০
আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা : সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	
রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : চিন্মোহন সেহানবীশ	১৮·০০

সদ্য প্রকাশিত হলো

ধর্ম ও মার্কসবাদ : অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র	২·৫০
স্মৃতি বিস্মৃতি দুরস্মৃতি : পাবলো নেরুদা	১·০০

★

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩ বি বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

With The Compliments Of :

★

The Indian Tube Company Limited.

A Tata Stewarts & Lloyds Enterprise

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

মহাভারত (সঞ্জয় বিরচিত) সম্পাদিত—ডাঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ Rs. 40·00

শ্রীরাধা তত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা)—
জনার্দন চক্রবর্তী Rs.

3. মধ্য যুগে বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা)—
ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার Rs. 5·00

4. পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র বিকাশ—ডাঃ সুকুমার সেন Rs. 3·00

5. Philosophy of Mahatma Gahdhi—
Dr. D. M. Dutta Rs. 5·00

6. Nyaya Theory of Knowledge—
Dr. Satis Chandra Chatterjee Rs. 10·00

7. Nepali Language Its History and Development—
Dr. Dayanand Srivastava Rs. 10·00

8. Social Life in Ancient India—Edited—
Dr. D. C. Sircar Rs. 12·00

বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ

৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯

With best compliments from

●

BENGAL POTTERIES LIMITED

Makers of Fine Crockeries & Insulators

অনেক রাত্রি পার হ'য়ে আনন্দের দিনগুলিতে কেয়া...
অলস বেলায় চাঁপার রঙ...
শিরশিরিয়ে ওঠে হাওয়া শিশিরে শিউলিতে আনন্দে...
কাছে আসার আকুলতায়
দূরের বাঁশির টানে চকল দিন...

দূর হোক নিকট, নিকট হোক নিবিড়
পথপরিক্রমা তড় হোক, নিবিঘ্ন হোক

পূর্ব রেলপথ

With best compliments from

NAVA BHARAT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

NILHAT HOUSE ANNEXE

11 R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-1

Regd. Office :
920, TILAK ROAD, HYDERABAD-1.

Other Branches :
BOMBAY • COCHIN • DELHI • MADRAS •
GUNTUR • AGRA • MORADABAD

মূল্যায়ন

শারদীয়
ভাদ্র-আশ্বিন
১৩৮১

সূচী

পৃষ্ঠা

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও
অ ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে / নরহরি কবিরাজ
পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকট :
সেকালে ও একালে / সুকুমার মিত্র
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য / সত্য রায়
লাতিন আমেরিকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক
বিপ্লবের রূপ / ভানুদেব দত্ত
আরব দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক
বিপ্লবের প্রকৃতি / তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩
ভারত সরকারের নীতি : ভারতে ধনতন্ত্রের প্রসার / চারুব্রত রায় ৮১
ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য / মার্কসবাদী ৯৫
ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে
শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তাৎপর্য / বিভাস ঘোষ
ফোর্ড ফাউণ্ডেশন—নয়া উপনিবেশবাদের
গোপন হাত / নির্মাল্য বাগচী ১২২
কংগ্রেসে প্রগতিশীল বিচারের মানদণ্ড / রণধীর দাশগুপ্ত ১৪১
পত্রিকা পরিচয় ১৫২

প্রচ্ছদ : অমূল্য দাস

সম্পাদক :
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০, বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১১ হইতে প্রকাশিত ও
কালান্তর প্রেস, ৩০/৬, কাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত।

A new theoretical journal

Problems of National Liberation

No 1

Satyendranarayan Mazumdar
Narahari Kaviraj

CONTENTS

- Introducing the Communist Manifesto
  —Boris Ponomaryov
- The Development of Nepali Speaking Nationality in Darjeeling
  —Satyendranarayan Mazumdar
- The Santhal Agitation over the Rent Question
  —Narahari Kaviraj
- Nature of Congress Agrarian Reforms—Z. A. Ahmad.
- Non-Capitalist Path Development in Tanzania
  —Parimal Chandra Ghosh
- Non-Capitalist in India : Certain Implications :
  (a discussion)
- Book Review : 1. Outline History of Communist International
  2. Amiya Bagchi—Private Investment in India

Date of Publication

First week of November, 1974

To be had of :

Manisha Granthalaya Private Limited

4/3B, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে 'মূল্যায়ন'-এর পাতায় এর পূর্বে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে—এবারের শারদীয় সংখ্যায় আবার নতুন করে এই বিষয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে কেন? এর উত্তর এই প্রবন্ধগুলি পড়লেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন।

এই সংখ্যা 'মূল্যায়ন'-এ এই বিষয়টি নিয়ে যে রূপ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে তা বোধ করি ভারতের মার্কসবাদী মহলে এই প্রথম। এই বিষয়ে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি মূল সুর আছে। সেই মূল সুরটি হল: জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব মাত্রেই—(১) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ে, (২) এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে এই বিপ্লবে কার্যত একটি ধনতন্ত্র-বিরোধী চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, (৩) এই বিপ্লব ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে সংগঠিত হচ্ছে, তার ফলে এই বিপ্লব একটি সমাজতান্ত্রিক প্রবণতায় মণ্ডিত হচ্ছে।

লক্ষ্য করার বিষয়: একটি প্রবন্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সাধারণ বৈশিষ্টগুলির ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলেই সংগঠিত হোক—(১) আরব ও আফ্রিকার দেশগুলি, (২) লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, (৩) ভারত—উপরোক্ত চরিত্রটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (general features) হয়ে উঠছে।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে (যেমন আরব ও আফ্রিকার দেশগুলি, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, ও ভারত) অর্থনৈতিক সামাজিক বিকাশে যথেষ্ট তারতম্য থাকায়, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কতকগুলি পৃথক পৃথক জাতিগত বৈশিষ্ট্য (specific national features) নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এই পার্থক্যটি ভুলে গিয়ে আরব দেশগুলি, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এবং ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এক ছকে ফেলে বিচার করলে খুব ভুল হবে। তাই এই প্রবন্ধগুলিতে সাধারণ চরিত্রটি সামনে রেখে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে জাতিগত, দেশগত

বিশিষ্টতা অর্জন করছে সেটি যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আরব ও আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অ-ধনতান্ত্রিক পথের বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি একটি প্রবন্ধে প্রচুর তথ্যের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। অপর একটি প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে প্রচুর তথ্য ও উদ্ধৃতির সাহায্যে লাতিন আমেরিকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি।

বলাই বাহুল্য, ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি এই আলোচনার একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলছে তার সঙ্গে ভারতের বিপ্লবী প্রক্রিয়াটির পারম্পর্য বিচার করা হয়েছে। একদিকে দেখানো হয়েছে ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়াটি, আরব দেশগুলি এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলছে, তার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। অপরদিকে ভারতের পরিস্থিতিগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথ বিচারের মধ্যে এনে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিজস্ব রূপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারত একটি মধ্যস্তরের ধনতান্ত্রিক দেশ, যার সঙ্গে একদিকে আরব ও আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি আবার লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গেও তার পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে রূপ গ্রহণ করবে—যে প্রক্রিয়ার মেরুদণ্ড হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, যে প্রক্রিয়ায় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দেশপ্রেমিক অংশ নিজ অধিকারে অবস্থান করবে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমবর্ধমানভাবে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ভারতের এই বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশের দিকে অগ্রসর হবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে সঠিক ধারনায় উপনীত হতে গেলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুধুমাত্র সাধারণ চরিত্রটি জানাই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে এর যে বিভিন্ন রূপ দেখা দিচ্ছে সেই দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। 'মূল্যায়ন' সেই ভিন্নাত্মক দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার (differentiated approach) প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ভারতের নিজস্ব পরিস্থিতি একমাত্র গভীরভাবে অনুধাবন করেই ভারতকে তার নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করতে হবে। অন্য কোনো সহজ পথ নেই।

নরহরি কবিরাজ

পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকট ঃ সেকালে ও একালে

সুকুমার মিত্র

অনেকদিন থেকেই চলছে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সর্বব্যাপী সংকট। যতদিন যাচ্ছে ততই এই সংকট নিদারুণ ও জটিল আকার ধারণ করছে। আর মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে চক্রবৎ আবর্তিত সংকট। পুঁজিবাদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য চক্রবৎ আবর্তিত সংকট এই সর্বব্যাপী সংকটকে তীব্রতর করে যদিও চক্রবৎ আবর্তিত সংকটের সঙ্গে সর্বব্যাপী সংকটের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বর্তমানে চক্রবৎ আবর্তিত সংকটের সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠছে মুদ্রা-সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, শক্তি-সংকট প্রভৃতি। এখন সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ এক মহামন্দার (Great Depression) আতঙ্ক। ১৯৭৪ সালেই এই মহামন্দা দেখা দেবে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

আজকের দিনে মহামন্দার যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে তা আমাদের ১৯২৯-১৯৩৩ সালের মহামন্দার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলা যেতে পারে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন ১৯২৮-১৯৩৩ সালের মহামন্দায় সেই চিরায়ত তত্ত্বটি নির্ভুল প্রমাণিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সংকট তত্ত্ব এখনও বহাল রয়েছে যদিও পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের পুঁজিবাদ-সংস্কারের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে সংকটের ধাক্কা সামলাবার কিছু কিছু ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এইসব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার আগে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর সংকট তত্ত্বের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

মার্কস তাঁর দাস ক্যাপিটাল বা পুঁজির তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন :

"সংকট সব সময়েই পরস্পর-বিরোধিতার সাময়িক ও জোর-করা সমাধান ছাড়া আর কিছুই নয়। সংকট হচ্ছে প্রচণ্ড উৎক্ষেপণ যার ফলে কিছুকালের জন্য বিপর্যস্ত ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।" (ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১, কার এ্যাণ্ড কোং-র সংস্করণ)

সংকট প্রতিরোধের জন্য ধনিক শ্রেণী কি করতে পারে তা বর্ণনা করতে

গিয়ে মার্কস লিখেছেন : "ধনিকরা কি করে এই সংকটকে অতিক্রম করে? একদিকে বলপূর্বক উৎপাদন-শক্তির বিপুলাংশ ধ্বংস করে এবং অন্যদিকে নতুন নতুন বাজার দখল করে ও পুরানো বাজারগুলিতে আরও জোরদার শোষণ চালিয়ে। অর্থাৎ আরও ব্যাপক ও ধ্বংসকর সংকটের পথ পরিষ্কার করে এবং সংকট প্রতিরোধের যে সমস্ত উপায় আছে সেগুলি হ্রাস করে।" (কমিউনিস্ট ইশতেহার, পৃঃ ৩৪, পি পি এইচ সংস্করণ)

সংকটের পূর্বাহ্নে যে অবস্থা দেখা দেয় তার ছবিটি তুলে ধরে মার্কস লিখেছেন : "সংকটের পূর্বাহ্নে উন্মাদনাকর ঐশ্বর্যজাত প্রাচুর্য দেখে ধনিক শ্রেণী ঘোষণা করে টাকা মিথ্যা কল্পনামাত্র। একমাত্র পণ্যই হচ্ছে টাকা। কিন্তু এখন সর্বত্র চিৎকার শোনা যায়, একমাত্র টাকাই হচ্ছে পণ্য। হরিণ যেমন টাটকা জলের জন্যে হাঁপিয়ে মরে তেমনি তার (ধনিকের) প্রাণ একমাত্র সম্পদ টাকার জন্যে হাঁপিয়ে মরে।" (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫, অর্জ এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন সংস্করণ)

এইভাবে দেখা দেয় মুদ্রা-সংকট। পুঁজিপতিরা দেনা শোধ করতে পারে না টাকার অভাবে, কারণ মাল বিকোয় না। তাদের পসার নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে দেখা দেয় আর্থিক সংকট (Financial Crisis)। শেয়ারের দর হু হু করে পড়তে থাকে, শেয়ার বেচে ফেলার জন্যে পাগলের মত লোকে ছুটোছুটি করতে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জে বা শেয়ার বাজারে নিদারুণ আতঙ্কের ফলে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গন ধরে, বহু বড় বড় কোম্পানি দেউলে হয়ে যায়। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে যায়। বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য এবং অর্ধাশন অনশন সমগ্র সমাজে ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করে। এই অবস্থাকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় শিল্প-সংকট।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট দেখা দেয়। এই চক্রবৎ আবর্তন লক্ষ্য করে অর্থনীতিবিদরা "চক্র" (Cycle) কথাটি সৃষ্টি করেছেন। আসলে এই চক্র হল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন চক্র। ১৮৬৬ সালে এঙ্গেলস "দাস ক্যাপিটাল"-এর প্রথম ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় সংকটের ভয়ঙ্কর চেহারা বর্ণনা করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন : অচল অবস্থা, সমৃদ্ধি, অতি-উৎপাদন এবং সংকটের দশবার্ষিক চক্র ১৮২৫ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত বার বার দেখা দিয়েছে মনে হয় সত্যি সত্যি বুঝি তার আবর্তন শেষ হল। কিন্তু আসলে

সেই চক্রাবর্তন আমাদের স্থায়ী এবং একটানা মন্দার নৈরাশ্যময় পাঁকের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গেছে। যে সমৃদ্ধির যুগের জন্যে হা-হুতাশ করা হচ্ছে সে যুগ আর ফিরবে না। যে মুহূর্তেই আমরা সে যুগে ফিরে আসার লক্ষণ অনুভব করব সেই মুহূর্তেই তা শূন্যে মিলিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে প্রত্যেক পরবর্তী শীতকালে নতুন করে দেখা দেবে সেই বিরাট প্রশ্ন, "বেকারদের নিয়ে কি করা যাবে!" কিন্তু বছরের পর বছর বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলবে, প্রশ্নের জবাব কেউ দেবে না এবং আমরা হিসাব কষে প্রায় সেই মুহূর্তকে স্থির করতে পারব যখন বেকাররা ধৈর্য হারিয়ে নিজেদের ভাগ্যের ভার নিজেদের হাতেই নেবে। তাঁদের কালের সংকটগুলি অনুধাবন করে মার্কস ও এঙ্গেলস সংকটের যে ছবিটি তুলে ধরেছিলেন তা ব্যাপক আকারে বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার মধ্যে। সেদিন সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নেমে এসেছিল এক নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া, লালবাতি জ্বেলেছিল হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান, কোটিপতি এক লহমায় রাস্তার ভিখারী হয়ে গিয়েছিল, বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক শিল্পপতি ক্রুগার আত্মহত্যা করেছিলেন। বড় বড় বহু পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গণেশ উল্টেছিল।

তখন থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ মহলে ধনতন্ত্রকে বাঁচানোর দাওয়াই আবিষ্কারের হিড়িক পড়ে যায়। কেইনসীয় দাওয়াই সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করে এবং তা "নয়া অর্থনীতি" নামে পরিচিত হয়। কেইন্স-এর শিষ্য বা অনুগামী নন এমন অনেকেও (যেমন, টিম্বারগেন প্রমুখ) "নয়া অর্থনীতি"কে আরও কার্যকর করে তোলার উপায় উদ্ভাবন করেন।

"নয়া অর্থনীতি"র দাওয়াই, অবশ্য, ব্যাধি নিরাময়ের দাওয়াই নয়। ইচ্ছা থাকলেও তেমন কোন দাওয়াই আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতিবিদরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু ব্যাধির তীব্রতা সাময়িকভাবে হ্রাস করার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদ পুঁজিবাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংকট সম্পর্কে যেসব অভিমত প্রকাশ করেন সেগুলি সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

এর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর আমলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পূর্ণ পরিণতি লাভ না করলেও দ্রুত

পূর্ণ পরিণতি লাভের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই ক্রমবিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের যে পরিবর্তন ঘটছিল তার লক্ষণগুলি মার্কস ও এঙ্গেলস সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছিলেন, একচেটিয়া পুঁজির চেহারার রূপরেখা তখনই তাঁদের কাছে ধরা পড়েছিল। এই রূপরেখাকে একেবারে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন লেনিন তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের শেষ স্তর" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে।

অবাধ প্রতিযোগিতার দিন অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছিল এবং একেবারে সঠিক সন তারিখ দেখিয়ে বলা না গেলেও একথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই একচেটিয়া পুঁজি তার আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। আর এই সময় থেকেই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় দেখা দেয় সর্বব্যাপী সংকট। সর্বব্যাপী সংকটের কবল থেকে মুক্তিলাভের প্রাণপণ চেষ্টায় একচেটিয়া পুঁজি সর্বতোভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির (স্টেট মনোপলি ক্যাপিটালিজম) উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে কেইনসীয় "নয়া অর্থনীতি" এই রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিরই অর্থনীতি। এই অর্থনীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজি অর্থনীতি সামরিকীকরণের জন্য অর্থাৎ সামরিক ধারায় অর্থনীতি পুনঃসংগঠিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। ৩০-এর দশকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনীতির সামরিকীকরণ তুঙ্গে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অর্থাৎ সর্বব্যাপী সংকটের প্রথম স্তরে অক্টোবর মহাবিপ্লব পৃথিবীর একটি বিরাট অংশকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতির সামরিকীকরণ ত্বরান্বিত করে। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের দ্বিতীয় স্তরে ফ্যাসিজমের অভ্যুদয় হয়। ফ্যাসিজম পুঁজিবাদেরই নগ্নরূপ এবং পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের রাজনৈতিক ফল। পুঁজিবাদের সংকট ও অবিরোধিতার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যায়। আত্মরক্ষার জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার শাসিত সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। ফ্যাসিজমের পতনের ফলে সারা দুনিয়ায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। মহাবলশালী ও সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের অভ্যুদয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক-কারিগরী বিপ্লব পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির কাঠামোর বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের প্রথম স্তরে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি গড়ে ওঠে প্রধানতঃ অর্থনীতির সামরিকীকরণের হাতিয়ার রূপে। দ্বিতীয় স্তরে এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পুঁজির একনায়কত্বের হিংস্র ও অমানুষিক সমস্ত রূপ এবং লোক-ঠকানো নানা প্রকার কূট কৌশলের সমাবেশ ঘটিয়ে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি তার আধিপত্য বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তার পরস্বাপহারী রূপকে ঢাকা দেওয়ার জন্য "জনকল্যাণ রাষ্ট্রের" সাইনবোর্ড টানাতেও সে দ্বিধা করে নি।

এই অবস্থায় যুদ্ধোত্তরকালের চক্রবৎ আবর্তিত সংকটগুলি দেখা দিতে থাকে।

২

..."প্রত্যেক মহাযুদ্ধই যুদ্ধকালে শিল্পসংকটের ধারাতে বিরতি ঘটায়, উৎপাদন প্রক্রিয়ার চক্রবৎ আবর্তিত লক্ষণগুলির প্রকাশ মুলতবি রাখে এবং একটা "বিশেষ ধরনের জোয়ারের" পর্যায়কে এনে দেয়।"

মহাযুদ্ধের প্রভাবেই অর্থনীতির এইরূপ বিকার ঘটে। শান্তির সময় পণ্যের মূল্য উশুল করে নেওয়াই হল পুঁজির সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, কিন্তু যুদ্ধের সময় এই সমস্যা অর্থাৎ বাজারের সমস্যার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সরকার বাজারে দেখা দেন অফুরন্ত ক্রয়শক্তি সহ। যুদ্ধাবসানের পর ক্রেতারা বাজারে ছুটে যায় তাদের প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে, পণ্যের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে, ফলে শুরু হয় নতুন শিল্পচক্রের ঊর্ধগতি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে চক্রাবর্তনের যুগ শেষ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই। একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য এবং পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট স্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। এই কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পজগতে এক বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

এই জটিলতার জট উন্মোচনের জন্য প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী অর্থনীতি-বিদরা যে চেষ্টা করেছেন তা থেকে মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

যায় যে, পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদকে যখন অবলুপ্তির পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তখনও পুঁজিবাদ আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টায় যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার ফলে পুঁজিবাদের আপেক্ষিক বা সাময়িক স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

খ্যাতনামা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ মরিস ডব যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী বিকাশের ব্যাপ্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন যে, উৎপাদন অপেক্ষা মোট লগ্নী-ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যে অনেক বেশি বড় আকারে দেখা দিচ্ছে একথা মেনে নেওয়া দরকার।

…"এইসব রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী প্রবণতাগুলি পুঁজিবাদের পক্ষে কিছু পরিমাণ স্থিতিশীলতা সুনিশ্চয় করেছে। যাই হোক না কেন, তারা সঠিক-ভাবেই যুদ্ধের পর পুঁজিবাদের "একটা ঊর্ধ্বমুখী পর্যায়ে"র পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং তাঁর সমালোচকরা এ ব্যাপারে ভুল করেছিলেন।" (সাম ইকনমিক রিভ্যালুয়েশনস—দ্য মার্কসিস্ট কোয়ার্টারলি, জানুয়ারি, ১৯৫৭)

এই প্রসঙ্গে মরিস ডব* যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদের যে সব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন সেগুলি হল: বিরাট বিরাট একচেটিয়া করপোরেশন ও তাদের সঞ্চিত বিপুল সংরক্ষিত অর্থ এবং এর ফলে বহু লাভজনক প্রকল্প বিক্রয় অভিযান ও নতুন নতুন দ্রব্য প্রবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টির অভিযান। স্থিতিশীলতা সত্যকারের স্থিতিশীলতা কিনা এবং এর কারণ কি এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং "নানা মুনি নানা মত" দিয়েছেন। তবু আজকের দিনের বৃহত্তম পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যাঁরা বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন স্থিতিশীলতার কারণ সম্পর্কে তাঁদের মত আজ সর্বজন-স্বীকৃত বললে ভুল হবে না। এখানে কারণগুলির তালিকা দেওয়া হল:

১) অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

—লগ্নী পুঁজি (ফিনানসিয়াল ক্যাপিটাল) ও শিল্প পুঁজির মিলন এমন

* মরিস ডব "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পুঁজিবাদের পরিবর্তন" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন (মার্কসিজম টু-ডে, ডিসেম্বর, ১৯৫৭)। তাঁর মতে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের আধিপত্য বৃদ্ধির ফলে ও অন্যান্য কারণে পুঁজিবাদের যে সব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি স্বাভাবিক চক্রাবর্তনকে বিধৃত করেছে। কাজেই অতীতের পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের সংকটের মিলের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকবে অথবা বিরোধের অবসান ঘটেছে।

লক্ষনীয়ভাবে বেড়ে গেছে যে, তাদের সামগ্রিকতায় বৃহৎ লগ্নী (ফিনান্স ও) বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠতর হয়েছে যেমনটি আগে কখনও দেখা যায় নি।

২) বৃহত্তম কর্পোরেশন (কোম্পানী) গুলির বেশির ভাগ ডিরেক্টর অর্থের মালিকদের প্রতিনিধি. মাইনে-করা কর্মচারী নন।

৩) "নিয়ন্ত্রণের মুনাফা" দাঁড়িয়েছে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ, ফলে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

৪) অবিরাম বিরোধ সত্ত্বেও শক্তিসমূহের সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীলতা বর্তমান। এর কারণ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলির অটুট নিয়ন্ত্রণ।

৫) ফেডারেল সরকারে (মার্কিন) বৃহৎ ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

৬) বিদেশে বিপুল লগ্নী—বছরে মোট মুনাফা ১১ শত কোটি ডলারেরও বেশি।

(দ্য এম্পায়ার অব হাই ফিনান্স—ভিক্টর পারলো)

প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করে অতিকায় শিল্পসংস্থা, সংঘ (ট্রাস্ট) ও কারটেলগুলি (বর্তমানে বহুজাতিক অতিকায় কর্পোরেশনসমূহ) চক্রবৎ আবর্তিত সংকট বা সাময়িক সংকটগুলির ধাক্কা কিছু পরিমাণে সামলাতে পারলেও যুদ্ধোত্তরকালে সংকটের ঘন ঘন আবির্ভাব প্রমাণ করছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি যে "স্থিতিশীলতা" এনেছে তা তাসের ঘরের মতই ঠুনকো। কারণ, রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির বাড়বাড়ন্ত আজকের দিনের পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অ-স্থিতিশীলতা আরও বেড়ে যাওয়ারই অন্যতম লক্ষণ। শুধু, সাধারণ রাজনৈতিক অর্থে নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক অর্থেও বটে। নানা ধরণের সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে যেগুলি ছাড়া একেবারে সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক ছবি বহুল পরিমাণে বদলে যেত।

এই ব্যাপারই দেখিয়ে দিচ্ছে এক অন্তর্নিহিত সত্যকে যা আজকের দিনে বাইরের চেহারায় চোখে পড়ে না। এই সত্য হল: সংকট অতিক্রম ও জোয়ার ত্বরান্বিত করতে সক্ষম "বিশুদ্ধ" অর্থনৈতিক শক্তিগুলির দিক থেকে

বিচার করলে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক চক্রাবর্তনগুলির স্বতোৎসারিত শক্তি অতীতের তুলনায় দুর্বলতর হয়েছে। এইসব শক্তি এখনও বর্তমান। কিন্তু স্থাণু হয়ে পড়া ও সংকটের প্রবণতা সমভিব্যাহারেই এইসব শক্তি এখন কাজ করছে। এই কারণেই হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হচ্ছে। (এই অভিমত হল সেলেস্ত স্ট্র্যাকের যিনি "মেরী নোভরিস" এই ছদ্মনামে লিখে থাকেন)

সামরিকীকরণের সাহায্যে অর্থনীতি চাঙ্গা রাখার চেষ্টার উল্লেখ করে সম্প্রতি ভিক্টর পারলেও বলেছেন যে, সামরিকীকরণেরও সীমা আছে এবং এর জন্যে বিপুল অর্থ ঢেলেও অর্থনীতি চাঙ্গা করা যাচ্ছে না এর প্রমাণ পাওয়া গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এই হস্তক্ষেপের আসল রূপটি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে যাতে বলা হয়েছে :

"ধনপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ।" রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ শেষ পর্যন্ত সংকটকে গভীরতর করে, নতুন স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করে।

৩

এখন যুদ্ধোত্তর কালের চক্রবৎ আবর্তিত সংকটগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ পর্যন্ত পাঁচবার সংকট দেখা দিয়েছে এবং বর্তমানে আর একটি বড় রকমের সংকট বা মহামন্দা আসন্ন হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যে সব সংকট দেখা দিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সংকটগুলি গুণগতভাবে এক স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে গড়ে উঠেছে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ যার অর্থনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সংকটহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ অংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে ঘায়েল করার লক্ষ্য সামনে রেখে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের কর্মনীতি নির্ধারণ করেছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম সংকট দেখা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সংকট ছিল অতি-উৎপাদনের সংকট যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সংকটের আগে মার্কিন

অর্থনীতিতে প্রবল জোয়ার আসে। স্বচ্ছল ও বিত্তশালী শ্রেণীগুলির হাতে সঞ্চিত অর্থের বিপুল স্রোতের সঙ্গে পুঁজিপতিদের ক্রয়শক্তির স্রোত মিলিত হয়ে এক অস্বাভাবিক জোয়ারের সৃষ্টি করে। ফরচুন লেখেন: "দেখা যাচ্ছে জোয়ার চলেছে, আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসে বৃহত্তম জোয়ার ...প্রত্যেকটি জিনিস তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিকিয়ে যাচ্ছে···মিংক কোট ১৫ হাজার ডলারে, ছেলেদের হাতঘড়ি হাজার ডলারে।

যে জোয়ার চলেছে তা এক অস্বাভাবিক ব্যাপার, "সমৃদ্ধি"র মত শান্তিপূর্ণ জিনিসকে বহুদূর অতিক্রম করে যাওয়া এক ব্যাপার। এ হল অভূতপূর্ব পরিমাণ অর্থের আকস্মিক মুক্তি···"

কিন্তু যখন এই জোয়ার আসে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ এবং সরকারের ভাতার উপর নির্ভরশীল সৈন্য-বাহিনী থেকে ছাড়া পাওয়া ১৫ লক্ষ লোক। জোয়ার যখন চলছে তখন অর্থাৎ ১৯৪৬ সালেই শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৩ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। সমস্ত জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রকৃত আয় কমতে থাকে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় (জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে) ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময় রবিবারেও কাজ হত, এ ছাড়া ওভারটাইম দিয়ে অন্যান্য দিনে কাজ করানো হত। সে সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিকদের আয় কমে যায়। এর পর দর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ফলে জিনিস-পত্রের দর আরও বাড়ে। এ সব জোয়ারের অবসান ঘটিয়ে ভাঁটা আনে, শুরু হয় যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম সংকট। এই সংকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর প্রভাব সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অর্থনীতির সামরিকীকরণের মাধ্যমে সংকটের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয় রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি। তাই, জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আর এরই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর অতলান্তিক যুদ্ধ জোট।

মরিস ডব বলেছিলেন যে, কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার ছয় মাস বা তারও আগে মন্দার অবস্থা কেটে যেতে শুরু করেছিল, কাজেই কোরিয়া যুদ্ধের জন্য মন্দার অবসান ঘটার কথাটা ঠিক নয়। কিন্তু মার্কিন পত্রিকাগুলি অন্য কথা বলে। "ইউ. এস. নিউজ এ্যাণ্ড ওয়ার্লড নিউজ" মন্তব্য করেন, "ঠিক যখন

জোয়ার (শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে) নেমে যাচ্ছে বলে লোকে মনে করছিল ঠিক তখনই কোরিয়ার যুদ্ধ নতুন জোয়ারের সূচনা করেছে।" এই পত্রিকা অকপটভাবে স্বীকার করেন যে, "আসলে ব্যবসা-বাণিজ্যকে উঁচু স্তরে রাখার জন্যে এই পরিস্থিতি ফরমায়েস অনুযায়ীই সৃষ্টি করা হয়েছে। যে মন্দার ভূত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আতঙ্কের সৃষ্টি করছিল কোরিয়ার যুদ্ধ বাধায় সে ভূতের ভয় দূর হয়েছে। ভবিষ্যত হল আরো জোয়ার।"

উৎফুল্ল "ওয়াল স্ট্রীট জার্ণাল" বলেন, "কোরিয়ার যুদ্ধ মার্কিন একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুবই লাভজনক ব্যাপার।" "জার্ণাল অব কমার্স" বলেন যে, কোরিয়ার ঘটনা না ঘটলে এই গ্রীষ্মকালে গুরুতর সাময়িক মন্দা দেখা দিত একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। "বিজনেস উইক" মন্তব্য করেন: "কোরিয়া যুদ্ধের ফলে আমাদের ব্যবসায়ে মন্দা সম্পর্কে মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ করেক বছরের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বাবদ ব্যয় বেড়ে চলারই সম্ভাবনা আছে।"

পুঁজিবাদীদের মুনাফার পাহাড় আবার গড়ে উঠতে লাগল, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের দুর্গতির অবধি রইল না (১৯৫৯ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে ডলারের ক্রয়শক্তি ৪৪ শতাংশ হ্রাস পায়), করের বোঝা বাড়তে থাকে যার বেশির ভাগটাই বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকে, মার্কিন ধনিকরা সমস্ত মাল আটকে রেখে চড়া দামে বাজারে ছাড়তে থাকায় ভারতের ন্যায় উন্নতিকামী দেশগুলির শিল্পোন্নয়ন গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়।

শিল্পে জোয়ার বজায় রাখার ও অতি-মুনাফা লোটার আশায় সামরিক ব্যয় কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও বাড়িয়ে যাওয়া হল। ১৯৫০ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় কখনও চার হাজার কোটি ডলারের কম হয় নি। কিন্তু সামরিকীকরণের নীতি পুরোদমে অনুসরণ করেও ১৯৫৭-৫৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটকে এড়ানো গেল না। ১৯৫৭ সালের সংকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এই সংকটের ফলে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মোট উৎপাদনের বারো আনা যে সব দেশের হিস্যায় পড়ে সেই সব উন্নত পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদন হ্রাস পায়।

১৯৫৭-৫৮ সালের ব্যাপক সংকটের আভাষ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫৩-৫৪

সালের মন্দায়। সংকটকে ছোট করে দেখানোর উদ্দেশ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালের মন্দার মত সংকটগুলিকে "সাময়িক মন্দা" (রিসেসন) বা "মধ্যবর্তী সংকট" বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের মন্দার সূচনা হয় ১৯৫০ সাল থেকে। এই বছরের চতুর্থ পাদ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে রেফ্রিজেরেটর, রেডিও সেট ও কাপড় কাচার যন্ত্রের উৎপাদন যথাক্রমে ৫৯, ৩২ ও ২৫ শতাংশ হ্রাস পায়। সামরিক বাহিনীর বরাত সত্ত্বেও পশম শিল্পের উৎপাদন ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ২৬ শতাংশ হ্রাস পায়। জুতার উৎপাদনও ২৮ শতাংশ কমে যায়। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ১৯৫১ সালের ২৭ নভেম্বর "ওয়াল স্ট্রীট জার্ণাল"-এ চামড়ার জিনিসপত্র প্রস্তুতকারীদের জনৈক মুখপাত্র লেখেন যে, ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার সময়েও চর্মজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন এত বেশি হ্রাস পায় নি। কাঁচামালের অভাব বা অন্য কোন কারণে এই মন্দা দেখা দেয় নি, একমাত্র জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ার ফলেই এই মন্দা দেখা দেয়। এ সময় ফ্রান্সেও মন্দা দেখা দিয়েছিল।

১৯৫১-৫২ সালের আংশিক সংকট ১৯৫৩-৫৪ সালে পুরোপুরি মন্দার আকার ধারণ করে। এইভাবে চক্রবৎ আবর্তিত সংকট দেখা যায় ১৯৫৭-৫৮ সালে। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, ১৯২০-১৯২৯ সালের সংকট চক্র আবর্তিত হওয়ার সময় ১৯২৭ সালের মধ্যবর্তী সংকটকালে শুধু উৎপাদন স্থান হয়ে পড়েছিল এবং ১৯২৪ সালের সংকটের সময় উৎপাদন মাত্র ৬·৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮-৫৭ সালের সংকটচক্র আবর্তনকালে ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যবর্তী সংকটের সময় উৎপাদন ১০·২ শতাংশ হ্রাস পায়।

মধ্যবর্তী বা পূর্ববর্তী সংকটগুলির চরিত্র পুরোপুরি চক্রবৎ আবর্তিত সংকটের চরিত্রের মত না হলেও ১৯৫৭-৫৮ সালের সংকটকে একেবারে "খাঁটি" চক্রবৎ আবর্তিত সংকট বলা যায়। পরিষ্কারভাবেই শিল্পের জোয়ার চলার পরে শুরু হওয়া এই সংকট হল যুদ্ধোত্তর কালের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুতর সংকট। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সংকট চলে। এই সময় উৎপাদন ১৩·৭ শতাংশ হ্রাস পায়। মার্কিন সরকার বিভিন্ন খাতে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করে এই সংকট রোধের চেষ্টা করেন এবং পশ্চিম ইয়োরোপে সংকটের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে

কমন মারকেট বা বারোয়ারি বাজার গড়ে তোলে। অর্থনৈতিক সংহতির নামে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জোট বাঁধার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে বেনেলুক্স (বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ) নামক ছোট রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক জোট গঠনের মধ্যে দিয়ে। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি জোট গড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ইয়োরোপের উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কমন মারকেট গড়ে তোলে। এর ফলে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এবং অন্যদিকে কমন মারকেটভুক্ত পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মার্কিন সরকার বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে যুদ্ধসজ্জার খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করার ফলে অর্থনীতি আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়, কিন্তু ঊর্ধ্বগতি ঘটে ঢিমে তেতালায় এবং তার মেয়াদও হয় অস্থায়ী। প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিলেন: "১৯৫৮ সালের সাময়িক মন্দা থেকে আমাদের আরোগ্য লাভ হয়েছে রক্তশূন্য ও অসম্পূর্ণ। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন কখনই তার পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পায় নি।"

প্রেসিডেন্ট কেনেডির নির্মম স্বীকারোক্তির সত্যতা দু'বছর যেতে না যেতেই প্রমাণিত হল। ১৯৬১ সালেই সংকটের কালো মেঘ অর্থনৈতিক আকাশ ছেয়ে ফেলল। উৎপাদন ৭ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেল। ব্যক্তিগত বাড়িঘর নির্মাণ ৩২ শতাংশ কমে গেল। নতুন লগ্নী—ব্যবসা-বাণিজ্যের সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর ব্যারোমিটার—১৯৫৭ সালের তুলনায় ২১ শতাংশ হ্রাস পেল। বেকারের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৫ লক্ষ। ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালের সংকট অনেক মৃদু এবং অংশতঃ ১৯৫৭-৫৮ সালের সংকটের জের হলেও ১৯৬০-৬১ সালের সংকটকে ১৯৫৭-৫৮ সালের সংকট প্রক্রিয়ারই অংশমাত্র বলে মনে করা ভুল। এই সঙ্কট সবলে শুধু নতুন চক্রাবর্তনের বিরোধগুলির মীমাংসা করে নি, পূর্ববর্তী সংকট চক্রের অসমাপ্ত কাজগুলিও শেষ করেছে অর্থাৎ আগের সংকটে ধ্বংস হয় নি এমন পুরাতন উদ্বৃত্ত পুঁজির অন্ততঃপক্ষে কিছুটা অংশ ধ্বংস করেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের সংকট সম্পূর্ণ রূপ লাভ না করার ফলেই পরবর্তী জোয়ার অত স্বল্পস্থায়ী হয় এবং নতুন সংকট অত দ্রুত দেখা যায়।

কেনেডি বুকেও কিছু করতে পারে নি। একচেটিয়া পুঁজি তার নিয়ন্ত্র

ধারায় এগিয়ে চলেছিল। তাই, সংকট সমাধানের দাওয়াই হিসাবে ভিয়েতনামে শুরু হল ব্যাপকতর মার্কিন আগ্রাসন। এ ছাড়াও বিভিন্ন অ-সামরিক শিল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলেই এই বিনিয়োগ সম্ভব হয়। অর্থনীতিতে আবার ঊর্ধগতি দেখা দেয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামে যুদ্ধের প্রসার ঘটানোর ফলে রণসম্ভারের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়, সৈন্যবল বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে জোয়ার আসে। মার্কিন ধনপতিরা "স্থায়ী সমৃদ্ধির" স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

১৯৬৫ সালের প্রথম ৮ মাসে ১৯৬০ সালের প্রথম ৮ মাসের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট শিল্পোৎপাদন ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৬৫ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট জাতীয় উৎপাদন (জি এন পি) বৃদ্ধি পায় ৪·৬ শতাংশ। ১৯৬৪ সালে মুনাফা বেড়েছিল ১৪ শতাংশ, ১৯৬৫ সালের প্রথম ছয় মাসে মুনাফা লাফ দিয়ে আরও ২০ শতাংশ বাড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁপে ওঠে, লগ্নীর পরিমাণও খুব বেড়ে যায়, বেকারের সংখ্যাও কিছুটা হ্রাস পায়। ৮ বছরের মধ্যে ১৯৬৫ সালেই প্রথম ৫ শতাংশ বেকারের জায়গায় সরকারী হিসাবে ৪·৫ শতাংশ বেকার দেখানো হয় অর্থাৎ ·৫ শতাংশ বেকারের আবার কর্মসংস্থান হয়। কাজেই ধনপতিরা পুলকিত ও উল্লসিত হয়ে উঠবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? কিন্তু গোড়ায় গলদ! ১৯৬৪ সাল থেকেই জোয়ারের চরিত্র বদলে গিয়েছিল। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল প্রধানতঃ অ-সামরিক শিল্পগুলিতে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বেশির ভাগ ব্যয় সামরিক খাতে হলেও ব্যয় বাড়ে নি। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পুরোপুরি জোর পড়ল সামরিক ব্যয়ের উপর। মার্কিন সরকার বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনের নতুন স্তরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ভিয়েতনামে গণহত্যায় মেতে উঠলেন। এই কর্মনীতির সঙ্গেই অর্থনৈতিক কর্মনীতিকে খাপ খাওয়ানো হল। আগের যুদ্ধোত্তর সরকারগুলির মত ১৯৬৫ সালের মার্কিন সরকারও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ বাবদ ব্যয়কেই প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি রূপে গ্রহণ করলেন।

প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরাট যুদ্ধপ্রস্তুতি ধনপতিদের নৈরাজ্যপীড়িত মুখপত্র-

গুলিকে আশাবাদী করে তুলল। যে "ফরচুন" অর্থনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠেছিলেন সেই "ফরচুন" পত্রিকা বার্ষিক পাঁচশত কোটি ডলার হারে আগামী নয় মাসে অস্ত্রসজ্জা বাবদ প্রত্যাশিত ব্যয় নৈরাশ্যের অন্ধকার কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে "অতীব গুরুত্বপূর্ণ" বলে মন্তব্য করলেন। (ফরচুন, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)।

সমৃদ্ধি, বিপুল সমৃদ্ধি! আনন্দে মার্কিন ধনপতিরা আত্মহারা। কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্ববিরোধিতার বিষক্রিয়া। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা তাল রাখতে পারল না। শ্রমিকশোষণের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এই ব্যাপার ঘটল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সরকার মজুরী বেশি বাড়ানোর তীব্র বিরোধী হওয়ার এবং জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হল।

এরই সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল অবস্থা প্রতিকূল হয়ে ওঠার, ডলারের মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবোগতির লক্ষণগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল। এইসব লক্ষণ দেখেই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মারটিন ১৯২৯ সালের অনুরূপ সংকট আসন্ন হয়ে উঠছে বলে তাঁর ১ জুনের বক্তৃতায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বাবদ বিপুল ব্যয় আসন্ন সংকটকে কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখলেও শেষ পর্যন্ত পালে বাঘ পড়ল। ১৯৬৭ সালে দেখা দিল সাময়িক মন্দা যা চক্রবৎ আবর্তিত সংকটেরই পূর্বাভাস। এই মন্দা চরমে উঠল ১৯৬৯ সালে—রেফ্রিজেরেটর, টি ভি সেট প্রভৃতি বেশি দিন থাকার মত (ডুরেবল) ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমায় উৎপাদন হ্রাস পেল, খুচরা বিক্রি পড়ে গেল এবং বাড়িঘর তৈরি কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকল। **এই প্রথম পুঁজিবাদের ইতিহাসে যুদ্ধ ও মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকার অবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল।** সামরিক ব্যয় অভূতপূর্ব পরিমাণে বাড়িয়েও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকটের হাত থেকে রেহাই পেল না! ১৯৬৯-১৯৭১ সালে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল গড়ে বছরে ৮ হাজার কোটি ডলারেরও উপর। সংকটের প্রবল তরঙ্গ আছড়ে পড়ল অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও।

সংকটের ধাক্কাতেই ১৯৭০ সালের অন্তবর্তীকালীন কংগ্রেস নির্বাচনে রিপাবলিকান দল বহু ভোট হারালেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর জন্য মার্কিন সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

১৯৬৭ সাল থেকে যে সাময়িক মন্দা শুরু হয় তা চক্রবৎ আবর্তিত সংকটের রূপলাভ করে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তথা অন্যান্য সমস্ত পশ্চিমী দেশে অতি-উৎপাদনের এই সর্বশেষ সংকটের অবসান ঘটে ১৯৭১ সালে। কিন্তু এই ১৯৭১ সালেরই মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তরকালের প্রচণ্ডতম সংকটের সম্মুখীন হয়। প্রেসিডেন্ট নিকসন কঠোর জরুরীকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার ফলে শ্রমিক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষদেরই চরম দুর্গতি ভোগ করতে হয়। ১৯৭২ সাল থেকে বাজার আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ধনপতিরা আশ্বাসিত হয়ে ওঠেন এবং উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্যে ঊর্ধগতি চোখে পড়ে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ঊর্ধগতি প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে জাপান ও পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। জাপানী ও কাঁচা মালের দাম বাড়ায় উন্নতিকামী দেশগুলির আয় বেড়ে যায় এবং তারা দুনিয়ার বাজারে শিল্পজাত পণ্যসমূহের বড় খরিদ্দার হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে চাহিদা বেড়ে যায়। আবার পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতারা আশাবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এবার "ফরচুন" প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে ভিন্ন সুর শোনা যায়। "ফরচুন" স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বহু দশকের মধ্যে অর্থনৈতিক চেহারা এত খারাপ আর কখনও হয় নি।

কথাটা ঠিক, কারণ অর্থনৈতিক ঊর্ধগতির সময়েই আসন্ন ঝড়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক দিকবলয়ে। মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাজগতে অবিরাম আলোড়ন সংকটের ঝড়কে ঘনিয়ে তুলেছে। এরই সঙ্গে দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে উদ্ভূত "শক্তি সংকট" এবং "কাঁচামালের সংকট"। সব মিলে এমন একটা জট পাকিয়েছে যা খোলার সাধ্য পুঁজিবাদের নেই।

১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালেই বুঝতে পারা যায় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ঊর্ধগতির দম ফুরিয়ে এসেছে। বৃদ্ধির হার পড়ে গেছে এবং অর্থনৈতিক

তৎপরতার দুটি প্রধান উপাদান—স্থায়ী পুঁজির পুনর্নবীকরণ এবং ক্রেতাদের চাহিদার প্রসার (বিশেষ করে স্থায়ী ভোগ্য পণ্যসমূহের চাহিদা) কমে গেছে। অন্যদিকে পাইকারি ও খুচরা দর বেড়েই চলেছে, ঋণের বাজারে চাপ পড়ছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সংগ্রাম তীব্রতর আকার ধারণ করছে। আরব দুনিয়া তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় পশ্চিমী দেশগুলিতে শক্তি সংকট গুরুতর আকার ধারণ করেছে (অবশ্য, এই মূল্য বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া তৈল-পুঁজি)। এই সব ঘটনার ফলে ১৯৭৩ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন (জি এন পি) ও শিল্পোৎপাদনের হার দারুনভাবে পড়ে গেছে।

এই অবস্থায় পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মহামন্দার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) ডিরেক্টর জেনারেল ফ্রানসিস ব্লানচার্ড বিশ্বব্যাপী আসন্ন এক মহামন্দা সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আই এল ও-র হিসাবে জানা যায় যে, সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এখন বেকারের সংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ এবং আধা-বেকারের সংখ্যা ৩০ কোটি। ১৯৭৪ সালে মহামন্দা কি রূপে ও কিভাবে দেখা দেবে তা আমরা প্রত্যক্ষ করব এবং তার ধাক্কাও আমাদের সামলাতে হবে এবং ইতিমধ্যেই হচ্ছে। কিন্তু এই মহামন্দা সম্পর্কে এখন কোন্ বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে যে চক্রবৎ আবর্তিত সংকটের আকারে এই মহামন্দার আবির্ভাব ঘটতে চলেছে যুদ্ধোত্তর কালের সেই সংকট চক্রগুলি অনুধাবন করা দরকার। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধোত্তর সংকটগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, চক্রবৎ আবর্তিত সংকটগুলি যুদ্ধোত্তরকালে আগের তুলনায় দুর্বল হয়ে গেছে অর্থাৎ সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি হ্রাস পেয়েছে এবং পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের চক্রাবর্তনের বিকার ঘটেছে। ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার পর সংকট আগের মত নিয়মিতভাবে দেখা দিচ্ছে না এবং এর ধাক্কাও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এর কারণ কি ?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির হস্তক্ষেপ এর একটা বড় কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নিয়ত তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এই প্রতিযোগিতায় বর্তমানে বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে।

নতুন যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হচ্ছে, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই অবস্থায় কোন শিল্পসংস্থায় অপেক্ষাকৃত পুরাতন যন্ত্রাদি বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার জন্য, প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য অতি-আধুনিক যন্ত্রাদি ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করতে হচ্ছে। এবং চক্রবৎ আবর্তনের বা চক্রের বৈষয়িক ভিত্তি হল স্থায়ী পুঁজির পুনর্নবীকরণ এই কারণে স্থায়ী পুঁজির পুনর্নবীকরণই চক্রের আবর্তনকে সর্বাগ্রে প্রভাবিত করে। এ ছাড়া পুঁজি লগ্নীর চেহারাও বদলে গেছে। এখন চক্রের আবর্তন নির্ধারিত হচ্ছে অনুৎপাদক ক্ষেত্রে লগ্নীর বর্ধিত অংশ তথা স্থায়ী পুঁজিতে লগ্নীর দ্বারা। এর ফলে শুধু সংকটের আবির্ভাবকাল নয়, তার গভীরতাও প্রভাবিত হচ্ছে। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির উৎপাদন এবং ভোগ্য পণ্যসমূহের উৎপাদনের মধ্যে অনুপাতের পরিবর্তনের উপরেও চক্রাবর্তন নির্ভর করে।

৪

পুঁজিবাদের চক্রবৎ আবর্তিত সংকট সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা গেল সেগুলির ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র যন্ত্রের মাধ্যমে যে সব "সংকটরোধক" ব্যবস্থা অবলম্বন করছে সেগুলির কোন কোনটি এবং অন্যান্য কারণ পুঁজিবাদী সংকট চক্রের আবর্তনকে আংশিক ও সাময়িকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারটি ছোট করে দেখা ভুল হলেও মার্কস-বর্ণিত সংকট পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে একথা মানতেই হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদ চক্রাবর্তিত সংকট রূপ রোগের প্রতিষেধক বা রোগ উপশমের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করছে তার ফলে রোগের অন্যান্য উপসর্গ আরও তীব্র ও জটিল হয়ে উঠছে। ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, অর্থসংকট, বেকারসমস্যা প্রভৃতি উপসর্গ এখন মূল রোগের চাইতেও ধনপতিদের বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের বর্তমান অবস্থায় চক্রাবর্তিত অর্থনৈতিক সংকটের বিকার ঘটা (ডিফরমেশন) স্বাভাবিক এবং অনিবার্য।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট চলাকালে যে সব নতুন পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি হল : বিশ্বসমাজবাদী ব্যবস্থার আবির্ভাব ও প্রসার, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন, শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজিবাদের বৃদ্ধি, অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব। এইসব পরিবর্তন স্বভাবতঃই চক্রাবর্তিত সংকটগুলিকে প্রভাবিত করছে।

চতুর্থতঃ আজকের দিনে পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকটের বাস্তব অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করছে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদ। আত্মরক্ষার জন্যই তাকে এই কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু এর ফলে পুঁজিবাদের সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হওয়ায় সংকট আরও জটিল ও তীব্র হয়ে উঠছে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আপনা থেকেই পুঁজিবাদ অনিবার্যভাবে ভেঙ্গে পড়বে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিল্পের বৃদ্ধি থেমে যায় নি, কিন্তু আমরা দেখছি সম্প্রসারিত পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের বিরোধগুলি দারুণভাবে বেড়ে গেছে, পুঁজিবাদী বিকাশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অ-স্থিতিশীলতা বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে এই অ-স্থিতিশীলতা প্রকাশ পাচ্ছে অর্থনৈতিক কাজকর্মের অবিরাম ও হুড়মুড় করে ওঠা-নামায়, বিশৃঙ্খলভাবে পর পর স্বল্পস্থায়ী জোয়ার ও মন্দার আবির্ভাবে, উৎপাদনের অ-সমান এবং আকস্মিক ও প্রচণ্ড প্রকৃতির দ্রুত তীব্র হয়ে ওঠায় এবং ঘন ঘন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে।

"প্রতিদিন সংকটগুলি বহুগুণিত হচ্ছে। প্রতিদিন তাদের সমাধান আরও কঠিন হয়ে উঠছে···ঘটনা-প্রবাহ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সময় আমাদের বন্ধু হয় নি।"—বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিহত প্রেসিডেন্ট কেনেডি। পুঁজিবাদের প্রকৃত চরিত্র উপলব্ধি করেছিলেন বলেই হয়তো প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

৫

যুদ্ধোত্তর সংকটগুলির বিশেষ লক্ষণসমূহের জন্যই সংকটের ফলাফলের বিরুদ্ধে মেহনতি জনগণের সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে সংকট বিরোধী কর্মসূচী রূপায়িত করতে হবে,

কিন্তু তার অর্থ সংকটের নিয়মকে অতিক্রম করা নয়। কারণ, শুধু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেই তা করা সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতি জনগণকে লড়তে হবে সংকটের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পুঁজিবাদী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের নির্দেশে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে সরকারেরা বৃহৎ শিল্পপতি ও ধনপতিচক্রের (ফিনান্স অলিগার্কি) স্বার্থরক্ষার্থেই সংকট-নিরোধক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এইসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুঁজির আরও কেন্দ্রীকরণের এবং ব্যক্তিগত মালিকানা চিরস্থায়ী রাখার দিকে নজর রেখেই অবলম্বিত হয়। এখানে যুদ্ধোত্তর সংকটগুলির একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এইসব সংকটে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের গায়ে এতটুকুও আঁচড় লাগে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যে সব সংকট দেখা গিয়েছিল সে সব সংকটে বড় বড় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লালবাতি জ্বালা ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর কালেও হাজার হাজার পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে, কিন্তু এগুলির বেশির ভাগই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান। বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কোন ঘটনাই ঘটে নি। এখন বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংকটকালে অর্থের ভাবনা ভাবতেই হয় না। রাষ্ট্র তার ধনভাণ্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে। যুদ্ধোত্তর সংকটগুলিতে মুনাফা কমে যাওয়ার ভাবনাও বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ভাবতে হয় নি এবং শেয়ার বাজারে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় নি (অন্ততঃপক্ষে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত)। সরকারী হিসাবে বড় বড় কোম্পানীর মুনাফা সামান্য কমেছে বলে দেখানো হলেও আসলে মুনাফা একটুও হ্রাস পায় নি, কারণ বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে থাকে নানাভাবে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ গোপন মুনাফা। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা বজায় রাখা হয় জনসাধারণের ঘাড় ভেঙ্গে। সংকট-কালে সরকারের সাহায্যেই একচেটিয়া দর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে যায়, বেকারের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে যায়। শুধু বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই যুদ্ধোত্তর কালের জোয়ারের সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেহনতি জনগণের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ শত

থেকে ৮ শত কোটি ডলার। ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের সংকটকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারি বাবদ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায়, যথাক্রমে ১২০৪ কোটি ও ১৯৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার অথবা বার্ষিক মজুরী তহবিলের ৬·৪ ও ৮·৭ শতাংশ। ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার সময় ছাড়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের এত ক্ষতি আর কখনও সহ্য করতে হয় নি। তাই, সংকটের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজস্ব কর্মসূচী অনুসারে লড়তে হয়। এই কর্মসূচী পুঁজিবাদকে জোড়াতালি দিয়ে টিঁকিয়ে রাখার কর্মসূচী নয়। এই কর্মসূচীর মূল কথা হল **একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই**। এই লড়াই-এর উদ্দেশ্য হল মেহনতি জনগণের স্বার্থে জাতীয় আয়ের একটা অংশ পুনর্বণ্টন করা, সংকট-বিরোধী ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের জন্য শিল্পসংস্থাগুলিকে (ট্রাস্ট) টাকার থলে খুলতে বাধ্য করা এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অবাধ্য কার্যকলাপ বন্ধ বা সীমিত করা এবং এইভাবে জাতির জীবন থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চিরতরে বহিষ্কৃত করার পথ প্রশস্ত করা।

একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য বিরহিত সমসাময়িক পুঁজিবাদের কথা ভাবাই যায় না। একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই সমগ্রভাবে পুঁজিবাদকেই আঘাত করে এবং তার জায়গায় নতুন সমাজব্যবস্থা গড়নের পথ প্রশস্ত করে।

পরিশিষ্ট

(পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১৮২৫-১৯৩৯)

পুঁজিবাদী সমাজে অতি-উৎপাদনের চক্রাবর্তিত সংকট ৮ থেকে ১০ বছর অন্তর দেখা দিত নিয়মিত ভাবে। পুঁজিবাদী পথ অনুসরণকারী কোন দেশই এই সংকট থেকে রেহাই পায় নি, এখনও পায় না। তবে প্রত্যেক সংকটের ধারা, আকার ও বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ দেশের বিকাশের নির্দিষ্ট অবস্থাগুলির উপর।

পৃথিবীতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল প্রথমে ব্রিটেনে, তাই, ব্রিটেনেই

সংকটের প্রকোপ প্রথম চোখে পড়ে। ব্রিটেনে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় আংশিক সংকট দেখা দেয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ১৮২৫ সালে প্রথম ব্রিটেনের অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সংকটের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৮৩৬ সালে ব্রিটেনে যে সংকট দেখা দেয় তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৭-৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ব্রিটেন ও ইয়োরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে যে সংকট দেখা দেয় তাকে মূলতঃ প্রথম বিশ্বসংকট বলে অভিহিত করা যায়।

১৮৫৭ সালের সংকট ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর যথাক্রমে ১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৮২ এবং ১৮৯০ সালে চক্রাবর্তিত সংকট দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে ১৮৭৩ সালের সংকট সবচেয়ে গুরুতর এবং উল্লেখযোগ্য। এই সংকটকালেই প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনীতির একচেটিয়া পুঁজিবাদে উত্তরণ শুরু হয়।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও পরে ১৯০০-০৩ (এই সংকট শুরু হয় রুশিয়ায় এবং এর ধাক্কা সবচেয়ে বেশি লাগে রুশিয়াতেই), ১৯০৭, ১৯২০-২১, ১৯২৯-৩৩, ১৯৩৭-৩৮ সালে সংকট দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে ১৯২৯-৩৩ সালের সংকটই সবচাইতে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ১৯২৯-৩৩ সালের সংকট এক বিশেষ ধরনের মহামন্দা (a special type of depression)। এই মহামন্দার পর পুঁজিবাদী দুনিয়ার উৎপাদন ১৯২৯ সালের স্তরের সামান্য উপরে উঠতে পেরেছিল। ১৯৩৭ সালে পর পুনরুজ্জীবন ও জোয়ার তিন বৎসরকাল স্থায়ী হতে না হতেই ১৯৩৩ সালের আবার সংকট দেখা দেয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৯২৯-৩৩ সালের মহামন্দার পর আর আগের মত ষোল আনা পুনরুজ্জীবন ঘটে নি এবং পুরো জোয়ারও আসে নি। এই সময় ফ্যাসিজম-এর উদ্ভব হয় এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয় পুরোদমে। ১৯৩৭ সালের সংকটের ধাক্কা জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি-ফ্যাসিস্ট দেশগুলিকে সামলাতে হয় নি, কারণ তখন ঐসব দেশে সমরসজ্জার জন্য বিপুল ব্যয়ের ফলে শিল্পে ও ব্যবসাবাণিজ্যে জোয়ার এসেছিল। ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যুদ্ধসজ্জায় মেতে ওঠে। এই ভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়া মহাযুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সংকটের অবসান ঘটায়।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য

সত্য রায়

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আজ দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বিপর্যয় ঘটলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙনকে ত্বরান্বিত করছে। এটা সম্ভব হচ্ছে এই জন্য যে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরোত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের স্রোতধারায় মিলিত হচ্ছে। আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মূল নিয়ামক শক্তি হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই আজ সাফল্য লাভ করতে পারে না, এটা ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন প্রেরণা লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়েছে। ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার এসেছে। ঔপনিবেশিক দেশগুলির অধিকাংশই আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। প্রায় আশিটি দেশ আজ ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে মুক্ত।* কিন্তু ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে মুক্ত হলেও সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায় নি ; বরং তা বেড়েই চলেছে। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেমে যায় না ; তা এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে, যার গতি হল অর্থনৈতিক অধীনতার

* The World Communist Movement, p-104.

নাগপাশ থেকে মুক্তি, যার গতি সামাজিক মুক্তি অর্জন করার দিকে। এই দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন শক্তি বিশেষ করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের উপর।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আশু লক্ষ্য ও চরম লক্ষ্য

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দুটি লক্ষ্য থাকে— (১) রাজনৈতিক মুক্তি, (২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আশু লক্ষ্য হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে সামাজিক প্রগতির পথে পদক্ষেপ সম্ভব নয়। আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেই সামাজিক প্রগতি অর্জন করা যায় না। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে যার লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন। কোন পথে এই মুক্তি অর্জন সম্ভব? এই প্রশ্নটা দ্বিতীয় স্তরে প্রধান হয়ে ওঠে। আজ ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগ। ধনতান্ত্রিক পথে অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের যুগে ধনতন্ত্র ছিল প্রগতিশীল তা হল তার অভ্যুত্থানের যুগ; কারণ সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ সাধন ছিল সেই যুগের মর্মবস্তু। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় প্রবেশ করলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতনের যুগ শুরু হয়ে যায়, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন প্রলেতারিয় বিপ্লবের শক্তিগুলি ও জাতীয় আন্দোলনের শক্তিগুলি একটা বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় এসে মিলিত হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র যদিও শ্রমিক বিপ্লবের চরিত্র নয় এবং যদিও এ বিপ্লবে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি অংশগ্রহণ করে, তবুও এ আন্দোলন হল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ এবং ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে জগৎজোড়া উত্তরণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে পড়ে।* বর্তমান ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে জাতীয় মুক্তি

---

* K. I. Zarodov : New Stage in the N. L. M. Problems of Anti-Imperialist Unity. International Theoretical Conference : W. M. R. November, 1972.

আন্দোলনে ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত প্রবেশ করছে। কিন্তু যেহেতু সদ্যস্বাধীন দেশগুলি এখনও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলি (বিষয়গত ও বিষয়ীগত) এখনও প্রস্তুত হয় নি, সেই হেতু তাদের পক্ষে সমাজতন্ত্রে সরাসরি উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটা সাধারণ গণতান্ত্রিক চরিত্র থাকে এবং এই আন্দোলনে বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলি তাদের বিভিন্ন, এবং প্রায়ই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-লক্ষ্য নিয়ে একত্রিত হয়। তাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সমাধা করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া।

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর যেসব দেশে জাতীয় বুর্জোয়ারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব দেশ আজ ধনতান্ত্রিক পথের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সমাধা করতে সচেষ্ট। এইসব দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে তারা ধনতান্ত্রিক পথের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করতে পারছে না বা সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতাও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কারণ ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে এবং এইসব দেশেও ধনতন্ত্র জাতীয় পুনর্জীবনের ভিত্তি হতে পারে না।*

সুতরাং সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জনগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারছেন যে ধনতান্ত্রিক পথের মাধ্যমে তাঁদের সামাজিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয় এবং এ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হবে এক দীর্ঘমেয়াদী যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া। তাই ধনতান্ত্রিক পথের বিকল্প, অধনতান্ত্রিক পথই যে আজ প্রকৃত সামাজিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে আসতে পারে এবং এ পথই যে আজ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য পরিবেশ রচনা করবে—এ সত্য আজ এশিয়া ও আফ্রিকার তরুণ রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

---

* S. R. Rashidov: Leninism, the Banner of Liberation and Progress of Nations. p-109: 'Capitalism is doomed. It has no future, either 'at home'—in the capitalist countries, or in the Third world, where it is still under-developed but at the sametime shows signs of senility.

মার্কস-এঙ্গেলস ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্রোতধারার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ জন্ম নিয়েছে পুঁজিবাদী সমাজে। ইউরোপে যে শ্রমিকশ্রেণী জন্ম নিচ্ছে, তাদের পক্ষে এই মতবাদ প্রয়োজনীয় হলেও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কৃষি প্রধান দেশগুলির ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। তাঁদের মতে মার্কসবাদ হল আসলে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ এবং এই মতাদর্শ লেনিনের সময় কৃষকশ্রেণীর স্বার্থে কৃষি প্রধান দেশগুলিতে জোর করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে।*

এই বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে এশিয়া ও আফ্রিকায় মার্কসবাদের প্রভাব খর্ব করা।

চীনের নেতারাও মার্কসবাদ-লেনিনবাদী শিক্ষার মর্মবস্তু, প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকবাদকে বর্জন করে এইসব সাম্রাজ্যবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের হাত শক্ত করছেন। 'ধনী' দেশ ও 'দরিদ্র' দেশ বা 'বিশ্ব শহরাঞ্চল' ও 'বিশ্ব গ্রামাঞ্চলের' মধ্যের দ্বন্দ্ব হল আজকের যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব এবং সর্বজনীন কৃষক-বিপ্লবই হল আজকের এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি—তাঁদের এইসব তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের মতাদর্শগত অবস্থানকেই শক্তিশালী করছে। এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্যতম ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হল যে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের মধ্যের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যকে প্রথম আবিষ্কার করেন।

প্রথম আন্তর্জাতিকের অন্যতম মহান লক্ষ্য ছিল নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করা। প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্যতম

---

* G. F. Kim & F. I. Shabshina : Proletarian Internationalism and Revolutions in the East, p-10—11

গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে-কোন ধরনের জাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। কারণ মার্কস-এঙ্গেলস মনে করতেন যে জাতীয় মুক্তি হল সামাজিক মুক্তির পূর্বশর্ত। কোন জাতি নিজে স্বাধীন হতে পারে না যতক্ষণ সে অন্য জাতিকে শোষণ করে—এই নীতিই হল নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের সাথে বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের সংহতির একটা মূল দিক। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে মার্কস লেখেন, "ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণ স্বার্থেই আয়ার্ল্যাণ্ডের সাথে তাদের বর্তমান সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন···আয়ার্ল্যাণ্ডকে ছেড়ে না দিলে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী কখনোই কোন কিছু অর্জন করতে পারবে না।"* অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটি আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নটির সাথে জড়িত।

মার্কস-এঙ্গেলস প্রাচ্যের মুক্তি আন্দোলনগুলির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন, এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিটি ঘটনার প্রতি তাঁরা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। মার্কস ঔপনিবেশিকতা সংক্রান্ত রচনাবলীতে দেখিয়েছেন যে এশিয়ার প্রাচীন সমাজের জড়ত্ব ভেঙ্গে বৃটিশ শাসন ঐ সমাজে অগ্রগতির বস্তুগত ভিত্তি স্থাপন করেছে। ঐ গতিশীলতার ফল হল তার শোষণের পরোক্ষ ফল। যতদিন না পর্যন্ত পরাধীন জাতি ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে মুক্ত হবে বা ঐ শোষক-দেশের শ্রমিকশ্রেণী শোষকদের উচ্ছেদ করবে ততদিন পরাধীন দেশের জনগণ ঐ ফল নিজেদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে না। সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতা হল পরাধীন জাতির অগ্রগতি ও বিকাশের প্রথম পূর্বশর্ত। এই প্রসঙ্গে মার্কস তার 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল' প্রবন্ধে লেখেন: "খাস বৃটেনেই যতদিন না শিল্প-কারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসকশ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এইসব নতুন সমাজ উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না।"**

মার্কস সিপাহী বিদ্রোহের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চরিত্রটি প্রথম তুলে

---

* Marxism and Asia, p-121

** ঔপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পৃঃ-৯০

ধরেন। ১৮৫১-১৮৬৪ সালের তাইপিঙ বিদ্রোহ যে একদিকে চীনে সামন্ত-তন্ত্রের সংকটের প্রতিফলন ও অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তা মার্কস তার লেখায় প্রথম দেখান। মার্কস 'চীনে ও ইউরোপে বিপ্লব' প্রবন্ধে তার এই তত্ত্বটির রূপরেখা তুলে ধরেন যে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও প্রাচ্যের কৃষকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম পারস্পরিক যুক্ত।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের নীতি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে যখন মার্কস ও এঙ্গেলস পশ্চাদপদ জাতিগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সহজ পথের প্রশ্নটি তুলে ধরেন। পশ্চাদপদ জাতিগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অধনতান্ত্রিক পথের ধারণা তাঁদের রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যেসব দেশ পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরে পৌঁছায় নি, ও সেখানে জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর কোন অভ্যুদয় ঘটে নি, পুঁজিবাদী বিকাশের যন্ত্রণাময় স্তর এড়িয়ে সেই সব দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করেছিলেন।

সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশ সাধন করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করেছেন যে, সমগ্র মানবজাতিকে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশের স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এবং স্তরসমূহের কোন একটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা দেখিয়েছেন যে যদি সমাজ তার বিকাশের সাধারণ নিয়ম বুঝতে পারে তাহলে সে তার জন্ম-যন্ত্রণাকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কমাতে পারে।*

কাউটস্কির নিকট একটি চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছেন: "একবার যদি পুনর্গঠিত হয় ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা তবে তাতেই এমন প্রকাণ্ড শক্তি ও এমন দৃষ্টান্ত মিলবে যে অর্ধ-সভ্য দেশগুলি নিজেরাই তার পিছু ধরবে, অন্তত অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই তার ভার নেবে।"** অবশ্য মার্কস-এঙ্গেলস অ-ধনতান্ত্রিক পথের স্তরগুলি কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন নি। কারণ তাঁদের সময় ঐ পথের বাস্তব অবস্থা বর্তমান ছিল না। কিন্তু তাঁরা ঐ পথের সম্ভাবনার কথা বলে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে লেনিন ঐ তত্ত্বের বিকাশ সাধন করেন ও বাস্তবে তার সফল প্রয়োগ করেন।

---

* Capital, Vol-I Preface to the First German Edition.

Engels to Kautsky: On Colonialism, p-340.

যাইহোক, মার্কস-এঙ্গেলস এটা প্রথম তুলে ধরেছিলেন যে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব অবশ্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে ঐক্য স্থাপন করবে এবং এই ঐক্যই পশ্চাদপদ দেশগুলির মুক্তির গ্যারান্টি। এবং তাঁরা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংঘটিত বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহায়তায় পশ্চাদপদ দেশগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখেছিলেন।

লেনিন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

মার্কস ও এঙ্গেলস জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে রূপরেখা দিয়ে গিয়েছিলেন লেনিন পুঁজিবাদের এক নতুন স্তরে তার বিকাশ সাধন করেন ও তাকে সুস্পষ্ট রূপ দেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বগুলি সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত।

সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর। সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত দেশগুলিকে পুঁজিবাদের আবর্তে টেনে নিয়ে এসেছে। ফলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রাচ্যের জাগরণ শুরু হয়েছে। রাশিয়ার ১৯০৫-৭ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এই জাগরণকে অনুপ্রাণিত করেছে। লেনিন লিখেছেন "বিশ্ব পুঁজিবাদ ও রাশিয়াতে ১৯০৫ সালের বিপ্লব অবশেষে এশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে, কোটি কোটি নিপীড়িত ও অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন জনগণ মধ্যযুগীয় স্থাবরত্ব থেকে এক নতুন জীবনে জেগে উঠেছে এবং মৌলিক মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে।"* প্রাচ্যের এই জাগরণের অর্থ হল প্রাচ্যের জনগণের মধ্যে জাতীয় চৈতন্যের উন্মেষ।

লেনিন দেখিয়েছেন যে জাতীয় প্রশ্নে ধনতন্ত্রের দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতা আছে। প্রথম প্রবণতা হল জাতীয় জীবন ও জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ। এই প্রবণতা সমস্ত জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জাতীয় রাষ্ট্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। দ্বিতীয় প্রবণতা হল প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান বিকাশ। এই প্রবণতা জাতীয় প্রাচীরগুলি ভেঙ্গে

* V. I. Lenin. Coll. works Vol : 19. p-86.

দেয় এবং সাধারণভাবে পুঁজি, ও অর্থনৈতিক জীবন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির আন্তর্জাতিক ঐক্য সৃষ্টি করে।

এই দুটি প্রবণতা হল পুঁজিবাদের সর্বজনীন নিয়ম। প্রথম প্রবণতাটির প্রাধান্য থাকে পুঁজিবাদের সূচনায়; দ্বিতীয়টি হল পরিণত পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য যেখানে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জমি প্রস্তুত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবণতাটি সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রধান হয়ে উঠে।

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় বিপ্লবের স্তর অনেক আগে শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রাচ্য এই স্তরে প্রবেশ করেছে অনেক পরে। লেনিন তাঁর 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' প্রবন্ধে বিশ্বের দেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথমতঃ পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন—এই সব দেশে বহুদিন আগেই বুর্জোয়া প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব ইউরোপ : অস্ট্রিয়া, বলকান দেশগুলি এবং বিশেষ করে রাশিয়া। এখানে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটে এবং জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠে। তৃতীয়তঃ চীন পারস্য তুরস্ক প্রভৃতি আধা-উপনিবেশ দেশগুলি। লেনিন লিখেছেন—এই সব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় প্রায় শুরুই হয় নি, নয়ত, তার পরিসমাপ্তির এখনো অনেক দেরি।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি সামনে রেখে লেনিন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই দেশগুলিতে বিপ্লবের স্তর হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ এই দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আশু লক্ষ্য হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো সমাধা করা। এবং এই সব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক স্বার্থের সংঘাত হবে। ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে ও প্রাচ্যের জনগণ বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অংশীদার হবে। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন : "সামাজিক বিপ্লব কেবলমাত্র একটা যুগের রূপেই আসতে পারে, যে যুগে অগ্রসর দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের গৃহযুদ্ধের সাথে মিলিত হয় অনুন্নত, পশ্চাদপদ ও

নিপীড়িত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির সমগ্র ধারা।"*

সুতরাং সমাজতন্ত্রের জন্য জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও জাতীয় প্রশ্নে দৃঢ় বৈপ্লবিক কর্মসূচী পরস্পরবিরোধী নয়, এবং জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন হল জনগণের সামাজিক মুক্তির সাধারণ প্রশ্নের অঙ্গ। অতএব, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব হল জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শর্তহীন সমর্থন জানানো।

লেনিন জানতেন যে এই জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন পরবর্তীকালে সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে রূপান্তরিত হবে। ফলে এই সব দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চৌহদ্দি পেরিয়ে সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে ধনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেবে। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন: "এটা একেবারে সম্পূর্ণ সুপরিস্ফুট যে, বিশ্ব-বিপ্লবের আসন্ন চূড়ান্ত লড়াইসমূহে বিশ্বের অধিকাংশ জনসমষ্টির আন্দোলন গোড়ার দিকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে।"**

ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্র বিচার করে লেনিন নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদ ও নিপীড়ক জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক পার্থক্য টেনেছিলেন। তিনি লিখেছেন: "যে কোন নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক উপাদান থাকে যা শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং এই উপাদানকেই আমরা শর্তহীনভাবে সমর্থন জানাই।"*** এই দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিস্টদের প্রতি লেনিনের নির্দেশ ছিল যে এই সব দেশের কমিউনিস্টদের উচিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সমর্থন করা, এর সাথে সাময়িক মৈত্রীতে আবদ্ধ হওয়া; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন ভূমিকাকে তুলে ধরতে হবে। লেনিন এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল উপাদান সমর্থন করার সময় এর সামাজিক উপাদান ও সীমাবদ্ধতা ভুললে চলবে না; কারণ এই সব দেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ

---

* Lenin : Coll. Works, Vol. 23, p-60

** Lenin : Report on the Tactics of the R. C. P. July 5, 1921 (Coll. Works Vol-32)

Lenin : Coll. Works, Vol-20. p-412

দিলেও, এরা সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষও করে। এই প্রক্রিয়াটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে লেনিন লিখেছেন—"শোষক দেশগুলির বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশগুলির বুর্জোয়াদের এক ধরনের যোগসাজস হয়েছে যার দরুণ প্রায়শই—এমন কি সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে হাত মিলিয়ে কাজ করছে, অর্থাৎ সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে তারা একজোট হচ্ছে।"*

সুতরাং লেনিন জাতীয় স্বার্থের আবশ্যিক শর্ত হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের নিয়ে এক ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মূল কথা হল এই ফ্রন্টে বিশালসংখ্যক জনগণের সমাবেশ। তিনি বলেন যে, এই সব দেশে কৃষক আন্দোলনগুলিকে বিশেষভাবে সমর্থন জানানো উচিত ও তাকে এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক রূপদান করা উচিত ; কারণ কৃষক হল জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ এবং এই কৃষকরাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রতিনিধি। "এটা সন্দেহাতীত যে, যেকোন জাতীয় আন্দোলন একমাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন হতে পারে কারণ পশ্চাদপদ দেশগুলিতে বিশাল জনসংখ্যা হল কৃষকরাই যারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রতিনিধি।"**

যাই হোক, লেনিন জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রশক্তি হিসাবে তুলে ধরেছিলেন শ্রমিক ও কৃষক ঐক্যকে। চিচেরিন (Chicherin) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থনের প্রশ্নে বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্যের প্রশ্নে লেনিনকে ভুল বুঝেছিলেন। তিনি বুর্জোয়া ও কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য টানতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই লেনিন লিখেছেন : 'I lay stronger emphasis on alliance with the peasantry (and the peasantry is not quite the same thing as the bourgeoisie)"*** আমি কৃষকদের সাথে মৈত্রীর উপর বেশি জোর দিয়েছিলাম (এবং কৃষক ও বুর্জোয়া এক নয়)"

সমস্ত রকম শোষণের নিশ্চিত পথ হল শ্রমিক-কৃষক ঐক্যকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমাবেত করা ও শ্রমজীবী জনতার ভূমিকা বৃদ্ধি করা। এই মৈত্রীই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে

* Lenin : Report of the Commission on the National and the Colonial Question.

** Ibid.

*** V. Y. Zevin : Lenin on the National and Colonial Question (Lenin the Great Theoretician, p-323)

নিয়ে যায়, সমস্ত রকম ঔপনিবেশিকতার অবসানকে নিশ্চিত করে ও সমাজতন্ত্রের দিকে স্থির ও অবিচলভাবে নিয়ে যায়।

জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত লেনিনের থিসিস নিয়ে আলোচনা চলাকালে লেনিন নিজেই 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' শব্দটির পরিবর্তে 'জাতীয় বৈপ্লবিক' শব্দটি বেছে নেন। এই দুটি শব্দের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, যে কোন জাতীয় আন্দোলনই মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন কারণ জাতীয় আন্দোলন হল প্রধানত কৃষক আন্দোলন। দ্বিতীয়ত তিনি ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্যের গুরুত্বও তুলে ধরেছিলেন। এই পরিবর্তন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ও লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ করেছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন থেকে সামাজিক বিপ্লবে উত্তরণ।*

অধনতান্ত্রিক পথের যে ধারণা মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাতে অস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় তা লেনিনের এই রিপোর্টে বিকাশলাভ করে। পশ্চাদপদ দেশগুলিতে যেখানে প্রাক্ পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রবলভাবে রয়েছে বা পুঁজিবাদের বিকাশ অত্যন্ত নিম্ন অবস্থায় রয়েছে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য ধনতান্ত্রিক বিকাশ অপরিহার্য নয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্ভব তাদের সামনে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই লেনিন লিখেছেন : "অগ্রগামী দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে অনুন্নত দেশগুলি ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরের মধ্য দিয়ে না গিয়েই···সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং বিকাশের কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমে পৌঁছাতে পারে।"** এই অধনতান্ত্রিক পথের পূর্বশর্ত হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটির উপর জোর দেন। এবং এই বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় কৃষক সমাজের মধ্যে অটুট ঐক্যই যে অধনতান্ত্রিক পথের বিকাশের গ্যারান্টি তাও তিনি তুলে ধরেন। লেনিনের নির্দেশ অনুসরণ করে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—"সবচেয়ে জরুরী কাজ হল কৃষক ও

* Ibid, p—325

** Lenin : Report of the Commission of the National and the colonial questions.

শ্রমিকদের এমন একটি কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলা যা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে নয়, উন্নত দেশগুলির সচেতন সর্বহারা শ্রেণীর পরিচালনায়, শ্রেণীচেতনার বিকাশের মধ্যে দিয়ে, পশ্চাৎপদ জাতিগুলি কমিউনিজমে উপনীত হবে।"* অতএব দেখা যাচ্ছে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য ছাড়া, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্ভব ছাড়া অধনতান্ত্রিক পথের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। এইভাবে লেনিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেন।

বর্তমান যুগে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

অ-ধনতান্ত্রিক পথ আজ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ধারণা নয়, তা আজ ঐতিহাসিক বাস্তব হয়ে উঠেছে। বর্তমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান মর্মবস্তু হল সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। এবং বেশ কয়েকটি দেশে এই মুক্তি আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয়বিধ শোষণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে। ইরাক, সিরিয়া, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, গিনি, বার্মা, মিশর প্রভৃতি আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি আজ ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে অধনতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। এই দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই সব দেশগুলিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রাধান্য রয়েছে বা পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি সবে শুরু হয়েছে। এবং এই সব দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি যারা ধনতন্ত্রকে সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে বর্জন করেছে। বিপ্লবী গণতন্ত্র পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রের বামপন্থী অংশ থেকে উদ্ভূত। এই জন্যই বিপ্লবী গণতন্ত্র বৃহৎ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে। এই বিপ্লবী গণতন্ত্র পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রের সেই অংশ যারা সমাজতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত বেছে নিয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও পেটিবুর্জোয়া সুলভ দোদুল্যমানতা দেখা যায়। যাই হোক, বিপ্লবী গণতন্ত্র মেহনতী জনতার স্বার্থে সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধন করে এবং এই পরিবর্তনের পথ হল বৈপ্লবিক পথ ; সংস্কার-বাদী পথ নয়। এই পরিবর্তনগুলি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ প্রস্তুত করে।

* G. Kim—Leninism and the National Liberation Movement.

বিপ্লবী গণতন্ত্রের মধ্যে দুটি প্রবণতা আত্ম-প্রকাশ করে। যদি বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা তাঁদের পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয়তাবাদী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সপক্ষে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে তাহলে বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে তাদের উত্তরণ ঘটবে। অন্যদিকে বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। আফ্রিকার অনেক কয়েকটি দেশে রাষ্ট্রশক্তি মধ্যস্তরের জনগণের হাতে। কিন্তু তারা এমন নীতি নিচ্ছে যা বিষয়গত ভাবে পুঁজিবাদের জন্ম দিচ্ছে যদিও তারা ধনতন্ত্র পরিহার করার মতাদর্শ প্রচার করছে ও আফ্রিকার নিজস্ব সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারণা প্রচার করছে।*

সমাজতন্ত্রের মূলশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। এই সব দেশে আর্থব্যবস্থায় অধনতান্ত্রিক পথের মূল ভিত্তি হল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র (state sector)। এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী জন্ম নিচ্ছে। এদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ভূমিকাই হল অধনতান্ত্রিক পথের বিকাশের গ্যারান্টি। যদি শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় না যায়, তা হলে এই দেশগুলির সমাজতন্ত্রমুখীন পথ থেকে সরে আসার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সাথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব দেশে কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ক্রিয়াকলাপের প্রগতিশীল পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করা এবং নেতিবাচক দিকগুলো সমালোচনা করা। এইসব দেশে জনগণকে সংগঠিত করে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের প্রভাবিত করতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন আদর্শগত ও সাংগঠনিক অবস্থানকে দৃঢ় করে তাদের উপর ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ছাপ ফেলতে হবে। এই ভাবেই শ্রমিকশ্রেণী এইসব দেশে নেতৃত্বের ভূমিকায় উন্নীত হবে। এই দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার এক দীর্ঘমেয়াদী পথ গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই সব দেশ হল বর্তমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রসর অংশ।**

লাতিন আমেরিকাতেও বিপ্লবী প্রক্রিয়া অত্যন্ত ত্বরান্বিত হচ্ছে। কিউবার বিপ্লব লাতিন আমেরিকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটা ভাঙন

---

* Social Science : No 1. 1973, p—103.

** Report of the 24th Congress of the C.P.S.U.

ধরিয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসমান বিকাশের ফলে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে লাতিন আমেরিকাতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া, যদিও তার গতি ঊর্ধ্বদিকে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গতিসম্পন্ন। কিউবা ছাড়া, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কৃষি-বিপ্লব তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো সমাধা করছে, আবার কয়েকটি দেশ সেই স্তরে প্রবেশ করেছে মাত্র। কিন্তু, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে ও বিপ্লবের চালিকাশক্তিগুলির সাংগঠনিক অবস্থা ও চেতনার দিক থেকে, বিপ্লবের অবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও, প্রত্যেক দেশে বিপ্লবের সাধারণ লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, অলিগার্কি-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম পর্বে অ-একচেটিয়া পুঁজির কোন কোন অংশ পপুলার ব্লকে যোগ দিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, অলিগার্কি বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম ক্রমশঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে এবং গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ প্রস্তুত করবে। আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে (১৯৬৯-এর মার্চে ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত) বলা হয়েছে যে তাদের দেশে বিপ্লবের লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সমাজতন্ত্রমুখীন বিপ্লব। উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টিও সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার দুটি স্তর হিসাবে মনে করে এবং এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে। মোটের উপর একথা বলা যায় যে, লাতিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও দেশীয় বুর্জোয়া ও অলিগার্কির শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের এক তীব্র ও দীর্ঘ সংগ্রামের স্তরে প্রবেশ করেছে। "গত পাঁচ বছরে লাতিন আমেরিকাতে বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশ ও বিস্তারের অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।"*

লাতিন আমেরিকাতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এই নতুন ও উন্নত পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল ব্যাপক জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সমস্ত প্রগতিশীল

* Latin America : Experience and Lessons of Revolutionary Struggle, W.M.R. May 1974.

শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এই ফ্রন্টে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও মধ্য বুর্জোয়া, এবং সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ। লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ হল এই যে লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশে শ্রমিকশ্রেণী যুক্তফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পেটিবুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্ক। শহরের ও গ্রামের পেটি-বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্রমশঃ বৈপ্লবিক অবস্থান গ্রহণ করছে।

লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সম্প্রতি জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছে। গণসংগ্রামের তীব্রতার ফলে ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের উপাদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় বুর্জোয়ার বৈপ্লবিক ভূমিকা কমে এসেছে। লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতে তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়াকে আজ আর বিপ্লবের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না যদিও কয়েকটি দেশে যে সব মধ্য বুর্জোয়ারা গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী তাদের সাথে কৌশলগত মৈত্রীর সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না।*

ভারতবর্ষেও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া গভীরতর হচ্ছে। আফ্রিকার ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের পার্থক্য হল যে এখানে পুঁজিবাদী বিকাশ মধ্যস্তর অবধি ঘটেছে। কিন্তু এখানেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরটি শেষ হয়ে যায় নি, কারণ এখানে বিপ্লবের চরিত্র হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু পুঁজিবাদের বেশ কিছুটা বিকাশ হওয়ার ফলে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বটাও পাশাপাশি বাড়ছে। ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রবণতা বাড়ছে।

বিপ্লবের সামাজিক শক্তিগুলির দিক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের তফাৎ হল এই যে ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক শক্তি হিসাবে দাঁড়ালেও শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অবস্থায় আসে নি। এবং জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশের সাম্রাজ্যবাদ-

* The World Communist Movement : p—349.

বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বৈপ্লবিক উপাদান নিঃশেষিত হয় নি। সুতরাং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জাতীয় বুর্জোয়ারাও যোগ দেবে। কিন্তু এই ফ্রন্টের কেন্দ্রশক্তি হবে শ্রমিক ও কৃষক ; কারণ এরাই হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দৃঢ় শক্তি এবং মেহনতী জনতার স্বার্থেই এই বিপ্লব পরিচালিত। জাতীয় বুর্জোয়া এই বিপ্লবের অংশীদার হলেও দ্বৈতচরিত্রসম্পন্ন। জাতীয় বুর্জোয়ার এই দ্বৈতচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখেই কমিউনিস্ট পার্টিকে তার রণকৌশল স্থির করতে হয় ; ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করতে হয়। এবং ভারতবর্ষে যেহেতু পুঁজিবাদের বেশ কিছুটা বিকাশ হয়েছে, সেহেতু ধনতান্ত্রিক পথ এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সমাজতন্ত্রে উত্তরণ করতে হলে ভারতবর্ষকে ধনতান্ত্রিক পথ পালটে দিয়ে এগোতে হবে। ধনতান্ত্রিক পথকে পালটে দেওয়াই হল ভারতবর্ষে অধনতান্ত্রিক পথের মর্মবস্তু।

মোট কথা, বিকাশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কি আরব ও আফ্রিকার দেশগুলিতে, কি লাতিন আমেরিকায়, কি ভারতবর্ষে একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই সব দেশে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি ধনতন্ত্রের পথ পরিহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এই সব দেশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটি সমাজতান্ত্রিক প্রবণতায় ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

লাতিন আমেরিকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ

ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বরাজনৈতিক মঞ্চের এক লক্ষ্যণীয় ঘটনা হল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি। কেবল যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার ঘটছে তাই নয়, এই আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র ও সংহতি রক্ষা করে বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত এবং আকৃতিকে স্ফীতকায় করছে। এর ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্রমাগত আঘাতে একদিকে যেমন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের প্রাণভোমরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মত লাতিন আমেরিকাতেও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করছে।

এশিয়ার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা সাম্রাজ্যবাদের কাছে যে কতখানি বেদনাদায়ক ছিল এবং একমাত্র ভরসাস্থল আফ্রিকা মহাদেশে যাতে এই জাতীয় বেদনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত সাংবাদিক জন গান্থার ১৯৫৫ সালে উল্লেখ করেছিলেন। আফ্রিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "বিশাল এবং শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র এই মহাদেশ (আফ্রিকা মহাদেশ—লেখক) পশ্চিমী দুনিয়ার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন, তার কারণ শুধু এই নয় যে এর অবস্থান সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন আর মহাদেশটা বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন বিভিন্ন কাঁচামালে ঠাসা, কারণটা এই যে, এটা হল আমাদের শেষ সীমান্ত। এশিয়ার অনেকটা খোয়া গেছে, আফ্রিকা রয়েছে।" (Inside Africa, New York, 1955, p 4 by John Gunther) কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এমনই অপ্রতিরোধ্য গতি এবং জাতীয় মুক্তিকামী রাষ্ট্রগুলির উপর তার এমন চুম্বকসম প্রভাব যে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ সাল প্রায়

দশ বছরের মধ্যে আফ্রিকার চৌত্রিশটি দেশের মানুষ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসে।

আফ্রিকার কাছ থেকে মুখের মত জবাব পেয়ে, জন গান্থারকে লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে কিছুটা পরিমাণে সতর্ক হতে দেখা যায়। তিনি ১৯৬৭ সালে লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যদিও সেখানকার ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে কিছুটা বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, তবুও তিনি সেটা করেছিলেন খুবই বিমর্ষবদনে। এটা ছিল রূঢ় বাস্তবতার এক বিমর্ষ স্বীকৃতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, "সাধারণতঃ আমেরিকাবাসীরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও, যে মনে করে গোটা দক্ষিণ আমেরিকা তাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান, আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়।" (Inside South America, New York, 1967 by John Gunther) কেন জন গান্থারের মধ্যে এই সংশয়? কেনই বা দক্ষিণ আমেরিকার সব কটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুকুমবরদার নয়? তিনি কি তাহলে সেখানকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে কোন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন যার জন্য তাকে এমন বিমর্ষ হতে বা বিলাপ করতে হচ্ছে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে কিছুটা আত্মসন্তুষ্টচিত্তে এবং কিছুটা সংশয় মিশ্রিত কণ্ঠে উপদেশ দিতে হচ্ছে? তিনি বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্ক মোটামুটি ভাল হলেও, একে আরও ভাল করা যায়।" (ঐ, পৃঃ ৬১৫)

জন গান্থার দক্ষিণ আমেরিকায় দেখেছিলেন—"এক যথার্থ প্রাক-বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে।" (ঐ, পৃঃ ৬০৫) তিনি আরও বলেছেন, "সম্ভাব্য বৈপ্লবিক প্রকাশ ও আন্দোলনের প্রধান তিনটি কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমত, জনসাধারণ তাদের বর্তমান দুঃখকষ্ট ও বঞ্চনা সহ্য করে চলবে না। দ্বিতীয়ত, স্বভাবতঃই, অলিগর্কি ও বিত্তবান শ্রেণী তাদের সুযোগ-সুবিধা বিনা লড়াইয়ে ছেড়ে দেবে না। তৃতীয়ত, চিলির ফ্রে'ই, পেরুর বেলান্দে এবং কলম্বিয়ার লেরাস রেস্ত্রেপোর ন্যায় সংস্কারবাদী সরকারগুলি, শম্বুকগতিসম্পন্ন, খুব বেশি 'ভদ্র' প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের দাঁত উপড়ে নিতে পারে অথবা তারা সংস্কারের মূল্য দিতে নাও পারতে পারে। (ঐ, পৃঃ ৬০৫)

শেষ পর্যন্ত জন গাস্তারের সংশয়ই বাস্তবে রূপ পেল। গত পাঁচ বছরে লাতিন আমেরিকা জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক্রমবিকশিত হয়ে এক অভূতপূর্ব অথচ অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। চিলির ক্রেঁই বা পেরুর বেলান্দে কেউই তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। বিপ্লবী সংগ্রামের গুণগত বিকাশে এবং তার অভূতপূর্ব বিস্তারে তাঁদেরকে হটে যেতে হয়েছে। কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য, চিলিতে গণঐক্য ব্লকের ক্ষমতাসীন হওয়া, পেরুতে প্রগতিশীল পরিবর্তন, পানামা খালের উপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ভেঙ্গে ফেলার জন্য পানামার জনগণের নির্ভীক সংগ্রাম, আর্জেন্টিনাতে অলিগর্কী শক্তির সাময়িক পরাজয়, উরুগুয়ে ও অন্যান্য দেশের উত্তাল বৈপ্লবিক সংগ্রাম ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লাতিন আমেরিকা জুড়ে এক সংগ্রামী পরিমণ্ডল তৈরী করেছে। এরই ফলে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পুরোন প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করার চেতনা আজ বাস্তব অভিব্যক্তিতে বিকশিত হচ্ছে। সেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, অলিগর্কী-বিরোধী, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক অভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে।

বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংগ্রামের এই অভিন্ন প্রক্রিয়া কেবল যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, প্রযোজ্য অন্য মহাদেশের সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রেও তবে লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সংগ্রামশীলতা তৃতীয় দুনিয়ার অন্য দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী এবং লক্ষ্যের প্রতি অভিমুখিনতায় স্পষ্ট।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষা

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে যেমন জড়িত রয়েছে যুগের প্রভাব, তেমনি তার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নটি এই প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। যুগের প্রভাবের অর্থই হচ্ছে যুগের মর্মবস্তু এবং তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রয়েছে যে শ্রেণী তার প্রভাব।

যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রেণী নির্ধারণের প্রশ্নটির গুরুত্ব লেনিনও উল্লেখ

করে গেছেন। এসম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমরা জানতে পারি না কত দ্রুততা ও কত সফলতা সহকারে একটি নির্দিষ্ট যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গতি প্রকৃতি বিকাশ লাভ করবে, কিন্তু আমরা জানতে পারি এবং জানতে হবে এক বা অন্য যে কোন যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রয়েছে কোন্ শ্রেণী যে সেই যুগের প্রধান বিষয়বস্তু, তার বিকাশের প্রধান গতিধারা, সেই যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করছে।" (Under a false flag— Lenin collected works, vol 21, p 145)

একটা যুগের কাঠামোতে সংঘটিত কোন ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুরুই করা উচিত প্রধান বিরোধ নির্ণয় করার মধ্যে দিয়ে। লেনিনের নির্দেশ হচ্ছে যে কোন ঘটনাকে সেই যুগের প্রধান বিরোধের আলোকে দেখা উচিত এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। ১৯২০ সালে লেনিন জাতীয় ও উপনিবেশ সংক্রান্ত রিপোর্টে এই বিষয়টির উপর জোর দিতে গিয়ে বলেন, "যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এটা মনে রাখছি, ততক্ষণ আমরা কোন জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যাবলী, তা বিশ্বের যে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলেই ঘটুক না কেন, সঠিকভাবে ধরতে পারব না। সভ্য ও পশ্চাদপদ দেশগুলিতে, সমভাবেই, কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক সমস্যাবলীকে সঠিকভাবেই ধরতে ও সমাধান করতে পারে কেবলমাত্র তখনই যখন তারা এই সূত্র ধরে এগোয়।" (Lenin's report of the commission on the national and colonial qnestions, collected works, vol 31, p 241।) অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নটি বিচার করার সময় বিশ্বজোড়া প্রধান বিরোধকে উপেক্ষা করা যায় না।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে অবস্থিত একটা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে তার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথকে যে প্রশস্ত করতে পারে, লেনিন তারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের প্রক্রিয়ায় তাকে যে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে, এমন ধারণাকে তিনি খণ্ডন করেছেন। লেনিন ১৯২০ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বলেন, "যে সব অনুন্নত দেশ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে এবং যাদের মধ্যে যুদ্ধের পর থেকে প্রগতির পথে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে,

সেই সব দেশকে অর্থনৈতিক বিকাশের ধনতান্ত্রিক পর্যায়টির ভেতর দিয়ে যেতেই হবে এই দাবীকে কি আমরা সঠিক বলে ধরে নেবো ?···যদি বিজয়ী বিপ্লবী সর্বহারা এদের মধ্যে [redacted] প্রচার চালাতে পারে এবং সোভিয়েত সরকারগুলি তাদের সর্বপ্রকার সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে তা হলে অনুন্নত জাতিসমূহকে অনিবার্যভাবে বিকাশের ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতেই হবে একথা ভাবা ভুল হবে।···উন্নত দেশগুলির সর্বহারার সহায়তায় অনুন্নত দেশসমূহ ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়েই সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং বিকাশের কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে কমিউনিজম্-এ পৌঁছতে পারবে" (Lenin's report of the commission on the national and colonial question, to the second congress of the Communist International, collected works, vol 31, p 244) লেনিন দেখিয়েছিলেন যে সমগ্র বিশ্বের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সাফল্য বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মিলিত কর্মধারার উপর নির্ভরশীল হবে।

লেনিনের এই সূত্রগুলির উল্লেখ করা হল এই কারণে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নের সঙ্গে এগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সূত্রগুলির সারসংক্ষেপ হচ্ছে (ক) যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রেণী নির্ধারণ (খ) সেই যুগের প্রধান বিরোধের আলোকে জাতীয় ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিচার এবং (গ) বিজয়ী বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর সাহায্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উত্তরণের প্রশ্নটির সঙ্গে যুগদৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী জড়িয়ে আছে, এটাই হল লেনিনের শিক্ষা। কেবলমাত্র উত্তরণের প্রশ্ন নয়, উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সংঘটিত যে কোন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় ঘটনাকে যুগনিরপেক্ষ বা শ্রেণীনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার না করার কথাও, লেনিন তুলে ধরেছিলেন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লব থেকে প্যারী কমিউন অর্থাৎ ১৭৮৯ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ। এই যুগের প্রধান বিরোধ ছিল—অপসৃয়মান সামন্তবাদের সঙ্গে ভাবমান পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব। এই যুগের প্রধান শক্তি ছিল নবজাগ্রত বুর্জোয়াশ্রেণী।

প্যারী কমিউন থেকে নভেম্বর বিপ্লব অর্থাৎ ১৮৭১ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে দ্বিতীয় যুগ। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তর সাধন এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা নিঃশেষিত এবং তৎপরিবর্তে এক প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রে রূপান্তর। এই যুগকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী যুগ।

১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর থেকে শুরু হয় তৃতীয় যুগ। এই যুগের প্রধান বিরোধ হল—পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। এই যুগের প্রধান শক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। এই যুগকে বলা হয় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্র একটি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আরো ব্যাপ্তিলাভ করে এবং এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়। এই সমাজব্যবস্থাই যে বিশ্বের প্রতিটি ঘটনার নির্ধারক শক্তি এটি ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়। সেখানে বলা হয়, "বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।" ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলন আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করেছে, "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।" অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে শুরুতে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রমিকশ্রেণীর যে শক্তি ও ভূমিকা ছিল, এখন সেটি আরও বলীয়ান ও নিয়ামক হয়েছে। এ যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা কি পরিমাণে বেড়েছে ১৯৬৯ সালের মহাসম্মেলন তার উল্লেখ করেছে, "পুঁজিবাদের দুর্গে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে, বিপ্লবী আন্দোলনের, সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মুখ্য চালিকাশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী।"

বিশ্বব্যাপী শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের অনুকূলে আসার ফলে এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, বর্তমান যুগ এক বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। মহাসম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, "গত দশ বছরে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন দেশে এই আন্দোলন ধনতন্ত্রবিরোধী উপাদানে সমৃদ্ধ হচ্ছে।" অর্থাৎ এই পর্যায়ে গণ-

তান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্টতা ক্লাসিকাল সংজ্ঞার সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নতুন বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই নতুন বিশিষ্টতা আজকের গণ তান্ত্রিক আন্দোলনকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ধনতান্ত্রিক পথের চৌহদ্দীর বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিপ্লবই হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব সম্পর্কে অধ্যাপক উলিয়ানোভস্কি বলেছেন, "পরিধি, পরিচালক শক্তি ও লক্ষ্যের দিক থেকে এই বিপ্লব ক্লাসিকাল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপ সম্বলিত উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিপ্লবের সীমা বহুদূর ছাড়িয়ে যায়" (Some problems of non-capitalist development by R. Ulyanovsky —"মূল্যায়ন," ৭ম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা) এই কারণেই বলা হচ্ছে যে আজকের যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা ক্রমেই দানা বাঁধছে।

যেহেতু বর্তমান যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী, স্বাভাবিকভাবেই এর উপরেই নির্ভর করছে এ যুগের প্রধান মর্মবস্তু, প্রধান ধারা এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। পরিস্থিতির এই সম্ভাব্য পরিণতির গুণগত পরিবর্তনকে বিবেচনার মধ্যে রেখেই লেনিন ১৯২১ সালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামনে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, "পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের আন্দোলন গোড়ার দিকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সম্ভবতঃ আমরা যা আশা করি তার চাইতে অনেক বেশি বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করবে।" (Lenin—Report to the third congress of the Communist Internntional, collected works, vol 32, p 481-82)

লেনিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আগামী দিনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আরো বেশি করে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করবে—এর অর্থ কি? আগের যুগে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংঘটিত হত সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই প্রধান বিরোধের কাঠামোতে। ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পুঁজিবাদের উপাদান সংযোজিত হত। কিন্তু এখনকার যুগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এই প্রধান বিরোধের কাঠামোতে সংঘটিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতন্ত্রের উপাদান সংযোজিত হচ্ছে। আগের যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ধনতন্ত্রমুখীন এবং বর্তমান যুগের

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে সমাজতন্ত্রমুখীন। আগের যুগে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কাজ ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এখনকার কাজ হচ্ছে বৈপ্লবিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বেশি করে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করার অর্থই হচ্ছে এই আন্দোলন আরো বেশি বেশি করে সমাজতন্ত্রের উপাদানে সমৃদ্ধ হওয়া এবং বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ামক অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করা।

লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের স্তর

লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বিচারের সময় কেবলমাত্র বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য এবং এই যুগে কোন্ শ্রেণী নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে, এটা বিবেচনার মধ্যে রাখাটাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের বিপ্লবের স্তরটিও দেখা দরকার। কেবলমাত্র যুগ ও শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিপ্লবের স্তর সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না, এর সঙ্গে দেশের বাস্তব অবস্থাকেও বিচারের মধ্যে আনা উচিত। এ দুটি জিনিস পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির ওপর জোর দেওয়ার অর্থই হচ্ছে বৈপ্লবিক কর্ম-কাণ্ডকে হয় সংস্কারবাদী অথবা হঠকারী পথে পরিচালিত করা। অর্থাৎ এর ফলে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া লক্ষ্যাভিসারী হয় না, মাঝপথে তার গতি রুদ্ধ হয়।

বাস্তবিকভাবে পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন এবং তার সঠিক প্রয়োগ যে কোন দেশের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে তো বটেই। লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে বিশেষ করে তিনটি কারণ, পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও তার সঠিক প্রয়োগের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে—যেমন (ক) লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য (খ) প্রায়শ প্রতি-বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটন (গ) রেজিস দ্রেবে ও চে গুয়েভারার মতবাদের একটা প্রভাব। এই প্রভাবের দরুণ স্থান, কাল ও শ্রেণী নিরপেক্ষ অতিবিপ্লবী মতবাদের একটা ঝোঁক সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

লেনিন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এ

সত্ত্বেও বাঁধা ধরা ছকে এর বিকাশ ঘটবে একথা তিনি মনে করেন নি। তিনি এই অতিসরলীকরণের বিরুদ্ধে এই বলে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন, "বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশ সামগ্রিকভাবে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিকাশের কোন কোন যুগে এই বিকাশে রূপ বা তার পরিণামের দিক থেকে বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে না, বরং তার বিপরীতটাই সত্য।" এটি অত্যন্ত বাস্তব যে এই যুগে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে যেমন বিভিন্ন দেশের সামাজিক বিকাশের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে, তেমনি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যেও এই স্তরভেদ বর্তমান।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিচার করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক দিক থেকে—এখানে আছে সমাজতন্ত্রী দেশ—কিউবা, সামরিক-দেশপ্রেমিক ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশ—পেরু, ইকুয়েডার, ভেনেজুয়েলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল ডিক্টেটরতন্ত্রের দেশ—ব্রেজিল, চিলি, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, গুয়েতামালা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে—এখানে রয়েছে কিছু ঔপনিবেশিক দেশ যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালাচ্ছে, যেমন : পোর্তোরিকো, মার্টিনিক এবং গুয়াদিলুপ। এইগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত পুঁজিবাদী দেশ। এছাড়া কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলি পশ্চাদপদ কৃষিপ্রধান দেশ, যেমন : হাইতি, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়ে ইত্যাদি। কয়েকটি বৃহৎ দেশ আছে যেখানে পুঁজিবাদ মধ্যস্তরে এসে পৌঁছেছে, যেমন : আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, মেক্সিকো ইত্যাদি।

সাধারণভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, কয়েকটি দেশ বাদে, পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী স্তরে এসে পৌঁছেছে। পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী স্তরে পৌঁছনর অর্থ হচ্ছে—(ক) কৃষিতে আধা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অসংখ্য অবশেষের অস্তিত্ব (খ) সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্য অল্প পরিমাণ বস্তুগত ভিত্তি (গ) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। এই তিনটি বিশেষত্বের কথা ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই লাতিন আমেরিকার দেশগুলি পুঁজিবাদী পথে যাত্রা আরম্ভ করে। এখানকার উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ উন্নত

পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় কম হলেও, ভারতের মত দেশের তুলনায় বেশি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম থাকার ফলে, সেগুলি শ্রমের পুঁজিবাদী বিভাগের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকে অধীন। অর্থাৎ এখানকার পুঁজিবাদী বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী মনোপলিগুলির উপর নির্ভরশীল। এখানে রয়েছে জাতীয় পুঁজির দুর্বলতা।

উৎপাদিকা শক্তির পুঁজিবাদী বিকাশ মধ্যবর্তী স্তর পর্যন্ত ঘটলেও, এরই পাশাপাশি সেখানে রয়েছে বৃহৎ জমিদারীর অত্যন্ত আধিক্য (Latifundia) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির অস্তিত্ব (Minifundia)। লাতিন আমেরিকার দেশের বাদের মধ্যে ভাগ-চাষ, ঋণ-দাসত্ব, কৃষি মজুরদের পণ্যে দেয় মজুরী কোন্ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডার, পেরু ভেনেজুয়েলার বাগিচা মজুরেরা ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমি পায় যার পরিবর্তে সপ্তাহের কয়েকটা দিন বিনা মজুরীতে বেগার খাটতে হয়। লাতিন আমেরিকার কোন কোন জায়গায় কৃষিতে পুঁজিবাদের দ্রুত আবির্ভাব ঘটছে, যেমন : বলিভিয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব লাতিন আমেরিকায় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহির্দেশীয় বিনিয়োগের দিক থেকে এই অঞ্চল তৃতীয় বৃহত্তম যেখান থেকে বিশ্বের যে কোন স্থানের চেয়ে মুনাফা উপার্জন হয় বেশি" (World Communist Movement, Moscow p 332) বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির মধ্যে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থাবা কেবল অর্থনীতির উপরেই নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

এগুলির ফলস্বরূপ লাতিন আমেরিকায় আমরা দেখতে পাই একপেশে অর্থনৈতিক কাঠামো, সংকীর্ণ অভ্যন্তরীণ বাজার, উৎপাদন শক্তি বিকাশের শ্লথগতি ইত্যাদি যার ফলে কাঠামোগত সংকট গভীরতর হচ্ছে। ১৯৬১ সালের ইকনমিক্ সার্ভে ফর লাতিন আমেরিকা অনুযায়ী, "সেখানকার সবচেয়ে সম্পদশালী পরিবারগুলির মধ্যে পাঁচ শতাংশ উক্ত এলাকায় অর্জিত সমস্ত আয়ের ৩০.৪ শতাংশ উপায় করে। মোট অঙ্কের হিসাবে, সামাজিক পিরামিডের চূড়াস্থিত ব্যক্তিদের মাথা পিছু আয় সেই পিরামিডের তলার দরিদ্রদের তুলনায় ৪৩ গুণ বেশি। এই ব্যবধান বছর বছর বেড়েই চলেছে।

স্থানীয় ধনিক চূড়ামনিদের সম্পদ সঞ্চয় বিশেষভাবে প্রকট সেই সব দেশে যারা দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদী পথে বিকাশ ঘটিয়েছে। তৃতীয় 'আংকটাড্' সম্মেলনে উদ্ধৃত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, ব্রাজিলে মোট জাতীয় উৎপন্নে জনসমষ্টির দরিদ্রতম ৪০ শতাংশের ভাগ ১৯৬০-র দশ শতাংশ থেকে কমে ১৯৭০-এ দাঁড়িয়েছে আট শতাংশ, আর সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের ভাগ বেড়েছে ২৯ থেকে ৩৮ শতাংশে। মেক্সিকোতে গত দু'দশকে দেখা গেছে যে মোট জাতীয় উৎপন্নে জনসমষ্টির দরিদ্রতম ৪০ শতাংশের ভাগ ১৪ শতাংশ তেমনি কমে হয়েছে ১১ শতাংশ।" (উন্নয়নশীল দেশসমূহ—বৈদেশিক অর্থ-সম্পর্কের সমস্যাবলী—জি. ক্রাসনভ ও এ. চেখুভভ)

এই লাতিন আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় হচ্ছে : ১। লাতিফুণ্ডিয়া ব্যবস্থা, ২। গ্রামাঞ্চলে প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অস্তিত্ব ও ৩। বিদেশী পুঁজির দাপট।

এই অন্তরায়গুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : ১। অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র লাতিফুণ্ডিয়া ব্যবস্থাকে প্রধান অবলম্বন করেছে, ২। এই ব্যবস্থা মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের এক মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

যেহেতু লাতিন আমেরিকার দেশগুলি পুঁজিবাদী উন্নয়নের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে এবং যেহেতু এই পুঁজিবাদী বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী মনোপলির উপর নির্ভরশীল, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমগ্র জাতির একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, অন্যদিকে অলিগর্কি দেশীয় শাসকচক্রের সাথেও রয়েছে সমগ্র জাতির বিরোধ। লাতিন আমেরিকার সর্বত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অলিগর্কি দেশীয় শাসকচক্রের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ অর্থনৈতিক বিকাশের এক বিশিষ্ট উপাদান। তবে এখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদ প্রাধান্যমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো হয়ে ওঠে নি। কারণ "লাতিন আমেরিকার দেশে একচেটিয়া পুঁজিবাদের গঠন অগ্রসর হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্ভসারণের মধ্যে। আর্থব্যবস্থার মূল শাখাতে মার্কিন পুঁজির আধিপত্যের মধ্যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্থানীয় একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব ও গঠন হয়।" (সমাজ বিজ্ঞান, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমী, সংখ্যা ১, ১৯৭৪ ; অধ্যায়—লাতিন আমেরিকায়

একচেটিয়া পুঁজি ও তার বিকাশের বিশিষ্ট উপাদান—কনস্তান্তিন তারাসভ) এমন কি এই প্রক্রিয়ার কোন পরিবর্তন আজও পর্যন্ত কোথাও ঘটে নি। "বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্থানীয় একচেটিয়া গোষ্ঠী শুধু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে যুক্ত নয়, বরং লাতিন আমেরিকার দেশের ভূস্বামীদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি-শাসনের সঙ্গে হাজার বন্ধনে জড়িত।" (ঐ)

লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক জগতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এমনভাবে কব্জার মধ্যে রেখেছে, যার ফলস্বরূপ সেখানকার জাতীয় বুর্জোয়ারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিদেশী পুঁজির তুলনায় স্থানীয় একচেটিয়া পুঁজির আকৃতি ও বিশেষ কোন শিল্পের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অত্যন্ত নগণ্য। বিপরীত দিকে "দুনিয়ার আর্থিক বাটোয়ারায় কামড়াকামড়ি করাতো দূরের কথা, তার নিজের দেশেই বিদেশী পুঁজির ছোট অংশীদার হয়ে থেকেই লাতিন আমেরিকার বৃহৎ পুঁজিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।" (সমাজ বিজ্ঞান, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমী, সংখ্যা ৪, ১৯৭৩ ; অধ্যায়—লাতিন আমেরিকা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ভি. ভোলস্কি) অর্থাৎ তাদেরকে (স্থানীয় পুঁজি) সবসময় বিদেশী পুঁজিরও জুনিয়র পার্টনার হিসাবে কাজ করতে হয়। ফলে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ না থাকাতে জাতীয় বুর্জোয়ার বেশির ভাগটাই সাম্রাজ্য-বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার চরিত্র ধারণ করেছে। অর্থাৎ এখানকার বুর্জোয়া শ্রেণীর বেশির ভাগ অংশের মধ্যে থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা নিঃশেষিত। "যতদিন···বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারীত্বে লাতিন আমেরিকার পুঁজিবাদী অগ্রসর হচ্ছে, ততদিন এই বিকাশ এবং স্থানীয় পুঁজির একত্রীভবনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে যে সংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটছে, তা গুণগত পরিবর্তনে পরিণতি পেতে পারে না—অর্থাৎ স্থানীয় পুঁজির একচেটিয়া পুঁজিতে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত, রূপান্তর এবং স্থানীয় পুঁজি ও বিদেশী পুঁজির সম্পর্কের পরিবর্তন হতে পারে না। বিপরীত ক্রমে, এই জাতীয় পুঁজিবাদী উন্নয়ন যত অগ্রসর হবে, ততই স্থানীয় পুঁজি, দুর্বলতর পুঁজি, বিদেশী ও অধিকতর শক্তিশালী পুঁজির অধীন হয়ে পড়বে এবং তার সঙ্গে মিশে যাবে···। (ঐ)

লাতিন আমেরিকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী থাকলেও, তাদের

উদ্যোগগুলিকে বিদেশী একচেটিয়াপতিরা সাঁড়াশীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। তবে একথা বলা চলে যে এদের মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চিন্তা অনেক প্রবল।

এই বিশ্লেষণের উপর দাঁড়িয়ে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী কর্তব্য এসে পড়েছে। বিপ্লবের স্তরের এই চরিত্র কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বলা চলে যে ধারাবাহিকতার এক তুঙ্গীভূত রূপ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও, আজকের স্তরের উপাদানগুলি বর্তমান ছিল। "এই শতাব্দীর শুরুতে একদিকে সামন্তবাদী কাঠামো ও অন্যদিকে বিদেশী আধিপত্যকে নির্মূল করার কাজ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এক সামন্তবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র ধারণ করেছিল। (A short history of the world, Moscow, 1974, p 564) সাম্রাজ্যবাদ ও অলিগর্কির সাথে বুর্জোয়াশ্রেণীর বৃহদংশকে উচ্ছেদ করা যেহেতু লাতিন আমেরিকার জনগণের প্রাথমিক কাজ, তার জন্য এখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজের এক সংমিশ্রণ ঘটেছে। কেবল তাই নয়, এই কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নটিও অবধারিত ভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিউবার বিপ্লব ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী ঐতিহ্য

এই প্রক্রিয়ারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে কিউবা। এখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকা সত্ত্বেও, এর মধ্যে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জের অবস্থান হেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার চেয়ে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের ধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। এই বৈপ্লবিক ধারাই শেষ পর্যন্ত বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার দরুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছিল। কলম্বিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির বিকল্প সদস্য থিও ডোসিও ভারেলা কিউবা বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "কিউবা বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার দ্রুত বিকাশ। এটা প্রমাণ করেছে যে এ দুটি একই প্রক্রিয়ার দুই স্তর।" (Peace freedom and socialism P 43)

যারা বলতন্ত্রের পূর্ণ পরিপক্কতা অর্জনকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করার পূর্বশর্ত বলে মনে করেন, কিউবার দৃষ্টান্ত তাদের চোখ খুলে দেবে। মার্কসবাদে যারা বিশ্বাসী তারা কখনই এটাকে সঠিক বলে মনে করেন না। তারা বস্তুগত পূর্বশর্তের সর্বাধিক্যকে প্রয়োজনীয় মনে করেন না, বরং যা মনে করেন তা হচ্ছে সর্বনিম্ন এক পূর্বশর্ত। সর্বনিম্ন পূর্বশর্তগুলি হচ্ছে— (১) উৎপাদিকা শক্তির নির্দিষ্ট মাত্রার বিকাশ (২) সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈরীতার একটি নির্দিষ্ট স্তর (৩) সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর তরফ থেকে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জকে পরিচালনা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা। "বিশ্বের অনুকূল পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পূর্বশর্তগুলি জাতীয় ক্ষেত্রে আরো খানিকটা কমে গেছে" (The world communist movement, Moscow, p 112-13)। কমে যাচ্ছে বলেই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে ক্রমেই বেশি বেশি করে সান্নিধ্য ঘটছে। কিউবার ক্ষেত্রেও এই জিনিস ঘটেছে।

কিউবার বিপ্লব সম্পর্কে সেখানকার পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ব্লাস রোকা উল্লেখ করেছেন, "কিউবার বিপ্লব হচ্ছে··· সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী।

"এই বিপ্লব যে সমস্ত কর্তব্যের সম্মুখীন এবং যা সে করে চলেছে, সেই দিক থেকে একে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় যে এটা এক জাতীয় মুক্তি ও কৃষিবিপ্লব, স্বদেশী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

"এটা এমন এক বিপ্লব যাকে উঁচু স্তরের গণবিপ্লব নামে গণ্য করা যেতে পারে···।" (New Age, Dec 1960)

কিউবাতে উভয় স্তরের মধ্যে যেমন সান্নিধ্য ঘটেছে, তেমনি এর মধ্যে বৈপ্লবিক ধারার বিকাশ ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই বৈপ্লবিক ধারার চালিকা শক্তি প্রসঙ্গে ব্লাস রোকা বলেছেন, "যে সমস্ত সামাজিক শ্রেণী বাস্তব দিক দিয়ে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে আগ্রহী, তারা হল শ্রমিক, কৃষক, শহরের মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া। কিন্তু যারা বিপ্লবকে ঠেলা দেবে এবং তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ বিপ্লবের যারা চালিকা শক্তি তারা হল প্রধানত শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও শহরের ক্ষুদে বুর্জোয়াদের সংস্কারকামী অংশ।"

(New Age, Dec 1960) ব্লাস রোকার এই মন্তব্যের মধ্যে বিপ্লবী ফ্রন্টের সমাবেশের ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া স্থান পেয়েছে। তবে নেতৃত্বের প্রশ্নে তিনি জাতীয় বুর্জোয়াকে বাদ দিয়েছেন এবং শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াকে স্থান দিয়েছেন। ফ্রন্টের মেরুদণ্ড বা স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী।

লাতিন আমেরিকায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধারা বহুদিন ধরে পাশাপাশি চলেছিল। তবে একথা বলা চলে যে সেখানে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার অস্তিত্ব থাকলেও, অবিরতভাবে প্রধান ধারার ভূমিকা পালন করতে পারে নি। এটি এখানকার বুর্জোয়াদের এক বৈশিষ্ট্য।

লাতিন আমেরিকার বুর্জোয়াদের মধ্যে তিনটি অংশ দেখা যায়। যেমন : (ক) সাম্রাজ্যবাদ ও অলিগর্কির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বৃহৎ বুর্জোয়া (খ) দ্বৈত চরিত্র বিশিষ্ট বুর্জোয়া (গ) ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়া।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার প্রধান হতে পারাটা নির্ভর করছে দ্বৈত চরিত্র বিশিষ্ট বুর্জোয়াদের ওপর। তবে এই বুর্জোয়াদের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাদের একদিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও অলিগর্কিদের সঙ্গে আবদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী। অর্থাৎ লতায় পাতায় জড়ানো এক শ্রেণী আত্মীয়ের শিবির। অন্যদিকে রয়েছে এক বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা। নিজের শ্রেণী বিনাশকারী এক শ্রেণীশত্রুর শিবির। স্বাভাবিকভাবেই দ্বৈত-চরিত্র বিশিষ্ট বুর্জোয়াদের দেশের অর্থনীতিতে কোনরকম নিয়ন্ত্রণক্ষমতা না থাকার জন্য এবং সুস্পষ্ট শ্রেণী হিসাবে গড়ে না ওঠার জন্য তাদেরকে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী ধারার ব্যাপকতা ও গভীরতার সামনে বারবার শ্রেণী আত্মীয়ের পদাংক অনুসরণ করতে দেখা গিয়েছে। ফলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার পতাকা বারবার ধূলায়বলুণ্ঠিত হয়েছে।

১৯১০-১৯১৭ সালের মেক্সিকোর বিপ্লব ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী এবং চরিত্রের দিক থেকে ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। এই সংগ্রাম লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত এক শক্তিশালী কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। ঘটনার এই ত্বরিত বিকাশে চকিত বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন

হওয়ার আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠল। ফলে "গৃহযুদ্ধকালীন পর্ব যা ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল ধরে চলেছিল—এই সময়ে বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের যৌথ ঘটনাক্রমে কৃষক সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করতে এবং পরে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।" (A short history of the world, Moscow, p565)

ভেনেজুয়েলায় যে আন্দোলন ১৯৫৮ সালে ঘটেছিল, তাও ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা একনায়কত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। তবে এই সংগ্রামে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার পাশাপাশি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারাও বর্তমান ছিল। এই বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা, কেবল একনায়কত্বেরই উচ্ছেদ ঘটাতে চায় নি, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানকার বুর্জোয়ারা তা হতে দিল না। "ভেনেজুয়েলাতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব থেকে সর্বহারা ও জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে হটিয়ে দিতে সফল হল এবং বিপ্লব ব্যর্থ হল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস ও সীমাবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে।" (সমাজ বিজ্ঞান, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমী, সংখ্যা ৪, ১৯৭৩ ; অধ্যায়—লাতিন আমেরিকা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ভি ভোলস্কি)

কিউবা বিপ্লবেও এই ঘটনা দেখা যায়। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারার শক্তি-বৃদ্ধিতে, বুর্জোয়ারাও ভয় পেয়ে গেছিল। "যে পুরাতন ও বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠী তখন পর্যন্ত সময়ে সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখত, তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের সমগ্র শক্তি একত্রিত করল এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে দিল ; নতুন শিল্প মালিক, বুর্জোয়া এবং মধ্যবর্তী স্তরের একাংশ বিপ্লব বর্জন করল। তারা হয় সোজাসুজি বিশ্বাসঘাতকতা করল অথবা বিপ্লবকে সংস্কারবাদের দিকে চালিয়ে তার 'ডানা কেটে দেওয়ার' চেষ্টা করতে লাগল।...যারা প্রথমে সমর্থন জানিয়েছিল, সেই বুর্জোয়া উপাদানগুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক পরে দলত্যাগ করে প্রতিবিপ্লবী দেশত্যাগীদের শিবিরে ভিড়ে গিয়েছিল।" (ঐ)

বলিভিয়ায় ১৯৫২ সালের এপ্রিল বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সেখানে সে সময় যদিও শ্রমিকশ্রেণীর শক্ত ভিত্তি ছিল না, তবুও একথা বলা চলে যে মধ্য-বুর্জোয়ারা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী

সংগ্রামকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে নি। বরং তারা সাম্রাজ্যবাদের এক লেজুড়ে পরিণত হয়। "শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় রাজনৈতিক অগ্রগামী অংশ না থাকায়, মধ্য-বুর্জোয়ারা যাদের মুখপাত্রেরা জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন (Nationalist Revolutionary Movement)-এর জনগণের মধ্যে ছিল, তাঁরা এপ্রিল বিপ্লব কালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়েছিল পুঁজিবাদী পথে বিকাশের জন্য। তাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ Alliance for progress (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত—লেখক) এর পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল এবং বলিভিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার মধ্যে দিয়ে তা শেষ করেছিল" (Information Bulletin, No, 18-19, 1971—Programme thesis of the Communist Party of Bolivia).

কলম্বিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাই। সেখানকার দুই চিরাচরিত বুর্জোয়া দল, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, ১৯৫৭ সালে সেখানকার একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো সত্ত্বেও, গণ আন্দোলনের রাশ ধরে টেনে রাখে। ফলে সেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজও সমাপ্ত হয় না।

১৯১০-১৯১৭ সালের মেক্সিকোর জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে নিহিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার যে পশ্চাদমুখিনতা শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে ক্রমে লাতিন আমেরিকার সর্বত্র এক সংস্কারবাদিতায় রূপান্তরিত হল। বিপরীত দিকে, বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা—প্রতিটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে, প্রতিটি ব্যর্থতায় নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতিতে, প্রতিটি আংশিক সাফল্যে আরো অগ্রগমনের ইচ্ছা পোষণ করে, প্রতিটি দিক পরিবর্তনের মুখে মিত্রশক্তির ব্যাপক অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে—শেষ পর্যন্ত কিউবায় বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। কেবল বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের জয় ঘোষণাই নয়, জনগণের গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম শেষপর্যন্ত শহর ও গ্রামের সর্বহারা ও আধা সর্বহারাদের হাতে এসেছে। অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী দ্রুত স্থাপিত হওয়ার ফলে, কিউবায় দ্রুত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাও শুরু হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকা

১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স' পার্টিগুলির প্রতিনিধি ও গবেষকদের এক আলোচনা চক্রে হণ্ডুরাসের লোজিনো বেসেরেরা উল্লেখ করেছিলেন, "লাতিন আমেরিকার সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর দেশগুলিতেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে এবং শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লবী লক্ষণগুলি স্থির করেছে সেগুলি আমরা 'অপুঁজিবাদী পথ' বলতে যা বুঝি তার চেয়েও আরও অগ্রসর হতে পারে।" (Once more about the non-capitalist way —Peace Freedom and Socialism, No 6, 1970) এই সম্ভাবনার কারণগুলি হচ্ছে—প্রথমতঃ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে তার সাধারণ নিয়মের প্রভাব। লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯৬৯ সালের মহাসম্মেলন ঘোষণা করেছে "খাঁটি জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি বৈদেশিক বা স্থানীয় একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামী প্রথার বিরুদ্ধে এক জটিল সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" দ্বিতীয়তঃ কিউবা বিপ্লবের প্রভাব। কিউবার বিপ্লব লাতিন আমেরিকার সামনে এক সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত করার ফলে সর্বত্র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের নির্দেশকে খেয়ালের মধ্যে রেখে মহাসম্মেলন আশা প্রকাশ করেছে যে কিউবা বিপ্লবের সফলতায় "পৃথিবীর এই অংশে জঙ্গী গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও বিপ্লবী প্রক্রিয়াসমূহ বিকাশলাভ করছে, যে প্রক্রিয়া সমাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করবে।" তৃতীয়তঃ লাতিন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের এক বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রভাব ও তার বিকাশ।

এগুলির ফলে, লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়া দ্রুততর ও গভীরতর হচ্ছে। ফলে তা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রণনীতির ও রণকৌশলের উপরেও ছাপ রাখছে। এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিপ্লবের উভয় স্তরের সান্নিধ্যের দরুণ সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা বৃদ্ধির কথা, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতার কথা এবং মিত্র শক্তির অংশগ্রহণের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে।

চিলিতে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী সরকারের পরিবর্তে ১৯৭০ সালে এক

জনপ্রিয় গণঐক্য ব্লকের সরকার ক্ষমতায় আসে। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লুই করভালান ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে এই সরকার সম্পর্কে ঘোষণা করেন, "বর্তমানের কাজ হচ্ছে এই সাফল্যকে সংহত করা এবং নতুন অবস্থানকে জয় করার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাতে আমাদের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয় থাকে এবং সমাজতন্ত্রকে সুগম করে তুলতে পারি।"

আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের কি স্তর নির্ণয় করেছে, সেটা ১৯৭২ সালে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে জানতে পারা যায়। সেখানকার বিপ্লবের স্তর হচ্ছে—অলিগর্কি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় গণতন্ত্র। অর্থাৎ সেখানকার লড়াই হচ্ছে—বৃহৎ অলিগর্কি, বৃহৎ মুৎসুদ্দি পুঁজি ও বিদেশী একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন শ্রেণী সমবায়ে এক জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির ১৪তম কংগ্রেসে ঘোষিত হয়েছে যে, "The national liberation front will be monolithic and consistent only to the degree to which the working class is its backbone" (Marxism Today, April 1974) আর্জেন্টিনার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ যে সমাজতন্ত্রমুখীন, সেটা ঐ কংগ্রেসেই বলা হয়েছে—"আমাদের ধারাবাহিকভাবে পার্টি কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে, যে কর্মসূচী গণতান্ত্রিক, কৃষি ওসাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের জন্য এবং যার গতিমুখ সমাজতন্ত্রের দিকে।" (ঐ)

বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যদিও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছে, তবুও পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৭১ সালের জুন মাস) আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, "অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব করা যেতে পারে। ভিতরের ও বাইরের বিরোধসমূহের চরিত্র এমনই যে বলিভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত আর দূরের লক্ষ্য নয়।" (Information Bulletin No. 18-19, 1971—Programme thesis of the Communist Party of Bolivia) এই কাজে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক জর্জ কোলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনপ্রিয় সরকার

গঠনের সংগ্রামে বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নীতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তিপুঞ্জের নেতৃত্বে এক ব্যাপক গণঐক্য গড়ে তোলা।"

উরুগুয়ের পার্টি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে চীনের প্রাচীর না টেনে এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার দুটি পর্যায় হিসাবে দেখেছে এবং তারা মনে করে এ ব্যাপারটিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা রয়েছে। এ সম্পর্কে পার্টির সম্পাদক রডনি আরিসমেণ্ডি ২৪তম কংগ্রেসে ঘোষণা করেছেন—"শহরের মধ্যস্তর, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণী যে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে সেটি এবং পার্টি সংহতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বিধায়ক শক্তি।"

গিনির পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টির ১৭তম কংগ্রেস (১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর) উল্লেখ করেছে—"আমাদের পার্টির রাজনীতি হচ্ছে মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর জন্য জনগণকে টেনে আনা" (Information Bulletin No. 8, 1973—17th Congress of the Peoples Progressive Party) এক্ষেত্রে তারা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ প্লেনাম ঘোষণা করেছে—"একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এমন সংগ্রাম যাতে একনায়কতন্ত্র বিরোধী সমস্ত শক্তিই আগ্রহী। একটি ব্যাপক একনায়কতন্ত্র-বিরোধী মোর্চায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিপুঞ্জ এবং এর মধ্যে প্রধানতঃ রয়েছে শ্রমিক, কৃষক ও শহরের ক্ষুদ্র টিবুর্জোয়ারা। শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে এই যুক্ত মোর্চার প্রধান চালিকা শক্তি" (Information Bulletin, No 23-24, 1971—Sixth Plenum of the Brazilian Communist Party Central Committee)

গুয়েতামালারও বিপ্লবের স্তর হচ্ছে—অলিগর্কি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গিলবার্টো ভিয়েরা সোভিয়েতের ২৪তম কংগ্রেসে ঘোষণা করেছেন "আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এক ব্যাপক জনপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক মোর্চা গঠনের জন্য ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালাবে।"

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিও অলিগর্কিবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

বিপ্লবের স্তরের কথা ঘোষণা করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এক মোর্চা গঠনের কথা বলছে।

লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের রণনীতি কেবলমাত্র সেখানকার পুঁজিবাদী কাঠামোর অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে রচনা করেছে, তা নয়। পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সংঘটিত সুতীব্র বিরোধ বৈপ্লবিক অবস্থার বিষয়গত শর্ত তৈরী করতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে এটাই সব নয়। লেনিনের শিক্ষাও তাই। পুরনো সরকারকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য বিপ্লবী শ্রেণী কতখানি বৈপ্লবিক গণঅভিযান সংঘটিত করার ক্ষমতা রাখে, তার উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে।

লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের উভয় স্তরের মধ্যে সান্নিধ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি বলেই, এখানে ধনতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা খুবই লক্ষণীয়। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ ও অলিগর্কি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রকটভাবে সামনে এসে পড়ায়, এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা অবধারিতভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে। তবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকার অর্থ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে বা পেটিবুর্জোয়ার ভূমিকাকে অবহেলা করা নয় অথবা পুঁজিবাদ প্রত্যাখানকামী অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে মোর্চা করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা নয়। লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশেই এই সমস্ত বিষয়গত দিকের প্রস্তুতি জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

সুতরাং বিষয়গত দিক থেকে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধির কারণগুলি হল :—

(ক) সদস্যসংখ্যা ও প্রভাবের দিক থেকে লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির শক্তি প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। "দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধনিমজ্জিত শক্তিশালী কমিউনিস্ট বাহিনীকে হিসাব থেকে বাদ দেবার প্রয়াসাদি অবাস্তব। ঐসব পার্টি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনী যা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গতিবেগ বাড়াচ্ছে।" (শান্তি, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র—দক্ষিণ আমেরিকা—বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা, মে ১৯৭৪)

(খ) সামাজিক ভিত্তির বিস্তার—শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি থাকার

জন্যে এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট ঐতিহ্য থাকার জন্যে কেবল যে এই দুই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হচ্ছে তা নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য স্তর যেমন কৃষক, ছাত্র ইত্যাদি সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, অলিগর্কি-বিরোধী ও ধনতন্ত্র-বিরোধী চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সামগ্রিকভাবে লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবী প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করছে। মধ্যস্তর ও সৈন্যবাহিনীর একাংশ ক্রমে ক্রমে বিপ্লবের সপক্ষে আসছে। ১৯৬৯ সালের মহাসম্মেলনে বলা হয়েছে "কোন কোন দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক প্রবণতাসমূহ দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে উঠছে।" পেরু, পানামা ও ইকুয়েডার-এ এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম অগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়-গুলিকেও প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। গিনির পিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টির মুখপত্র "Thunder' লাতিন আমেরিকার এই বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে—"এই মহাদেশের জনগণের সুনিশ্চিত স্বাধীনতার জন্য এই নতুন স্তরের বিপ্লবী কর্মতৎপরতায় খ্রীষ্টানদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তার উজ্জ্বলতম কর্মক্ষেত্র হচ্ছে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং বলিভিয়া (থাণ্ডার, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭১, লাটিন আমেরিকা—দ্য রিবেলিয়ন অব দ্য ক্লার্জি)

(গ) সাম্রাজ্যবাদ ও অলিগর্কির বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকায় ঐক্যের প্রক্রিয়াগুলি ক্রমেই দানা বাঁধছে এবং ব্যাপক রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনে তৎপর হয়ে উঠছে। এর মধ্যে কয়েকটি দেশের বিপ্লবী ফ্রন্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি সংযুক্ত আছে। যেমন—

—ন্যাশনাল মিটিং অব আর্জেন্টিনিয়ানস্

—পপুলার ইউনিটি ইন ইকুয়েডার

—ন্যাশনাল অপোজিসন ইউনিয়ন ইন কলম্বিয়া

—ব্রড ফ্রন্ট ইন উরুগুয়ে

—পপুলার ফ্রন্ট ইন বলিভিয়া

—ইউনাইটেড ফ্রন্ট অব পপুলার ফোর্সেস ইন পেরু

—পপুলার ইউনিটি ব্লক অব চিলি।

(ঘ) কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীন বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ফ্রন্ট গড়ে উঠছে না, লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রমবর্ধমান সংহতি সৃষ্টি হয়েছে।

লাতিন আমেরিকার সর্বত্র সমাজতন্ত্রমুখীন বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি এবং এরই অনুরূপ ফ্রন্টে ব্যাপক সামাজিক শক্তির অংশগ্রহণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকেই উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। এই উদ্যোগ প্রতিফলিত হচ্ছে ফ্রন্টে বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জকে সমাবেশ করানোর মধ্যে দিয়ে এবং ঐ ফ্রন্টকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে। বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ঐক্য আনার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগী। "লাতিন আমেরিকার দেশগুলির প্রগতিশীল শক্তিপুঞ্জকে এক ব্যাপক জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে উদ্যোগ কর্তা" (initiators) (The world Communist Movement. p 339) শ্রমিকশ্রেণীকে এই উদ্যোগ দেখাতে হবে—(ক) সমশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবদান রাখতে সক্ষম সকল শক্তিকে কোন না কোন আকারে টেনে ফ্রন্টকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এবং (খ) শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। যুক্তফ্রন্টকে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীরই একমাত্র নেতৃত্ব নেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। ফ্রন্টের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে বলা চলে যে "লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশে শ্রমিকশ্রেণী যুক্ত মোর্চায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এবং তাঁরা সেই মোর্চায় নেতৃত্বদান করছে।" (ঐ—পৃঃ ৩৪৭)

উত্তরণকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে বিপ্লবের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত তাত্ত্বিকের মত হচ্ছে "লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে বিশেষ ধরনের উত্তরনকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্মসূচী-মূলক দলিলগুলিতে এই ধরনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি বলা হয়েছে তার বিচারে, সেগুলি কমবেশি পরিমাণে শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব

সদৃশ হবে, যার বিষয় ১৯০৫ সালের বিপ্লবে লেনিন আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন" (World Communist Movement, p 165-166)।

পরস্পরবিরোধী দুই প্রক্রিয়া

লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সেখানকার জনগণকে যতই প্রভাবিত করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও অনুরূপভাবে দেশের অলিগর্কি শক্তি সহযোগে এক প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়া চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পশ্চাদভূমি' করে রাখা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে 'ব্লক ভোটের' এক শিবির তৈরী করা।

বস্তুতঃ একদিকে যেমন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটছে—বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ব্যাপক সামাজিক শক্তির অংশ-গ্রহণ, এই প্রগতিশীল শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ঐক্য আনার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যোগ এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে, বিপরীত দিকে প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটছে—সি. আই. এ-র ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত, ব্ল্যাক মেইল, চাপ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকগতভাবে আক্রমণ ও মতাদর্শগত দিক থেকে বিক্ষিপ্তকরণের এক সূক্ষ্ম প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার ক্রমাগত বিরোধের মধ্যে চিলিতে ফাসিস্ত শক্তি পিনোচেত সেখানকার জনপ্রিয় গণঐক্যবদ্ধ সরকারের পতন ঘটিয়ে এক শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখলেও এবং উরুগুয়েতে ফাসিস্ত শক্তি বোরদাবেরী সেখানকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মানুষের উপর নির্যাতনের রোলার চালালেও, একথা প্রত্যয় সহকারে বলা চলে যে, সামগ্রিকভাবে মহাদেশীয় পটভূমিকায় বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গতিমুখ অগ্রগতির দিকে।

কিউবার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ড, পেরুর সামরিক সরকার কর্তৃক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণ, পানামা খালের উপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ভেঙ্গে ফেলার জন্য পানামার জনগণের নির্ভীক সংগ্রাম, ইকুয়েডারের দেশপ্রেমিক সরকার কর্তৃক দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়া-

শীল চক্রের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল পদক্ষেপগ্রহণ, আর্জেন্টিনাতে অলিগর্কি শক্তির সাময়িক পরাজয়, ভেনেজুয়েলা সরকারের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ইত্যাদি ঘটনা এই গতিপথের এক একটি উজ্জ্বলতম ও উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত এবং এগুলির সংযোগ সাধনের ফলে সৃষ্ট গতিমুখের আক্রমণের লক্ষ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় অলিগর্কি ও পুঁজিবাদী শক্তি।

এই কারণে সোভিয়েত তাত্ত্বিক পনোমারিয়েভ সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন—"অল্প কিছুদিন আগেই এই অঞ্চলকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরাপদ পশ্চাদভূমি মনে করা হত। এখন সেই অঞ্চলই পরিণত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের বিশাল পীঠস্থানে।" (লাতিন আমেরিকায় বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—বোরিস পনোমারিয়েভ : মূল্যায়ন, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

আরব দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আজ বাস করছে সমাজতন্ত্রের সুখী সমৃদ্ধ ভূমিতে। বিজয়ী সমাজতন্ত্রের ভাবধারা বিশ্বের দূরতম কোণের মানুষকে উদ্বেল করছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদের অবস্থা সঙ্গীন। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আমাদের এই গ্রহের বুকে থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হতে চলেছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা জীইয়ে রেখে ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয় কখনোই, বরং উপনিবেশের টিঁকে থাকার অর্থই হল সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে দুর্বল ও সীমিত করা। লেনিন তাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তিকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখেছিলেন। প্রাচ্যের কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের নিখিল রুশ কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন : "...সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধুমাত্র বা প্রধানতঃ প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সেই দেশের বিপ্লবী সর্বহারার সংগ্রামই হবে না, পরন্তু, এই সংগ্রাম হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত উপনিবেশের ও সকল পরাধীন দেশের লড়াই।" (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ৩০শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯) তিনি আরো বলেছিলেন যে পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আসলে "গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের এক সামগ্রিক পরম্পরা যার মধ্যে থাকবে অনুন্নত, পশ্চাদপদ এবং নিপীড়িত দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।" (সং. র. ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৬০)।

১৯১৭-র মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ লেনিনের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে। নভেম্বর বিপ্লবের অসামান্য বিজয় সমগ্র প্রাচ্য দুনিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এনে দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের অবাধ ক্ষেত্র এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত জনগণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অভূতপূর্ব প্রাণ-বন্যায় বিশ্বকে সকচিত করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ১৯১৭-র প্রথম সফল সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বে প্রাচ্যদেশে কোনো জাতীয় মুক্তি বিপ্লবই সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ফ্যাসীবাদের কবল থেকে বিশ্বকে রক্ষাকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন অমিত বলবীর্যশালী রূপে নিজেকে প্রমাণ করল। সাম্রাজ্যবাদের পতন তখন ত্বরান্বিত হচ্ছে পুঁজিবাদের অটল দুর্গে বিরাট বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। বিশ্ব জুড়ে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সমাজতন্ত্রের সেই বলদৃপ্ত প্রকাশ নতুন করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে প্রবল আঘাত হেনেছে। বিশ্বের বেশীর ভাগ উপনিবেশে স্বাধীনতার দাবী উত্তাল হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদকে তৃতীয় বিশ্বের এক বিরাট অঞ্চল থেকে তার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শাসনকে নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য করা হয়েছে।

বিজয়ী সমাজতন্ত্রের প্রভাব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নিকট, সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির নিকট এক মহান সম্ভাবনার মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বশোষণ অবসান ও জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে আজ তৃতীয় দুনিয়াতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের প্রত্যক্ষ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা ও সাহায্য এইসব দেশ ও জাতিকে দেখিয়ে দিচ্ছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে শোষণ চালায় ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি একই সময়ে নিজ দেশসমূহে ও অপরাপর পশ্চাদপদ দেশগুলিতে, অনুন্নত জাতিসমূহে সর্বশোষণমুক্ত সমাজ তৈরী করার বনিয়াদ তৈরী করে।

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একদা অনুন্নত, পরাধীন ও পশ্চাদপদ জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আজ এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। এই স্তর গুণগতভাবে উচ্চতর। এই স্তরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে উপরে বর্ণিত বিষয়ী ও বিষয়গত পরিস্থিতি সমূহ। সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে দেখা দিয়েছে, তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের মনে এই জিজ্ঞাসা জাতীয় উন্নয়ন—কোন্ পথে? পুঁজিবাদের পথ বিকাশের জন্য আজ আর পশ্চাদপদ, উন্নয়নশীল জাতিসমূহের কাছে অপরিহার্য নয়। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলে

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ বিকাশের অ-পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বক্তব্যসমূহ গভীর তাৎপর্যবাহী: "আমাদের যুগের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রভাবে সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সামনে প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশের বিশিষ্ট কয়েকটি রূপ দেখা দিয়েছে এবং বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ভূমিকা সম্প্রসারিত হয়েছে। কয়েকটি নতুন রাষ্ট্র অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেছে নিয়েছে। এই পথ তাদের সামনে উন্মুক্ত করে ঔপনিবেশিক অতীতের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা এবং রচনা করে সমাজতান্ত্রিক বিকাশে উত্তরণের অনুকূল পরিবেশ। এই সব দেশে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে মোড় ফেরার (বড় হরফ লেখকের) কাজটি এগিয়ে চলেছে বহু বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষা অতিক্রম করে। এই সব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম পরিচালনা করছে।" (১৯৬৯ এ মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলন—৭৫ পার্টির দলিল)

এই বক্তব্যের মধ্যে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে তার মূলগত অর্থ হচ্ছে, এই নবযুগে অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় এক নতুনতর বিপ্লবী পরিস্থিতির সংযোজন হয়েছে—বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবে এবং ক্রমান্বিত শ্রীবৃদ্ধিতে। সেই সমৃদ্ধি বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে বৈষয়িক সাহায্য ও সহায়তা তো দিচ্ছেই, পরন্তু তাদের প্রভাবে নতুনতর বিষয়ীগত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে যাতে এই সব দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; এবং কোথাও কোথাও সমগ্র দেশ ও জাতি বিকাশের পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করছে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগোবার জন্য বিকাশের অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করছে এবং করতে সক্ষম হচ্ছে। এই বিকাশকেই বলা হয়েছে দীর্ঘ-মেয়াদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পথ। (বড় হরফ লেখকের। দ্রঃ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে ব্রেঝনেভ রিপোর্ট)

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশতি কংগ্রেসের রিপোর্টে কমরেড ব্রেঝনেভ এই বক্তব্যকেই সূত্রায়িত করেছেন—"বহুদেশেই জাতীয়

মুক্তির জন্য সংগ্রাম বাস্তব অর্থে পরিণত হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধ শোষণমূলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।"

অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সহায়তায় এশিয়া আফ্রিকার কতিপয় দেশ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তনসমূহ আনবার জন্য সমাজতন্ত্র মুখীন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে যার ফলে সেই দেশগুলিতে সামাজিক বিরোধ ও সংগ্রাম কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের ফলশ্রুতি সামন্ততন্ত্রই নয়, পরন্তু সদ্য গড়ে ওঠা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও পরিচালিত হচ্ছে। এটাই হচ্ছে বিকাশের অধনতান্ত্রিক পথ বা দীর্ঘমেয়াদে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মূল লক্ষ্য।

"এশিয়া ও আফ্রিকায় একগুচ্ছ রাষ্ট্রের উদ্ভব হচ্ছে, যারা অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথ ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে, তারা ঘোষণা করেছে সমাজতন্ত্রই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ থেকে প্রমাণ হয় : জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুঁজিবাদ-বিরোধী ধারা কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়েছে।···এ কথা বলার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, অ-পুঁজিবাদী বিকাশের একটা সুনির্দিষ্ট অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (বোরিস পনোমারিয়ভ—বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক সমস্যাদি)

আরব মুক্তি আন্দোলন

আরব জাতিগুলির মধ্যে যারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, দীর্ঘ-মেয়াদে সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর লক্ষ্যে বিকাশের অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে—তাদের মধ্যে রয়েছে মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশগুলি। এইসব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির বিকাশে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবনতাটি হঠাৎ আসে নি বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্ত হয়নি দীর্ঘ ও তিক্ত শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আজকের এই প্রবনতাটি গড়ে উঠছে দৃঢ় হচ্ছে এবং এই দেশগুলিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত করেছে।

মিশরে ১৯৫২ সালে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব ও অন্যান্য আফ্রিকেয় দেশের নিকট তা দেখা দিয়েছিল একটা মোড় পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে। ১৯৫২ সালের এই বিপ্লব যেমন একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী ছিল তেমনি একই সঙ্গে এটা প্রাচ্য দেশসমূহের

প্রথম বিপ্লব যেখানে নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা বজায় ছিল। অন্যান্য বহু আরব ও আফ্রিকের দেশের নিকট মিশরের এই বিপ্লব ছিল অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ। প্রধানতঃ গোপন দেশপ্রেমিক গোষ্ঠীসমূহ নিয়ে গঠিত জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আলজেরিয়াতে বড় রকমের মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে বেশ বড় অংশের ওপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করল। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কংগ্রেসে আলজেরিয়ার জন্য একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং আলজেরীয় বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ আলজেরিয়ান রেভোল্যুশন্) গঠন করা হয়।

এই সময়কালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'সুয়েজ সংকট'। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে মিশরী জনগণের ওপর কর্তৃত্ব করার ইচ্ছেকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছিল। এই সময়ের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা হল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ওলোট পালোট। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল নগুইবকে সরিয়ে কর্ণেল গামাল আবদেল নাসের বিপ্লবী পরিষদের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন ও দেশকে আরো বাম দিকে নিয়ে যান। ১৯৫৬ সালে নাসের মিশরের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট নাসের একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুয়েজ খাল কোম্পানীকে জাতীয়করণ করলেন।

আফ্রিকার জনগণের নিকট এই ঘটনার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী, তাঁরা লক্ষ্য করল যে একটা সদ্যস্বাধীন দেশ কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মিলিত আক্রমণকে রাজনৈতিক ও নৈতিক ভাবে পরাস্ত করল। তারা আরো-ও দেখল যে সংকটকালে সোভিয়েতই একমাত্র দৃঢ়চিত্ত মিত্র। ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই মাত্র কয়েক ঘন্টার বিপ্লবে ইরাকী জনগণ সাম্রাজ্যবাদী দালাল দীর্ঘদিনের নুর এস-সৌদী সরকার ও রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করল।

অপর দিকে, এই সময়ে যদিও আলজেরীয় মুক্তিফ্রন্ট বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবু ১৯৬০ সালে নতুন করে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এল। ফ্রান্সকে অবশেষে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে মেনে নিতেই হল। ১৯৬২ র ১লা জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শতকরা ৯৯ জন আলজেরীয় নির্বাচক-মণ্ডলী দেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের নির্দ্বিধ মত দিলেন। যদিও ফরাসী একচেটিয়া পতিদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধে রয়ে গেল তবু আলজেরীয়

জনগণের উপনিবেশবাদের থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা পেল।

সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার

সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিবাদী-নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রশ্নটি সেই সব দেশকে চঞ্চল করেছিল তাহল অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা, সুদৃঢ় করা। জাতীয় স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করার অর্থই হল মূলতঃ অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠা যাতে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা অতি দ্রুত হ্রাস পায় সুনিশ্চিতভাবে। উপরোক্ত দেশগুলির নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে এই সমস্যাটি অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে দেখা দিয়েছিল যে পুঁজিবাদী পথে দেশকে পরিচালিত করলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়তেই হবে। তাঁরা খুঁজছিলেন এমন একটা পথ, যা সামাজিক অন্যায় অসাম্যকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করবে এবং বিকশিত করবে যাতে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীন সমাজের পুরনো বাধা বিপত্তি দূর হয়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই পর্যায়ে উপরোক্ত আরব দেশসমূহ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাধিক সহায়তা পেল সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে। আরব দেশগুলিতে যদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষি, তবু প্রায় প্রত্যেকটি দেশের জনগণের পরিচিতি ছিল স্থূল, আদিম পুঁজিবাদের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের সহ্য করতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন। এসব ছাড়াও সেই সব দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল উৎপাদিকা-শক্তির অত্যন্ত নিম্নমান, প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রাবল্য, জীবনযাত্রার অত্যন্ত নীচুমান, প্রলেতারিয়েতের নিদারুণ সংখ্যাল্পতা ও অনেকক্ষেত্রেই তাদের অনুপস্থিতি অর্থাৎ প্রলেতারিয় পার্টির অস্তিত্বহীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাবল্যই এই দেশগুলিকে অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথ বেছে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তি স্মরণীয়! "যদি···সোভিয়েত সরকারগুলি তাদের সর্বপ্রকার সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে অনুন্নত জাতিসমূহকে অনিবার্যভাবে বিকাশের ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের ভেতর দিয়ে

যেতেই হবে একথা ভাবা ভুল হবে। ...উন্নত দেশগুলির সর্বহারার সহায়তায় অনুন্নত দেশসমূহ ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে না গিয়েই, সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং বিকাশের কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমে পৌঁছতে পারবে।" (কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও উপনিবেশ সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট, লেনিন, সঃ রঃ—৩১শ খণ্ড, পৃঃ ২৪৪)

প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক অতীতের ফলশ্রুতি হিসেবেই এই আরব দেশসমূহে স্বাধীন শিল্প বিকাশ ঘটে নি, তেমনি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও খুব বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশ যেহেতু হয়নি, এই অংশটি তাই ছিল ক্ষীনকায় এবং শিল্পোৎপাদনে এদের অংশ ছিল তাই বিদেশী পুঁজির সেবাদাসত্ব করা পর্য্যন্ত।

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরও অতীতের উত্তরাধিকার অনুযায়ী এরা যতটা না শিল্পোৎপাদনে উৎসাহী ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল খুব দ্রুত মুনাফা অর্জনে। তাই এরা খুব দ্রুত ফাটকাবাজারী ব্যবসায় উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। মিশরের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। ১৯৫৬ সালে শিল্পোৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি নাসের দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে যতদূর সম্ভব সুযোগ সুবিধে এবং বাজারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শতকরা ৭৫ ভাগ পুঁজি লগ্নীই ছিল নগর নির্মাণ শিল্পে—যার থেকে মুনাফা আসে দ্রুত, পুঁজি আটকে থাকে না অনির্দিষ্ট কালের জন্য এবং পরবর্তীকালে যা নিয়ে সহজেই ফাটকাবাজারী চালানো যেতে পারে।

এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃপণ সাহায্য এই কৃষিপ্রধান দেশগুলিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা অপসারণের একমাত্র পথ দেখিয়েছে, বিজয়ী আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সহায়তায় দেশের স্বাধীন বিকাশে সাহায্য করেছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক সর্বহারার ভাবধারা এই দেশগুলির মেহনতী জনগণের মনে, তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনও করে চলেছে।

আরব দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যা পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্র সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তার আলোচনা করতে গেলে উপরোক্ত পটভূমিকাটি স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা আগেই দেখিয়েছি, মিশরের নিকট চপেটাঘাত খেয়ে সাম্রাজ্যবাদ

কেমন করে অন্যান্য আরব দেশগুলির ওপর তার প্রভুত্ব বিস্তারের নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পর্যায়ে মিশরকে সমর্থন জানানোর অজুহাতে জিঘাংসু সাম্রাজ্যবাদ সিরিয়ার রাজনীতিতে একই সঙ্গে ভিতর ও বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সিরিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টিও চলতে থাকলো। এ অবস্থায় সিরিয় পার্লামেন্টের বিধানে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরিয়া মিশরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করল।

১৯৫৮-৬১ সালে মিশর ও সিরিয়ার নাসের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন—ইডিও)-র নিয়ন্ত্রণাধীনে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর গড়ে তুললেন। ১৯৬০ সালের মধ্যে এই সংস্থার অধীনে ১০০টি প্রতিষ্ঠান ছিল যাদের মালিকানার ৫০ থেকে ১০০ শতাংশই ছিল সরকারের হাতে।

সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধাগুলিকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগালেও মিশরী বুর্জোয়া শ্রেণী নাসের সরকারের সঙ্গে কখনোই সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করেনি। দেশের মধ্যে অত্যাচার ও অসাম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র, বেকারী ও হতাশা বেড়েই চলেছিল। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রতিরোধী মনোভাব নিয়ে দেখছিল।

কিন্তু নাসের সরকার পুঁজিপতিদের নিকট মাথা নত করলেন না, পরন্তু ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, ইনস্যুরেন্স, এবং বহু শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য ও জাহাজী ব্যবসাও রাষ্ট্রের অধীনে আনা হল। ২৫ জুলাই ১৯৬১ তে ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক করা হল (২০০ ফেদ্দান থেকে ১০০ ফেদ্দান)। সঙ্গে সঙ্গেই চলল প্রভূত বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে অভিযান (campaign against Millionaires)—যার ফলে ৭০০ বৃহৎ পুঁজিপতির ৫০ কোটি মিশরীয় পাউণ্ডের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল।

১৯৬১-র পুঁজিবাদ-বিরোধী আইনসমূহ যদিও মিশর ও সিরিয়া উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, পরন্তু সিরিয় বুর্জোয়াশ্রেণী এর প্রতিরোধ ও বিরুদ্ধে আক্রমণ করল তীক্ষ্ণতার সঙ্গে। রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না বলে, এবং উপরোক্ত আইনসমূহের ফলে তাদের ধন-সম্পদ বিপুল পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় যেকালে মিশরীয় বৃহৎ ও মধ্য-বুর্জোয়াশ্রেণী প্রায় কিছুই করতে

পারেনি ; সিরিয়ার ক্ষেত্রে, দেশের অভ্যন্তরে মিশরীয় পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে ও রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বে মিশরীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তাকে কাজে লাগিয়ে সিরীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে বেড়িয়ে এল ।

এদিকে মিশরে কিন্তু প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রগাঢ় গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্কার ও পরিবর্তনসমূহ পুরোদমে কার্য্যকর করা হচ্ছিল। কৃষি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উৎপাদনের মূল উপাদানের শতকরা ৯০ ভাগ চলে এলো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অধীনে। সমগ্র লগ্নী ও ফিনান্স ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ রইল সরকারের। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে বৈদেশিক পুঁজি ও বাণিজ্যের মূল বিভাগগুলির ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপিত হল রাষ্ট্রের। অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪র মধ্যে বৃহৎ ও মধ্য বুর্জোয়াকে অর্থনীতির ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রায় পুরোপুরি বিচ্যুত করা হল। এর সঙ্গে সঙ্গেই চলছিল শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ। সমস্ত শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা হল।

সামরিক অভ্যুত্থানের পরে পরেই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগে এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ার সিরীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও ভূস্বামীবর্গ যতটুকু সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন হয়েছিল, তার অবসান ঘটাল। অনেকগুলি বৃহৎ শিল্পকে বি-জাতীয়করণ করা হল ; জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়িয়ে ৬০০ হেক্টর (১ হেক্টর = প্রায় ২.৫ একর) করা হল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে নীচুতলার জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাশীল অংশের এক তীব্র তীক্ষ্ণ শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে বাথ পার্টি ক্ষমতায় এসে জমির মালিকানার পরিমাণ আরো কমিয়ে সর্বোচ্চ ৩০০ হেক্টর করল এবং সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা জাতীয়করণ করল। এদিকে বাথ পার্টির ভেতরেই চলছিল তীব্র অন্তর্বিরোধ। এর থেকে বিজয়ী হয়ে আত্মপ্রকাশ করল পার্টির প্রগতিশীল অংশ। আর এর অব্যবহিত ফল হয়ে দেখা দিল : ১৯৬৩র ডিসেম্বরে বিদেশী খনি মালিকানা জাতীয়করণ অর্থাৎ দেশের বুক থেকে বিদেশী পুঁজির উচ্ছেদ। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে দেশের ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ

শিল্প জাতীয়করণ করা হল। বর্তমানে দেশের শিল্পোৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের হাতে রয়েছে।

শিল্প পরিচালনায়ও বেশ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শিল্প-পরিচালনা সম্পূর্ণতঃ শিল্প ক্ষেত্রের সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের প্রধান পরিচালকের কর্তৃত্বে রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের পরিচালন ব্যবস্থা ন্যস্ত রয়েছে প্রতি উদ্যোগে ৭ জনের এক প্রশাসনিক পর্ষদের হাতে। এদের মধ্যে ৪ জন শ্রমিকদের প্রতিনিধি, একজন ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও অপর দু'জনের একজন স্থানীয় বাথ সংগঠনের কর্মী ও একজন সরকার নিযুক্ত ডিরেক্টর। যদিও কৃষির ক্ষেত্রে অবস্থাটা এত দ্রুত বদলাচ্ছে না, পরন্তু ধীরে হলেও ভূমি ও কৃষি সংস্কার চালু রয়েছে। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ হল অন্যান্য আরব দেশের মত সিরিয়াতেও ভূস্বামীরা স্থানীয় বুর্জোয়াদের থেকে অনেক বেশী সংগঠিত ও শক্তিশালী।

আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ আনা এত দ্রুত সম্ভবপর হয়নি বা এত সহজসাধ্যও ছিল না। প্রথমতঃ, জাতীয় স্বাধীনতার যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বিদেশী একচেটিয়া বিশেষ করে ফরাসী একচেটিয়াপতিদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধেগুলি প্রায় অটুটই রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকে য়োরোপের যে অধিবাসী-বৃন্দ ওখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছিলেন (যাদের আমরা বলতে পারি শ্বেতকায় অধিবাসী) তারা একেবারেই পছন্দ করেন নি। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পরেই শতকরা ৮৫ জন য়োরোপীয় শ্বেতকায় অধিবাসী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় শিল্প উৎপাদন ও জাতীয় অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল। এর অর্থ ছিল, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, কারিগরি বিশেষজ্ঞ এই শ্রেণীর লোকের বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগ। ফলে বহু কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ল—এবং স্বদেশীয় শ্রমজীবী জনগণের উপার্জনের উপায় বন্ধ হয়ে গেল।

এ অবস্থায় সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন সোভিয়েত সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। তাদের ও অন্যান্য আরব দেশসমূহের বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে শ্রমজীবী জনগণ এইসব উদ্যোগকে নিজেরাই পুনরায় চালু করল। তারা নিজেদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে শিল্প উদ্যোগ ও কৃষিকার্যের

পরিচালন ভার অর্পণ করল। সরকার পরিচালন-ব্যবস্থার এই নতুন দিককে স্বাগত জানিয়ে সরকারী আইন অনুযায়ী এই ব্যবস্থাকে বলবৎ করলেন। এমনকি যেসব আলজেরীয় পুঁজি মালিক বিদেশীদের শিল্প উদ্যোগ বা ব্যবসা-বাণিজ্য কিনে নিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রেও পরিচালন-ব্যবস্থার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিই কার্যকর করা হল।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের ডিক্রী দ্বারা কৃষির ক্ষেত্রে এবং আলজেরিয়ার গ্রামীন জীবনে এক বিরাট কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত করা হল। পূর্বতন য়োরোপীয় ভূম্যধিকারী-বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রিত লাভিফান্দিয়ার উচ্ছেদ করে কৃষিমজুর ও দরিদ্র কৃষকদের সমবায় সংস্থার হাতে কৃষির পরিচালন-ভার দেওয়া হল।

অপরদিকে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ধাপে ধাপে সরকার সমগ্র বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী তৈল ও অন্যান্য একচেটিয়া উদ্যোগকে জাতীয়করণ করল। ১৯৬৮ সালের মধ্যেই, দেশের সমগ্র শিল্পোৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ রাষ্ট্র-কর্তৃত্বে চলে আসে। ১৯৭০ সালের মধ্যে সমগ্র তৈল উৎপাদন, বণ্টন, মূল্যনির্ধারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অধীনে আনা হয়। ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা পুরোপুরি বিলোপ করা হয়।

আরব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিসমূহ

আলোচ্য দেশসমূহের উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন প্রধানতঃ ভিত্তি করেছিল কৃষিজীবী জনগণের ওপর। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিজীবী জনগণ কোনো সমসত্ত্ব শ্রেণী ছিল না, এদের মধ্যে নানা স্তর বিদ্যমান ছিল। সামাজিক স্তর বিন্যাস ও স্তর ভাগের দরুণ এইসব দেশগুলির পুরনো সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি প্রায় অটুটই থেকে গিয়েছিল। গ্রামীন সমাজের এই প্রথাভিত্তিক ব্যবস্থা তাই দরিদ্র কৃষক ও গ্রামীন সর্বহারার সঙ্গে ধনী ও শিক্ষিত কৃষিজীবীর বিরোধকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেনি। তাই শেষোক্ত স্তরের লোকেরাই সমগ্র কৃষক জনগণের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছিল। আর এই শ্রেণীর বিত্তবান কৃষকেরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায়নি।

এই সব কারণগুলির জন্যেই অনেকাংশে আরব দেশগুলির উপনিবেশ-

বিরোধী সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত ছিল বড় বড় শহরগুলিতে। এই সব শহরগুলির রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সক্রিয়তায় মূল ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ গ্রামীন সমাজের উপরতলা থেকে আসা ও পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর।

অপর দিকে সামাজিক চলিষ্ণুতার প্রধান বাহনই হচ্ছে এই সব দেশের কৃষিজীবী জনগণ, সেইজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সংস্কারের ও কৃষি বিপ্লবের প্রশ্নটি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে এই সব দেশগুলিতে। এই সব দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী জনগণ কতটা সংগঠিতভাবে যুক্ত হতে পেরেছে তার ওপর প্রধানতঃ নির্ভর করছে সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের চরিত্র।

আগে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহের কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে ভূমি সংস্কারের দরুণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সেকটরের অধীনে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায় যে সব নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে এই সব দেশে তাতে কাজ করার জন্য যে নতুন শিল্প-শ্রমিক গড়ে উঠেছে তারা এসেছে কৃষিজীবী জনগণের মধ্য থেকে। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ যেমন যেমন কাজ করে চলেছে তার সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শিল্প উদ্যোগ ও কৃষির পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই বহুল গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে ও হচ্ছে। পরিচালন ব্যবস্থায় ক্রমশঃই আরো বেশী সংখ্যায় শ্রমজীবী ও অ-শোষক শ্রেণীভুক্ত জনগণ অংশগ্রহণ করছে।

মিশরের ক্ষেত্রে মূল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন। এদের ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ৭০ লক্ষেরও বেশী সদস্যযুক্ত এই রাজনৈতিক দলটির শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী সভ্য হচ্ছে শ্রমিক এবং কৃষক। রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত ওপর তলার সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোকেরা এর সদস্য হতে পারেনা। কিন্তু একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এই পার্টির মতাদর্শ পুরোপুরি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির। পূর্বের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়েছি যে আরব জনগণের মুক্তি আন্দোলনের এক বৃহৎ অংশ যদিও এসেছে কৃষিজীবী পরিবারগুলি থেকে, কিন্তু শিক্ষা দীক্ষায় ও সামাজিক অবস্থানে প্রধানতঃ নিম্নবিত্ত শ্রেণীগুলি থেকে মধ্যবর্তী স্তর একটা

'আলোকপ্রাপ্ত সমাজে' সংগঠিত হয়েছিল। যেহেতু এরাও সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিবাদ দ্বারা শোষিত হয়েছে তাই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সাম্য ও ন্যায়ের প্রবক্তা এরা। এই শ্রেণীর অ-সর্বহারা অ-শোষক গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিরা আরব সোস্যালিস্ট ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয়। এবং এদের মতাদর্শই মূলত পার্টির মতাদর্শ। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় স্তরটি যত অগ্রসর হচ্ছে, সমাজ কাঠামোর ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন যত বেশী গভীরভাবে গণতন্ত্রমুখী ও পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা সম্পন্ন হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ততই এই শ্রেণীর মতাদর্শে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

মনে রাখার প্রয়োজন আছে যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রধানত এই মধ্যবর্তী স্তরের হাতে রয়েছে অতএব এই স্তর তাদের পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী-ভিত্তিকে পুরোপুরি ছাড়িয়ে উঠতে পারেনা সর্বদাই। সরকার ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে এদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ সুবিধাগুলি হারাতে চায় না—ফলত এরা নয়া-উপনিবেশবাদী চক্র ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার বিশেষ করে গ্রামীন বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে মিলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চরিত্রে দক্ষিণপন্থী ভাবধারা নিয়ে আসতে পারে। সিরিয়া ও ইরাকে এই ঘটনাই ঘটেছিল। সিরিয়ার বাথ পার্টির মধ্যে মুমুধান দুই পক্ষের লড়াইতে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ হটে যেতে বাধ্য হয়।

আলজেরিয়ার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি প্রায় একই রকম। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট যা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ও সরকারে রয়েছে—তারা প্রধানত এই পেটি-বুর্জোয়া মধ্যবর্তী স্তরের জনগণের সংগঠিত শক্তি। এদের আশু লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রসমূহের পীঠস্থান ও সংগঠিত হবার ভিত্তি-ভূমি পুরনো গ্রামীন সমাজকে ভেঙ্গে দরিদ্র চাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরদের হাতে জমি বণ্টন, এই শোষিত শ্রেণীগুলির সমবায় সংস্থাসমূহের হাতে পরিচালনব্যবস্থা অর্পণ ইত্যাদি। ১৯৬৩-র মার্চের ও ১৯৭১-এর মার্চে ভূমি সংস্কারের দলিল এইসব ব্যবস্থার আশু প্রয়োগের কথা ঘোষণা করেছে।

ইরাকের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্তরের এই দোদুল্যমানতা ও ক্ষমতালিপ্সার প্রমাণ জাতীয় জীবনে ক্রমে ক্রমে এই অংশের দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া ধারাটির কার্যকলাপ। ১৯৫৮র বিপ্লবের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেখানেও ছিল প্রধানত এই শ্রেণীর পেটি-বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন শক্তিসমূহের

হাতে। কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ এদেরকে ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রের স্বার্থে কাজ করছিল যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। অন্যদিকে বিপ্লব পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর যে অংশটি ছিল বামপন্থী মতাবলম্বী, দেশীয় পুঁজিবাদের বিকাশের পরিপন্থী, তাদের ও শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক জনগণের সঙ্গে উপরোক্তদের শ্রেণী-বিরোধ তীব্রতা অর্জন করে। শেষোক্ত শ্রেণীগুলি চাইছিল সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ, সোভিয়েতসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ও কার্যকর সম্পর্ক, জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোর দ্রুত শোষণাবসানমূলক পরিবর্তনসমূহ। দীর্ঘদিন পূর্বোক্তদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে—বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি। অবশেষে ১৯৭৩-এর বিপ্লবে আরব বাথ সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি সে দেশের দক্ষিণপন্থীদের উচ্ছেদ করেছে, সমগ্র তৈল সম্পদ রাষ্ট্রীয়-করণ করেছে এবং সামাজিক প্রগতির সংস্কারসমূহকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি আরব মুক্তি আন্দোলনে রাজনৈতিক শক্তির আধার হল শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবর্তী স্তরের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শ্রেণীসমূহ। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই অশোষক, বামপন্থী বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মধ্যস্তরের শ্রেণীসমূহকে বলা হয়েছে বিপ্লবী গণতন্ত্রী। এদের চরিত্র লক্ষণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, সামন্ততন্ত্র-বিরোধিতা, পুঁজিবাদ-বিরোধিতা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ও কার্যকর মিত্রতা স্থাপন। এদের অর্থনৈতিক আশু লক্ষ্যও উপরোক্ত চরিত্র থেকেই উদ্ভূত। যদিও এরা শোষণাবসান চায়, কিন্তু যেহেতু এদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রত্যক্ষ ভাবরে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে না তাই এরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা থেকে এখনও দূরে। এরা গরীব কৃষক জনগণের স্বার্থে ভূমি সংস্কারে আগ্রহী ও সামাজিক অসাম্যের অবসান চাইলেও, এদের পুরনো ঐতিহ্য, ধর্ম সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে মোহান্ধতা, এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময়েই এদের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও মতাদর্শ গ্রহণে বাধা দিলেও, যেহেতু মূলত এরা অ-শোষক শ্রেণীভুক্ত তাই এরা নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে সামাজিক অগ্রগতির বিশিষ্ট পর্যায়ে পেটিবুর্জোয়া

শ্রেণীর অব্যবহিত ও সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধে উঠতে পারে। আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের স্থান তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা সমাজ জীবন থেকে ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উপাদান সমূহকে বিদূরিত করে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের ভিত্তি তৈরী করছে তাকে আমরা অভিহিত করতে পারি সকল অ শোষকশ্রেণীর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব হিসেবে। এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধুমাত্র সীমিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয় বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মত পুঁজিবাদী বিকাশে উৎসাহী নয়; আবার সমাজতন্ত্র নির্মাণও এদের এই মুহূর্তে ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু এর প্রবনতা ক্রমশই বেশী করে আরো গভীরভাবে সমাজতন্ত্রমুখীন হচ্ছে। এই জন্যেই উপরোক্ত দেশসমূহকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রবাহিনী বলা হচ্ছে।

আরব মুক্তি আন্দোলনের দুর্বলতা ও অন্তর্নিহিত শক্তি

আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিস্তৃতি, গভীরতা ও তীব্রতা বৃদ্ধিতে উপরোক্ত দেশমূহের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য-দূরীকরণের সংগ্রাম বিগত দুই দশক ধরে এই অঞ্চলের জনগণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যদিও, অন্যান্য এশিয় ও আফ্রিকের দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গুণগত পরিবর্তন সূচিত করলেও কতকগুলি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামনে বর্তমানে অনেকটি সমস্যা খুব গভীরভাবে দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বিগত ৭ বছরেরও অধিককাল ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্রায়েল আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ আনবার জন্য, এ অঞ্চলের বিশাল তৈল সম্পদকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, ও সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালের জুনমাসে ইস্রায়েলী আগ্রাসনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তার সঙ্গে এখন আরোও যুক্ত হয়েছে কতকগুলি দেশের অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবর্ধমান শক্তি।

এই সব শক্তিগুলি আরব জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করছে. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতর করতে চেষ্টা চলেছে। অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে এই সব দেশে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে ও কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগকে ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াসের ঘটনাও বিরল নয়।

এ ব্যাপারে মিশরের বর্তমান অবস্থা সর্বাধিক দায়ী এবং আরব জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে গভীর বিভেদের বীজ বপন করছে। নাসেরের মৃত্যুর পর থেকেই এই প্রক্রিয়াটি শক্তিসঞ্চয় করে চলছিল। এর প্রথম প্রকাশ রাষ্ট্র ও সামরিক কর্তৃত্ব থেকে প্রগতিশীল, সোভিয়েতের মিত্র ও সামাজিক অন্যায় দূরীকরণে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সরিয়ে দেওয়া ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাসের নেতৃত্ব ও প্রশাসন যে সব সাফল্য অর্জন করেছিল তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া ; রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করার মধ্য দিয়ে, ভূস্বামীবর্গ ও মধ্য বুর্জোয়াদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে।

লিবিয়াতেও কোরাদাফি শাসন অন্য দিক থেকে আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস চালাচ্ছে সিরিয়ার প্রতি তার মনোভাবের দ্বারা। লিবিয়ার শাসকবর্গ এমনকি উত্তর ইয়েমেন ও সৌদী আরবের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রগতিশীল সরকারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত করার পক্ষে যুক্তিতে একই সঙ্গে আরব ঐক্য ও সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

এর কারণসমূহ নিহিত রয়েছে অভ্যন্তরীন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। মিশরের ক্ষেত্রে এই কারণগুলো হল মধ্যবর্তী স্তরের বুদ্ধিজীবীরা যারা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আগত তাদের এক অংশের ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ। একথা জানা আছে যে যদিও বৃহৎ ও মূল শিল্প সমূহের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হাতিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল, পরন্তু নির্মাণকার্য, ছোটোখাটো শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যত ছিল না। বৃহৎ সংখ্যক পেটিবুর্জোয়ারা প্রধানত এই সব শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে গত কয়েক বছরে প্রভূত সম্পদ অর্জন করেছে। এদের মধ্যে দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছিল। নাসেরের মৃত্যুর পর সরকারী

দুর্বলতার সুযোগে এতদিন চুপচাপ বসে থাকা নখ-দন্তহীন বুর্জোয়ারা এদের মদদ দিতে শুরু করল।

অন্যদিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যালঘুতা ও তার পার্টির অনুপস্থিতি বিপ্লবী গণতন্ত্রী শক্তিসমূহকে তার মতাদর্শে নিয়ে যেতে পারেনি। বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্তরের বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দের মনে সমাজতন্ত্র ও আরব মুক্তির যে ধারণাটি ছিল তার অনেকখানিই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পুরনো সমাজের ঐতিহ্যবাহী। প্রেসিডেন্ট নাসেরের শাসনকালে রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি আরো শক্তি অর্জন করে ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মিলেছে চীনের বিভেদ-পন্থীদের প্রচার যে সোভিয়েতও মার্কিনদের মত এই সব দেশে শোষন চালাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণার অভাব এই ধরণের প্রচারের কাজে দৃঢ় বিরোধিতা গড়ে তোলায় বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এই সব ঘটনাবলীর ফলে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে বা যাবে। আসলে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিষয়গত পরিস্থিতির বাধা বিশেষ করে শ্রমিকদের শক্তি ও সংখ্যা যেটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের প্রধান অংশই যেহেতু পুরনো কৃষি সম্পর্কের ঐতিহ্য নিয়ে আসছে তাতে বাধা আরোও বড় মনে হলেও অন্যান্য কয়েকটি শক্তিশালী গুণগত পরিবর্তন এই আন্দোলনকে আবার ভিতর থেকে শক্তিও জোগাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, বিরুদ্ধ প্রচার সত্ত্বেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ক্রমবর্ধমান সামরিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য এই সব দেশের আন্দোলনে সর্বহারার অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং পশ্চাদপদ ধ্যানধারণা থেকে ক্রমশ মুক্তি দিচ্ছে এ ব্যাপারটা ক্রমশই আরো বেশী করে এ অঞ্চলের জনগনের নিকট সুপরিস্ফুট হচ্ছে। যার প্রমাণ গত বছরে অনুষ্ঠিত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলনে আলজেরিয়ার হুয়ারী বুমেদিনের ঘোষনা—যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাহায্য সাম্রাজ্যবাদ ও নয়াউপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের নিশ্চিতি, গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রী।

অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে—ইরাকে প্রগতিশীল বাথ পার্টি কর্তৃক ক্ষমতা দখল, সমগ্র বিদেশী তৈল কোম্পানীর জাতীয়করণ ও ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি ও বাথ সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা। আলজেরিয়ার প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তন আনয়নকারী ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যসমূহ কৃষি বিপ্লবের সনদ ও ভিক্রীর বলে যা ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকর করা শুরু হয়ে গেছে। ইরাক, সিরিয়া, গণতন্ত্রী দক্ষিন ইয়েমেনে প্রগতিশীল জাতীয় ফ্রন্টসমূহের প্রতি অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সমর্থন। সিরিয়ায় সমগ্র তৈল ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি।

আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আরেকটি বড় দুর্বলতা হল, যদিও সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন এ অঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রী শ্রেণীসমূহের স্বার্থকে প্রতিফলিত করছে, তবু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলি সত্যিকারের গণ-পার্টি হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানে আরব জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের বিভিন্ন দলগুলি বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এই দিকে সক্রিয় হয়ে উঠছে। এর প্রতিফলন ঘটছে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ও শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হবার আকাঙ্খায়—বিশেষ করে প্রক্রিয়াটি বিকশিত হচ্ছে মিশরেই। অন্যত্র কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনগুলিও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অন্য দিকে পেটিবুর্জোয়া "বুদ্ধিজীবীদের যে অংশটি বামপন্থী হঠকারিতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামও ক্রমশঃই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি, মতাদর্শ ব্যতীত যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমাজতন্ত্রে বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য তার প্রমাণ মিশর ও লিবিয়ার ঘটনাবলী, অপর দিকে এদের অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সক্রিয়তা যে উত্তরণকালীন পরিস্থিতির বিকাশ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহ ও শোষিত শ্রেণীকে ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় টেনে নিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ ইরাকের ঘটনা। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল প্রয়াস চালিয়ে একটি জাতীয় ফ্রন্টে মিলিত হয়েছে এই ঘটনা আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসমূহের নিকট দিকনির্দেশক হয়ে উঠেছে। ক্রমশই যে কমিউনিস্ট পার্টি এ অঞ্চলের জাতীয় মুক্তির ও সামাজিক প্রগতির আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে তার প্রমান মিলবে তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাবে।

ভারত সরকারের নীতি ঃ ভারতে ধনতন্ত্রের প্রসার

চারুব্রত রায়

পঞ্চম যোজনার উপক্রমনিকায়[১] বলা হয়েছিল যে, ভারতের ২০ কোটি লোক (অর্থাৎ তখনকার হিশেবে দুই-পঞ্চমাংশ) দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন-ধারণ করে। দুবছর পরে কেন্দ্রীয় যোজনা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মোহন ধারিয়া বললেন যে, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী (অর্থাৎ প্রায় ৩৮ কোটি) দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন নির্বাহ করে।[২] এর মানে গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্গতিও এদের নেই। যে সময়ক্রমে এই বিভীষিকাচ্ছন্ন দারিদ্র্য-কবলিত ভারতবাসীর সংখ্যা ২০ কোটি থেকে ৩৮ কোটিতে বেড়েছে, সেই সময়টা হল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্থিত 'গরীবী হঠাও' প্রতিশ্রুতি পালনের পর্যায়।

ভয়াবহ বেকারী, অকল্পনীয় মূল্যবৃদ্ধি, অসহনীয় দারিদ্র্য—এই তিন অভিশাপ প্রতিফলিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ধনতান্ত্রিক পথে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কংগ্রেস বিভক্তিকরণের পরবর্তী-কালেও এই ধনতান্ত্রিক পথকে যে বিন্দুমাত্র আঘাত করা হয় নি, বরং তার গতিকে অব্যাহত রাখা হয়েছে, তার প্রমাণ মেলে জনগণের জীবনে এই অবর্ণনীয় দুর্গতির ঘনীভবনে। 'গরীবী হঠাও' প্রতিশ্রুতি পালন করতে গেলে যে মূল জায়গায় আঘাত করা অনিবারণীয় শর্ত, তা হল ধনতান্ত্রিক পথকে আঘাতমুক্ত করা। ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়াদের নীতি এর বিপরীত—অর্থাৎ যা কিছুই করা হবে, তার মৌলিক শর্ত ধনতান্ত্রিক পথকে মান্য করা। এ কারণেই গরীবী হঠাও আর ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ একই সঙ্গে চলতে পারে না। সেক্ষেত্রে গরীবী হঠাও শ্লোগানসর্বস্ব প্রতারণায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। সমগ্র সমাজকাঠামো এক সামগ্রিক অন্তর্লীন সূত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে গ্রথিত করে রাখে যে, এক অঙ্গ অন্য প্রত্যঙ্গের সঙ্গে অবিভাজ্য ও পরস্পর

সম্পর্কিত। সেজন্যেই একদিকে যদি বৈষম্য বর্ধিত হয়, অন্যদিকে হবে সমৃদ্ধির পুষ্টি। তাই দারিদ্র্য বেকারীর বিপরীতে ধনকুবেরদের সম্পত্তি বৃদ্ধি ঘটে। ধনতন্ত্র পুষ্টিলাভ করে দারিদ্র ও বেকারীর ক্রমবৃদ্ধিতে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও বেসরকারী মুনাফালিপ্সার মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এই সমস্যাগুলিকে ঘনীভূত করে। কিন্তু মূলত, ধনতন্ত্রের প্রয়োজনেই দারিদ্র্য ও বেকারী, মূল্যবৃদ্ধিও বটে। দারিদ্র্য ও বেকারী যখন বেড়েছে, তখন ধনকুবেরদের (বিশেষত, একচেটিয়াপতিদের) শ্রীবৃদ্ধি অবধারিত। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। মার্চ ১৯৭১-এর হিসেবে প্রথম ১৩টি একচেটিয়া সংস্থার সম্পত্তি ২৮০৫ কোটি টাকা। মার্চ ১৯৬৯ ও মার্চ ১৯৬৬তে এই সম্পত্তি ছিল যথাক্রমে ১৪২৭ কোটি টাকা ও ১৮৮১ কোটি টাকা। ১৯৬৯ ও ১৯৬৬ সালে অবশ্য প্রথম ১৩টি বলতে গেলে দু'তিনটি সংস্থা বাদ যেতো। সে যাই হোক, নব পর্যায়ের কংগ্রেস শাসনকালে একচেটিয়া পুঁজিকে অবরোধ করা হয়েছে বলে যারা ভেবে এসেছেন, বা যারা একচেটিয়া পুঁজিকে বাধা দিতে শাসক কংগ্রেস বদ্ধপরিকর মনে করে 'ইন্দিরা গান্ধীর হাত শক্ত করো' বা[illegible] আওয়াজ তুলেছিলেন, তাদের মোহভঙ্গ ঘটছে।

মনোপলি এণ্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস কমিশন বসানো হল আইন পাশ করে, যাতে লাইসেন্স প্রদান সহ অন্যান্য ব্যাপারে সম্পদ কুক্ষিকরণ না ঘটে ও একচেটিয়াপতিদের ক্রমবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ১৯৭১ সালে নির্বাচনের আগে এসব করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, ক্ষমতাসীন সরকার একচেটিয়া পুঁজিকে আঘাত করতে প্রস্তুত নয়, বরং তাদের সঙ্গে সহাবস্থানেই বেশি আগ্রহী। বিধিবদ্ধ মনোপলি কমিশন তাদের ১৯৭২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলেছে "কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপুলাকার ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক আবেদন কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনে প্রেরণ না করেই নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন একথা মনে না করে পারে না যে, কোথাও একটা অসঙ্গতি রয়েছে যেজন্য অনেক গৌণ আবেদন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়, অথচ প্রাথমিক পরীক্ষাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিবেচনা যোগ্য বিষয়গুলি পাঠানো হয় না।"[৩] কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি জে এল জৈন গত এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে কোম্পানী আইন সমীক্ষা চক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যে আইন বলে কমিশন বসানো হয়েছিল, সে আইনে

যা প্রত্যাশা ছিল, কমিশন তার থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৩] ১৯৭০ সালের জুন মাসে গৃহীত আইনে তার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল : to ensure that the ownership and control of material resources of the community are so distributed so as to subserve the common good and that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and the means of production to the common detriment। আইনের ভূমিকায় বলা হয়েছিল to ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to the common detriment to control monopolies, to prohibit monopolistic and restrictive trade practices।" এত গালভরা কথা বলা হয়েছে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে। আর ঠিক তার পরেই দেখা গেল যে, নিঃশব্দ চরণে ক্ষমতাসীন সরকার একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে হৃদ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে। ১১-২০ নভেম্বর '৭৩ লোকসভায় প্রদত্ত জনহিসাব কমিটির রিপোর্টে দেখা গেল যে, একচেটিয়া তালিকায় আরো ১৭টি সংস্থা বেড়েছে। অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যেই ২২.৭ শতাংশ নতুন একচেটিয়াপতিদের অভ্যুদয় ঘটেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদের কথা পূর্বাহ্নেই বলেছিল। তার কারণ আর কিছু না। অ-একচেটিয়া পুঁজিপতি ও একচেটিয়াপতিদের সাদৃশ্য এক জায়গায় : উভয়েরই চরিত্র শোষণমূলক। তাছাড়া এদের থেকেই নতুন নতুন একচেটিয়ার উৎপত্তি ঘটে। একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে (১৯৭১) খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : "কংগ্রেসী শাসন তার মূল শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তন করবে বা ধনতান্ত্রিক পথ পরিত্যাগ করবে এরকম মোহ পোষণ নিষ্প্রয়োজন।"

শাসক কংগ্রেস যে লোকসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল বলেই একচেটিয়াবিরোধী মানসিকতা গ্রহণ করেছিল তার অন্য নজিরও রয়েছে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে জেতার এক বছর পরেই উত্থাপিত হল কুখ্যাত টাটা প্রস্তাবিত ৌথ সংস্থা, যা ১৭.৫.৭২ তারিখে স্মারকলিপি আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

পেশ করা হয়েছিল। টাটা যে নিজে থেকেই এই প্রস্তাব দিয়েছিল, একথা ভাবার কোন কারণ নেই। কারণ বণিক সংঘ FICCI-এর অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ছমাস আগেই তার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন : "বৃহৎ শিল্প ভবনগুলির প্রসারণের প্রধান সুযোগ রয়েছে 'মূল' ও 'ভারী বিনিয়োগ' ক্ষেত্রে যেখানে তারা তাদের বিশিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অনুরূপ অবদান রাখতে পারে। তবু বৃহৎ ভবনগুলিও সরকারী আর্থ সংস্থা থেকে বড় রকমের সাহায্য ছাড়া এই সব ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাতে পারে না। এজন্যেই আমরা যৌথ সংস্থা উদ্ভূত করার গুরুত্বের উপর এত জোর দিচ্ছি।··· একটা জরুরী শিল্প সমাজে প্রয়োজন বৃহৎ সংগঠন, যা একা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পক্ষে গড়ে তোলা একেবারেই সম্ভব নয়। পরন্তু একটা গণতান্ত্রিক ও মুক্ত সমাজের প্রয়োজন রয়েছে একটা 'কর্পোরেট' কাঠামোর।"

এটা অস্বাভাবিক নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ক্রমবিস্তৃতি ও প্রাধান্যবৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক পথের প্রতিকূল। কাজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে আঘাত করার জন্য সুকৌশলে যৌথ সংস্থার অবতারণা। পরন্তু, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে বেসরকারী (বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্প পুঁজিপতিদের) ক্ষেত্রের স্বার্থে ব্যবহার করাও হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে কিভাবে বেসরকারী পুঁজির শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে, তার প্রমাণ মেলে বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ঋণের হিসেব থেকে। ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে তাদের ঋণ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৭২১ কোটি টাকা, ৯০৫ কোটি টাকা ও ১০৩৭ কোটি টাকা।[৫] ১৯৭২-৭৩ সালে জীবনবীমা কর্পোরেশন মোট প্রদত্ত ঋণের ৪২ শতাংশ দিয়েছিল বৃহৎ বাণিজ্য ভবনগুলিকে।

স্পষ্টতঃ, এর পরিপ্রেক্ষিতেই মনোপলি কমিশনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। বড় রকমের প্রসারণের জন্য ৪০০টি বড় বড় শিল্পসংস্থার লাইসেন্স আবেদনের মধ্যে মাত্র ৩২টি পাঠানো হয়েছে কমিশনের কাছে।[৬] অন্যদিকে, একথাও ঠিক যে, কমিশন আইনের মধ্যে এমন অনেক ফাঁক আছে, যার দ্বারা কিছুই আটকে রাখা যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারেন্সী এণ্ড ফিন্যান্স রিপোর্ট-এ (১৯৭২-৭৩) দেখা যাচ্ছে যে, জুন ১৯৭০ থেকে মার্চ ১৯৭৩-এর মধ্যে প্রেরিত ৬৩টি নতুন শিল্প লাইসেন্স আবেদনের একটিও প্রত্যাখ্যাত হয় নি; ১১টি অনুমোদিত, ১টি প্রত্যাহৃত ও ৫টি কমিশনে প্রেরণ অপ্রয়োজনীয় বলা

হয়েছে। আর প্রসারণের জন্য প্রেরিত ২৭২টির মধ্যে ৮০টি অনুমোদিত, ৬টি প্রত্যাখ্যাত, ২৩টি প্রত্যাহৃত ও ৮০টি কমিশনে প্রেরণ অপ্রয়োজনীয় বলা হয়েছে। কমিশন যে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না বা কমিশনকে পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না, একথা কমিশনের অন্যতম সদস্য ডঃ এইচ'কে পরাঞ্জপে এবছরে প্রদত্ত কালে স্মৃতি বক্তৃতামালায় বলেছেন : "এম. আর. টি. পি. আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার ফলে পরস্পর যুক্ত অনেকগুলি সংস্থার গোষ্ঠী বা অন্য আকারের সংস্থা-সমাবেশ ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে, যদি দেখা যায় তারা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে।"[৭]

নব পর্যায়ের কংগ্রেস শাসনকালে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যে পুষ্টিবৃদ্ধি ঘটেছে, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ১৯৬৪, ১৯৬৬ ও ১৯৭১ সালে টাটা ও বিড়লার সম্পত্তির পরিমাণ (কোটি টাকায়) যথাক্রমে ৪১৮ ও ২৯৩, ৫০৫ ও ৪৫৮ এবং ৭১১ ও ৬৮৭। অর্থাৎ বিড়লার বৃদ্ধি হার অনেক বেশি যেজন্য টাটা ও বিড়লার সম্পত্তি প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা আই-সি-আই-এর সম্পত্তি ১৯৬৪, ১৯৬৬ ও ১৯৭১ সালে যথাক্রমে ৩৭ কোটি, ৫১ কোটি ও ২২৯ কোটি টাকা। তার মানে কংগ্রেস বিভক্তিকরণের পরে এই বিদেশী সংস্থার সম্পত্তি ৩০০ শতাংশেরও বেশি হারে বর্ধিত হয়েছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, বহুজাতিক সংস্থার প্রসার নয়া উপনিবেশবাদ কায়েম হবার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। আর একটি লক্ষণ, একচেটিয়াদের ক্রমপর্যায়ের পরিবর্তন আই-সি-আই ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে ছিল যথাক্রমে ১৯তম ও ১৮তম স্থানে। ১৯৭১ সালে তাদের স্থান হল তৃতীয়। ডঃ পরাঞ্জপে সখেদে বলেছেন : "সমাজতন্ত্র ও গরীবী হঠাও মুখে অনেক বলা হলেও, নীতি-নির্ণয়কারী নির্বাহী যন্ত্রকে পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক নীতিকে প্রয়োজনীয় নতুন দিকনির্দেশিত করার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে।...১৯৬৯-৭০-এর গৃহীত নীতিগুলি কার্যকর করা হয় নি। তার ফলে বড় বড় শিল্প ভবনগুলি শুধু অস্পষ্ট থাকে নি, আরো বর্ধিত হয়েছে।...এসটাবলিশমেন্ট কেবল চেষ্টা করছে বিদেশী পুঁজি, ব্যাপক বিদেশী সাহায্য ও বড় বড় শিল্প সংস্থার প্রতি ক্রমবর্ধমান পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি তার অবারিত রাখার পুরানো দিনগুলিতে ফিরে যেতে।"[৮]

মনোপলি কমিশনের একজন সদস্যের উক্তি থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে,

সরকারের শিল্পনীতি এমনভাবে আবদ্ধ যে, মনোপলি কমিশনের উপযোগিতা খর্ব হতে বাধ্য। যদি সরকারী নীতিই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পক্ষে যায়, তবে একটি কমিশন একা কিছুই করতে পারে না। আজকে মনোপলি কমিশন তাই অনেকটা সাইনবোর্ডে পরিণত। ১৯৬৯-৭০ সালে যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা আভাষ পাওয়া গিয়েছিল, ১৯৭২ সালে তা' বাস্তবায়ন সুস্পষ্টভায় পর্যবসিত হল। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। ফেব্রুয়ারী ১৯৭০এ ঘোষিত শিল্প লাইসেন্স নীতিতে বলা হয়েছিল: "শিল্প লাইসেন্স নীতি তদন্ত কমিটি অভিভাবিত যৌথ সংস্থা ধারণা নীতিগতভাবে গৃহীত হল। বেসরকারী সংস্থা গোষ্ঠী গৃহীত বড় প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রয়োগ করতে সরকার প্রয়াস চালাবে।" উক্ত কমিটি (যা দত্ত কমিটি নামে পরিচিত) যৌথ সংস্থা বলতে যা বলেছিল তা হল: বড় বড় সংস্থাগুলিকে যৌথ সংস্থায় পরিণত করা এবং প্রদত্ত ঋণকে ইকুয়িটি শেয়ারে পরিণত করে ঐ সকল সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি গ্রহণ করে ক্বচিৎ কখনো—তাও অলাভজনক সংস্থায়। আর যৌথ সংস্থার যে ধারণাকে এক সময় নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হল, তা ইন্দিরা গান্ধী আভাষিত এবং টাটা প্রস্তাবিত যৌথ সংস্থা ধারণার বিপরীত। টাটা প্রস্তাবে রয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্রকে স্পর্শ না করে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় বেসরকারী অংশগ্রহণ ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ। টাটার প্রস্তাবে লাভজনক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের দিকেই নজর ছিল—খুব স্পষ্ট করেই তার মধ্যে শিপিং করপোরেশন ও ইণ্ডিয়ান অয়েলের নামোল্লেখ ছিল। এক কথায়, দত্ত কমিটি সংস্কার সারবস্তু নিষ্কেপ করে ধনকুবের টাটার ধারণা নিয়ে কেবল যৌথ সংস্থা নামটিই রাখা হয়েছে—কার্যত তা' হল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে একচেটিয়াদের হাতে সমর্পণ করা।

সুতরাং, নব পর্যায়ের কংগ্রেস শাসনে, বিশেষত, মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর, একচেটিয়া পুঁজির গুসার অবরুদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, বহুলাংশে তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তা না হলে নভেম্বর ৭৩-এ আনীত প্রত্যক্ষকর (সংশোধনী) বিলে বলা হত না যে, অনগ্রসর এলাকায় যারা পুঁজি লগ্নী করবে, দশ বছর তাদের করযোগ্য লভ্যাংশে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে (যা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ ব্যবসায় প্রসারের আহ্বান), বা শিল্প লাইসেন্স নীতি (১৯৭০) পরিমার্জিত করে

একচেটিয়া ভবনগুলিকে ব্যবসায় প্রসারের সুযোগ দেওয়া হত না।[৯] একারণেই বিড়লাদের মুখ থেকে শোনা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছে, এবং গমের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণ নীতি বদল তার দৃষ্টান্ত।[১০]

একচেটিয়া ভবনগুলিকে শুধু দেশেই সুযোগ দেওয়া হয় নি। বিদেশে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে মুনাফা লুণ্ঠনের দুয়ারও অবারিত রাখা হয়েছে। মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত হিসেবে দেখা যায় যে, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে ৩৭টি শিল্প গড়ে তুলেছে, ৬২টি এখন নির্মীয়মান স্তরে এবং তারা ১৭·১১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই ৩৭টির মধ্যে ১০টি থেকেই ঐ সময়ের মধ্যে ১·১৪ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে ও তার মধ্যে ৯৮ লক্ষ টাকা ডিভিডেণ্ড, কারিগরী কৌশলভাতা, পরিচালন ব্যয় প্রভৃতি বাবদ এসেছে এবং ভারত প্রায় ৭ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পেয়েছে যন্ত্রপাতি বিক্রয় বাবদ। যেসব দেশে এই শিল্প বিনিয়োগ হয়েছে, সেগুলি হল : 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জর্মনী, কানাডা, ব্রিটেন, জাপান, ইথিওপিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরাণ, কিনিয়া, শ্রীলঙ্কা, নাইজিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদী আরব প্রভৃতি।[১১]

বিদেশী পুঁজির পক্ষেও এ সময়টা যে প্রতিকূল ছিল, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং, বিদেশী পুঁজির মুনাফার পক্ষে নতুন কংগ্রেসের রাজত্ব আনুকূল্যই দেখিয়েছে। সরকারী সূত্রে প্রকাশ, ভারতে মার্চ ১৯৬৯, মার্চ ১৯৭০ ও মার্চ ১৯৭১-এ বিদেশী বেসরকারী পুঁজি লগ্নী (কোটি টাকায়) হয়েছে যথাক্রমে ১২৫২·৮, ১২৮৯·০ ও ১৩১১·০ ; ঐ তিন বছরে তাদের মোট মুনাফা যথাক্রমে ৩০·২ কোটি টাকা, ৩১·৯ কোটি টাকা ও ৫২ কোটি টাকা।[১২] বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে যে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠেছিল তার নজির মেলে একটি সমীক্ষায়। ১০০ টাকার ইকুয়িটি শেয়ার প্রতি ডিভিডেণ্ড ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল ১৮·৫৫ টাকা, ১৯৭১-৭২ তা' বেড়ে হয়েছিল ২৪·৩০ টাকা। এই বৃদ্ধি টাকার মূল্য হ্রাসের জন্য নয়, কারণ ঐ হিসেব মূল্যমান সংশোধন করেই (price-adjusted series) করা হয়েছিল। ঐ সময়ে টাটার ডিভিডেণ্ড ১০·৩০ টাকা থেকে কমে ১১·০৪ টাকায় ও বিড়লার ডিভিডেণ্ড ১৩·০০ টাকা থেকে কমে ১১·৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছিল।[১৩] দয়া-উপনিবেশবাদ যে কিরকম কায়েম হয়ে বসেছে, তার ইঙ্গিত মেলে এর মাঝে। সেই সঙ্গে এটাও চোখে পড়ে যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় আঘাত

হানতে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রস্তুত নয়। তা না হলে আই-সি-আই এ সময়ের মধ্যে দ্রুততম হারে সম্পদ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হতে পারে না।

এর পাশাপাশি শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে মাঝারি একচেটিয়া সংস্থাগুলির, যাদের সম্পদ ১৯৭০-৭১ সালে ছিল ৮ কোটি টাকা থেকে ১৬ কোটি টাকার মধ্যে। যদিও মহলানবিশ কমিটি এদের একচেটিয়া সংস্থা হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, ব্যাপক অর্থে এদের বৃহৎ শিল্পসংস্থা বলাই ঠিক। তাছাড়া এগুলিকে একচেটিয়া-গোষ্ঠী হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইরকম ১৬টি সংস্থার সম্পদ ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ ছিল যথাক্রমে ১৬৪·৪ কোটি টাকা, ১৭২·৬ কোটি টাকা ও ১৮৫·০ কোটি টাকা—তাও ১৯৭২-৭৩-এর সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের হিসেব এর মধ্যে নেই অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ প্রকৃতপক্ষে সম্পদ আরো বেড়েছে। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্তিকরণের পরে তুলনামূলকভাবে অ একচেটিয়াপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি মাঝারি একচেটিয়াপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি, কারণ শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়া ভবনগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে প্রধানতঃ মহাজোটের পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। তা না হলে একচেটিয়াদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটত না। বরং একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে বিরোধের চেয়ে ঐক্যের দিকটিই এখন অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য পাচ্ছে। ১৭টি নতুন একচেটিয়া সংস্থা তা না হলে কি করে আবির্ভূত হল?

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে যেমন অসহনীয় দারিদ্র্য ও ভয়াবহ বেকার সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে একচেটিয়া ও বৃহৎ শিল্প-ভবনগুলির পুষ্টিবৃদ্ধি হয়েছে। এই দুই বৈপরীত্যময় বৃদ্ধি পরস্পর সম্পর্কিত যা ধনতন্ত্র ও দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটেই আত্মপ্রকাশিত হয়। বৈষম্যের পরিস্থিতিতে ধনতন্ত্র লালিত হয়। এমনকি আঞ্চলিক বিষম বিকাশও ধনতন্ত্র প্রসারে সহায়ক। কারণ অসম বিকাশ ধনতন্ত্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এজন্য একচেটিয়া ভবনগুলির বিকাশও অসম হয়। এদের মধ্যে ক্রমিক পর্যায়ের পরিবর্তন এজন্যেই অতি দ্রুত ঘটে যায়।[১৪] ভারতে তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

৫৮ বছর আগে লেনিন লিখেছিলেন: "ধনতন্ত্র যতদিন এরকম থাকবে উদ্বৃত্ত মূলধন ততদিন কোন দেশে জনগণের জীবনধারণ মান উন্নয়নে প্রযুক্ত হবে না, কারণ এর মানে ধনতন্ত্রীদের মুনাফা হ্রাস"[১৫] এই মৌলিক সত্যকে ভুলে

গেলেই পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। কংগ্রেস বিভক্তিকরণ যখন কোনমতেই ধনতান্ত্রিক পথ অবসানের লক্ষণমাত্র নয়, তখন এটা বুঝতে হবে যে, ধনতান্ত্রিক পথ ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য অর্থাৎ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির জন্যই। কিন্তু যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ আজ মুমূর্ষু, ধনতন্ত্র কখনো তার পতনমুক্ত হতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদের সংকট ধনতন্ত্রের সংকটও বটে। দ্বিতীয়তঃ, যে যুগে সমাজতন্ত্র নিয়ামক শক্তি, সে যুগে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক পথ বলে কিছু থাকতে পারে না। দেশীয় একচেটিয়া শিল্পপ্রসার যতই হোক, বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রতি তাদের অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতেই হবে—কেননা তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল হতে আগ্রহী নয়, বিশেষত যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশের একটি স্তম্ভ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক সহযোগিতা। কাজেই বিড়লার সঙ্গে চুক্তি হয় বিশ্বের পয়লা নম্বর বহুজাতিক গোষ্ঠী জেনারেল মোটর্স-এর। আবার দেশের অভ্যন্তরেও বহুজাতিক সংস্থা অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, মাঝারি বিদেশী সংস্থাগুলিও ব্যবসায় প্রসারিত করতে পারে। ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে এই রকম ১০টি সংস্থার সম্পদ ছিল যথাক্রমে ১২২·১ কোটি টাকা, ১৩১·৫ কোটি টাকা ও ১৪০·৯ কোটি টাকা তাও ১৯-২-৭৩ সালের হিসেব অসম্পূর্ণ। বিদেশী সংস্থাগুলির শেয়ারের মূল্য বেড়ে যায় এজন্যেই যে, তাদের উপর ধনতান্ত্রিক পথ নির্ভরশীল।

এর ফলে সামাজিক অসাম্য স্বভাবতঃ ঘনীভূত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ ধনতন্ত্র-বিরোধী উপাদানযুক্ত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন সরকার তত শোষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে—জনগণের, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি, অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ রেল ধর্মঘটে অভূতপূর্ব নিপীড়নের কথা বলা যায়—যা শুধুমাত্র রেলকর্মীদের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাদের পরিবারবর্গের প্রতিও প্রসারিত হয়েছে। ধনতন্ত্র যত বিকশিত হবে, গণতন্ত্র ও জনগণ তত নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ১৯৬৯ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত ৭৫টি কমিউনিস্ট পার্টির দলিলে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : "পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সামাজিক বিভাজন বিকশিত হচ্ছে। তীব্র সংঘাত দেখা দিচ্ছে, একদিকে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও পাতিবুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি বনাম অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া

প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যেকার অধিকতর আপোষপ্রবণ অংশের।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, অ-একচেটিয়াদের দেশপ্রেমিক অংশকে সামাজিক বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীসহ জনগণের মিত্র হিসেবে পরিগণিত করা হয় নি, বলা হয়েছে পাতিবুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশকে। তার কারণ, সামাজিক বিভাজন আজকের দিনে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নির্দেশিত নয়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও উদ্দেশিত।

ভারতের ক্ষেত্রে এই সূত্রায়ন অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ তৃতীয় বিশ্বে দু-চারটি সর্বাধিক বিকাশিত ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ভারত অন্তর্ভুক্ত। অ-একচেটিয়াপতিদের প্রাধান্যে চার বছর জনগণের দুঃস্বপ্নবৎ দিন চলেছে। ধনতান্ত্রিক পথকে জোরদার করার অর্থ দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের দ্বার উন্মোচিত করা। এ কথা ভুলতে পারি না যে, 'সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক সারবস্তু একচেটিয়া ধনতন্ত্র।'[১৬] ভারতে বিদেশী পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে ধনতন্ত্রের প্রসারে ব্যবহার প্রভৃতি একচেটিয়া ও অংশত অ-একচেটিয়াপতিদের অনুকূলে গেলেও এ সমস্ত লক্ষণগুলি দেশের স্বার্থের প্রতিকূল। সুতরাং ভারতের অর্থনীতি আজ বিপন্ন। শুধু ন্যূনতমপক্ষে ৩৭ কোটি জনগণ নিরন্ন নয়, লক্ষ লক্ষ যুবক বেকারত্বের জ্বালায় আর্ত নয়, ধনতন্ত্রের প্রসারে নয়া উপনিবেশবাদও ট্রয়ের ঘোড়ার মতো দেশের অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে। অনেকের কাছে শ্রুতিকটু হলেও তা ঘটেছে অ-একচেটিয়াপতিদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালেই।

উদ্ধৃতিপঞ্জী

১। Towards An Approach to the Fifth Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of India, 1972.–

Economic Times 2.9.74

Economic and Political weekly, 18.5.74

৪। Ibid

৫। কালান্তর ১০.৮.৭৪

৬। Economic and Political Weekly, 17.11.73

৭। Economic Times 2.7.74

৮। H. K. Paranjape : Industrial Policy—Is A Revision Necessary Manistream 27.10.73

৯। ১৯৭১ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই বিড়লার 'হিণ্ডালকো' রোল্ড অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন ক্ষমতা ৬২ শতাংশ বৃদ্ধির ও 'জয়শ্রী টেক্সটাইল্‌স্‌ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ' ইনসুলেটর উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির এবং টাটার 'টাটা কেমিক্যাল্‌স্‌' সোডা অ্যাশ উৎপাদন ক্ষমতা ৭০ শতাংশ বৃদ্ধির ও 'টেলকো' ব্যবহারিক গাড়ী নির্মাণ ক্ষমতা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির লাইসেন্স পেয়েছে। এরকম আরো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া ভবনগুলিকে। (দ্র: New Age, 6.12.71)।

১০। "The reversal of the take-over of wheat is a classic example of the new thinking in the leadership" (Hindusthan Times, 21.7.74). সম্প্রতি টিস্কোর অংশীদারদের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে টাটা "new economic dawn may be breaking" বলে আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র: Statesman 25.6.74)

Economic Times, 14.3.73

Mainstream. 21.4.73

Economic Times, 3.12.73

১৪। "একচেটিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন কোন শাখায়, কোন কোন দেশে, বিশেষ সময়ে বন্ধ্যাত্ব ও বিনাশের লক্ষণ দেখা যায়।" (V. I. Lenin : Imperialism : The Highest Stage of Capitalism, Progress Publishers, Moscow, 1970, p. 96)

১৫। Ibid p. 61

১৬। Ibid p.117

পরিশিষ্ট

সারণী ১ : ১৩টি সর্ববৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধির গতি

সম্পত্তির পরিমাণ (কোটি টাকায়)

গোষ্ঠী	মার্চ ১৯৬৪	মার্চ ১৯৬৬	মার্চ ১৯৭১
টাটা	৪১৮	৫০৩	৭১১
বিড়লা	২৯৩	৪৫৮	৬৮৭
আই-সি-আই	৩৭	৫১	২২৯
মার্টিন বার্ন	১৫০	১৫৩	১৭৩
মফতলাল	৪৬	৯৩	১০৩
বাঙ্গুর	৭৮	১০৪	১৫০
থাপার	৭২	৯৯	১৩৭
এ সি সি	৭৭	৯০	১২৮
জে কে সিংঘানিয়া	৫৯	৬৭	১১৩
ওয়ালচাঁদ	৫৫	৮১	১০৬
বার্ড-হিলজার্স	৬০	৬৮	৮৫
গোয়েঙ্কা	৪৭	৬৫	৬৯
কিলাচাঁদ তুলসীদাস	৩৫	৩৭	৪৪
মোট	১৪২৭	১৮৮১	২৮০৫

(সূত্র: 1) Economic and Political Weekly 17.11.73
2) Mainstream 11.7.70

সারণী ২ : ১৬টি দেশীয় মাঝারি সংস্থার সম্পদ বৃদ্ধির গতি
(১৯৭০–৭৩)

সম্পত্তির পরিমাণ (কোটি টাকায়)

সংস্থা	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
মোটর ইণ্ডাস্ট্রীজ	১৫·৩	১৭·৭	১৮·০
সিয়াট টায়ার্স	১৩·৬	১৬·১	১৮·২
অটোমোবাইল প্রোডাক্টস *	৯·৭	১১·৮	১২·৯*
ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড মিলস্	৮·৪	১০·৮	১২·৭*
ডেম্পো স্টীমশিপ	১২·৯	১২·৫	১২·৬
গারওয়ারে নাইলন	৫·৬	৮·২	১২·০
সিম্পসন এণ্ড কোং	১০·৫	১১·০	১১·৯*
সারাংপুর কটন	১০·৫	১১·০	১১·৯*
ফেরো অ্যালয়জ কর্পোরেশন	১০·২	১০·২	১১·০*
ভারত স্টিল টিউবস	৮·৮	১০·৩	১০·৬*
লুকাস (টি ভি এস.)	১০·১	৯·৬	৯·৮
হায়দ্রাবাদ অ্যাসবেস্টস	৮·৮	৯·৫	৯·৫*
অন্ধ্র সুগার	৭·৮	৯·২	৯·৪*
মাইসোর অ্যাসিটেট	৯·৪	১০·১	৯·৩*
গোল্ডেন টোব্যাকো	১১·৫	১৩·৬	১৬·৪
সরস্বতী ইণ্ডাস্ট্রীজ	১১·৩	১১·০	৮·৮*
মোট	১৬৩·৪	১৭২·৬	১৮৫·০

সূত্র Economic Times, 14.3.73, 5.2.74

* পূর্ণ আর্থিক বৎসরের হিসেব নয়

সারণী ৩ : ১০টি বিদেশী মাঝারি সংস্থার সম্পদ বৃদ্ধি
(১৯৭০–৭৩)

সম্পত্তির পরিমাণ (কোটি টাকায়)

সংস্থা	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
গুড ইয়ার	১৬·৪	২০·৫	১৯·৮
ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন	১৫·৬	১৪·৪	১৮·৩
ফাইজার	১৩·৬	১৫·৮	১৮·১
সিবা	১৩·৩	১৫·১	১৫·৯
ইণ্ডিয়ান কেবলস	১২·১	১৪·৯	১৫·৯
ক্যালটেক্স অয়েল	১১·৬	১০·০	৯·৭*
সাইমন কার্ভস	১১·৫	১৪·০	১২·৭*
উইমকো	১০·০	১১·১	১১·৯*
স্যাণ্ডোজ	৯·২	৯·৪	৯·৯*
ব্রিটানিয়া বিস্কিট্স্	৮·০	৮·৩	৮·৭
মোট	১২২·১	১৩৩·৫	১৪০·৯

সূত্র : Economic Times, 14.3.73, 5.2.74

* পূর্ণ আর্থিক বৎসরের হিসেব নয়

ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

মার্কসবাদী

ভারত এমন একটি দেশ যেটি পুঁজিবাদী বিকাশের মধ্যস্তরে রয়েছে।

দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনে ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এটি এমন ধরনের পুঁজিবাদ যার মধ্যে ঔপনিবেশিক দেশের অনিবার্য চিহ্নগুলি (যেমন, ব্রিটিশ পুঁজির আধিপত্য, প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সংরক্ষণ ইত্যাদি) বর্তমান ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত সমস্ত সহযোগী দোষত্রুটি সহ এই অনগ্রসর অর্থনীতিরই উত্তরাধিকার পেয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, সার্বভৌম ভারতীয় প্রজাতন্ত্র একনিষ্ঠভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ করেছে। তার ফলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আরও সংহত হয়েছে। এমন কি, শক্তিশালী একচেটিয়া গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ করেছে।

এটি লক্ষণীয় যে ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের নিম্নস্তরে অনড় হয়ে থাকে নি। ভারতে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিই প্রাধান্য অর্জন করেছে। পুঁজিবাদ অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও আস্তে আস্তে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিগুলি ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান প্রবণতা হল পুঁজিবাদী ধারায় বিকাশ লাভ করা।

ভারতে ইতিমধ্যেই শ্রেণী বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে; বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়ত শ্রেণী হিসাবে রূপ লাভ করেছে; শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধিতা ক্রমবর্ধিতভাবে সুস্পষ্ট হচ্ছে।

আজকের ভারতীয় সমাজে শ্রমিকশ্রেণী একটি প্রভাবশালী শক্তি। ভারতে আজকে কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি। ১৯৪৭ সালের আগে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতের রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণী সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ বিপ্লবী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা অসংখ্য ধর্মঘট

ও বন্ধু সংগঠিত করেছে ও তার নেতৃত্ব দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামনের সারিতে রয়েছে তারাই।

এই ২৭ বছরের পুঁজিবাদী শাসন গ্রামাঞ্চলের অবস্থাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। কংগ্রেসের কৃষি সংস্কার জমিদারদের ভূমিকাকে খর্ব করলেও, গ্রামীন জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশার উপশম করতে ব্যর্থ হয়েছে। আধা-প্রলেতারিয় শ্রেণী, ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। কৃষক-শ্রেণীর সকল অংশে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। সারা ভারত কিষাণ-সভা এবং ক্ষেতমজুরদের সর্বভারতীয় সংগঠন গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রামের সূচনা করছে ও নেতৃত্ব দিচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকরা পরস্পরের কাছাকাছি আসছে এবং তারাই যৌথ-ভাবে আজকে মুক্তিসংগ্রামে প্রধান চালিকা শক্তি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শক্তি হল শহরের পেটি বুর্জোয়ারা। একটি দেশে যেখানে পুঁজিবাদ ও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি সহাবস্থান করে সেখানে পেটি বুর্জোয়াদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। দেশে পুঁজি-বাদী শাসনের ফলে পেটি বুর্জোয়াদের জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাই তারা সাধারণভাবে একটি জঙ্গী অবস্থান গ্রহণ করছে। তাদের একটি বিরাট অংশ প্রত্যহ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সংগে একসাথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে তাদের বামপন্থী অংশের, একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ্ এবং অন্যান্যদের একটি বিরাট অংশ পুঁজিবাদী পথের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয়-ভাবে অংশগ্রহণ করছে। বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশের রাজনৈতিক চেতনা বিপ্লবী রূপ লাভ করছে এবং তারা সক্রিয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

ভারতের ক্ষেত্রে, বুর্জোয়াদের সম্পর্কে একটি সঠিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণের প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় বুর্জোয়ারা সমস্বার্থসম্পন্ন (homogenous) শ্রেণী নয়। মোটামুটিভাবে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা নয়া উপনিবেশবাদের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তাদের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা নিজেদের অবস্থানকে রক্ষা করে ও সংহত করে। তাদের পাশাপাশিই অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের একটি বড় অংশ রয়েছে। অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আগ্রহী। যখনই সাম্রাজ্যবাদ ও নিপীড়িত জাতির মধ্যে বিরোধটি খুব তীব্র হয়, (যেমন, ১৯৫৩ সালের মার্কিন-পাক চুক্তি; ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ওপর পাকিস্তানের সামরিক জুন্টার আক্রমণ) তখনই অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা একটি ইতিবাচক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম যতই তীব্র হয়, অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে দেখা দেয় দ্বিধাচিত্ততা এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোস করার দিকে ঝোঁকে।

অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, ভারসাম্যের পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করার জন্য এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করার জন্য তারা সোভিয়েত সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরা শোষকশ্রেণী এবং পুঁজিবাদী পথটিকেই আঁকড়ে থাকে তাই জাতীয় ও সামাজিক পুনরুজ্জীবনের মৌল সমস্যাগুলির তারা বড়জোর একটা অর্ধ-সম্পূর্ণ সমাধান পেশ করতে পারে।

ভারতের বিপ্লব এখনও গণতান্ত্রিক স্তরে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিপ্লবী শক্তিসমূহের সামনে প্রধান বিষয় (agenda) হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্তব্যগুলির সম্পাদন। ভারতের পশ্চাদপদতার কারণ যেহেতু এখনও বিদেশী পুঁজির ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা, তাই দেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম প্রধান স্থান গ্রহণ করে। এই অর্থে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর হল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্তব্য। এটি আবার আমূল ভূমি-সংস্কারের জন্যও সংগ্রাম। সম্পূর্ণভাবে সামন্ততন্ত্র বিরোধী একটি বিপ্লব ব্যতিরেকে ভারতের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন অভাবনীয়। নয়া উপনিবেশবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে যে একচেটিয়া পুঁজি, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই বর্তমান স্তরে ভারতের বিপ্লব একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র গ্রহণ করে।

যাই হোক, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাধান উত্থাপন করে।

এই বিষয়ে, প্রলেতারিয় ও জাতীয় বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে।

জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের একটি শক্তি। বস্তুগতভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি সম্পাদনে আগ্রহী। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নগুলি সমাধানে তারা নিজেদের **শ্রেণী লক্ষ্যগুলিই** অনুসরণ করে। জাতীয় বুর্জোয়ারা অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য হল একটি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী করা। পুঁজিবাদকে আঁকড়ে থেকে জাতীয় বুর্জোয়ারা দেশকে বিশ্ব পুঁজিবাদের গণ্ডী থেকে বার করে আনতে ব্যর্থ হয় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে তাদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করতে হয়। পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিসংস্কার রূপায়ণে অর্ধপথে থেমে থাকতে হয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা কিছুটা একচেটিয়া বিরোধী অবস্থানও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সঙ্গতিপূর্ণ-ভাবে একটি বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করবে, এই আশা করা ভুল। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ বা সামন্ততন্ত্র অথবা একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামই করুক না কেন সবই তারা করবে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে দোদুল্যমানতা হল এর শ্রেণী চরিত্রেরই একটি অংশ।

বাস্তবিকভাবেই গত ২৭ বছর ধরে ভারতীয় বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই দেশের সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করেছে। জনগণের কাছে আজ পুঁজিবাদী পথের দেউলিয়াপনা খুব পরিষ্কার। পুঁজিবাদী পথ পরীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু দেশের সমস্যাগুলির আমূল সমাধানে সেটি অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করে না তারা সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা তাদের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটিকে বিচার করে। তাই এই শ্রেণীটি একটি বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি সম্পাদনে আগ্রহী। গণ-তান্ত্রিক কর্তব্যগুলি যত সম্পূর্ণভাবে ও গভীরভাবে সম্পাদন করা যাবে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণও হবে তত সুনিশ্চিত।

কাজেই শ্রমিকশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটিকে একটি বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। শ্রমিকশ্রেণী এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে যতদিন ভারত পুঁজিবাদী পথ আঁকড়ে থাকবে ততদিন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অথবা আমূল ভূমিসংস্কার কোনটিই অর্জন করা যাবে না। যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করতে হয় তাহলে ভারতের জনগণকে একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে, কারণ, তারাই প্রধানতঃ পুঁজিবাদী পথের সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের সংগে লেনদেনে আগ্রহী। দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করার জন্য একটি পুঁজিবাদ-বিরোধী লক্ষ্য স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন।

তাহলে পুঁজিবাদী পথের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থটি কি? ভারতীয় পরিস্থিতিতে এর অর্থ হল: প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ পুঁজিবাদী পথকে পাল্টে দেওয়া। পুঁজিবাদী পথকে পাল্টে দেওয়ার অর্থ হবে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্বের অবসান আর সেই সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্বেরও অবসান। তাছাড়াও এর অর্থ হবে পুঁজিবাদী বিধিনিষেধগুলির সঙ্কোচন করা। একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মত অ-একচেটিয়া বৃহৎ ও মধ্য বুর্জোয়ারাও পুঁজিবাদী পথের বোঝাকে শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে আগ্রহী। কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে পুঁজিবাদী পথের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ হল, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিদেশী ও দেশী একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম, আর এর দ্বারা অ-একচেটিয়া বৃহৎ ও মধ্য বুর্জোয়াদের একচেটিয়া হবার প্রবণতাকেও খর্ব করা বোঝায়। এই অর্থে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চৌহদ্দিকে অতিক্রম করবে এবং একটি পুঁজিবাদ-বিরোধী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে।

এর থেকে কি এই অর্থ দাঁড়ায় যে যারা পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে ও যারা তার বিরোধী তারা সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থান গ্রহণ করবে? আমাদের দেশের ইতিহাস দেখিয়েছে যে যারা পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে, যারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ অনুসরণ করে, তারাও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, আর একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে

আংশিক সংগ্রামেও তাদের নিয়ে আসা যেতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের কার্যকলাপ তাদের গুণানুসারে বিচার করে দেখা। জাতীয় বুর্জোয়ারা যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ করে তখন তা যতই সীমিত হোক না কেন, শ্রমিকশ্রেণী তাকে অবশ্যই সমর্থন জানাবে। এই সকল ক্ষেত্রে, জাতীয় বুর্জোয়াদের ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থগুলি এক জায়গায় এসে মেশে

আবার সেই সঙ্গে যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী পথ আঁকড়ে থাকে এবং বুর্জোয়া সংস্কারের মধ্যে নিজেদের নীতিকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তাই তারা বড় জোর আধা-সম্পূর্ণ সমাধান দিতে পারে। বিশেষ করে শ্রেণী-সংক্রান্ত প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থগুলির মধ্যে বিভেদ দেখা যায়।

আর এই কারণেই শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামের কর্মকৌশল গ্রহণ করে

কোনরকমভাবেই শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই একটি স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে হবে

বাস্তবিকভাবে আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে যা ঘটছে তা হ'ল জাতীয় বুর্জোয়াদের সাধারণ লাইন ও শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ লাইনের মধ্যে সংঘাত। ভারতীয় পরিস্থিতিতে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সংঘাত এমন একটি স্তরে সংঘটিত হচ্ছে যখন পর্যন্ত বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্য বর্তমান। আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে দেশের মধ্যেকার শক্তিসমূহের সম্পর্কে একটি পরিবর্তন নিয়ে আসা, জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের অবসান করা এবং তার পরিবর্তে জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। এই ক্ষেত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে বোঝায় শ্রমিক, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি অংশ। ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এই চারটি শ্রেণী নিয়ে গঠিত হবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতাও এই চারটি শ্রেণী ভাগ করে নেবে। যাই হোক, এই রাষ্ট্রে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়া, যারা চরিত্রগতভাবে অশোষক শ্রেণী এবং যারা সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী এই উভয় ধরনের শোষণ সম্পর্কের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগ্রহী। এই নেতৃত্বের শক্তিগুলির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী একটি বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করবে। শ্রমিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ একক নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত সম্ভাবনার সীমার মধ্যে নেই, যদিও শ্রেণী অবস্থানের দৌলতে এই শ্রেণী ক্রম-বর্ধিতভাবে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে। অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের, যারা নিজেরাই একটি শোষকশ্রেণীর অংশ, এই নেতৃত্বে কোন অংশ থাকতে পারে না।

অন্য কথায় বলতে গেলে, ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রূপ গ্রহণ করবে অর্থাৎ এইটি এমন একটি রাষ্ট্র যা শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়াদের, এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশের পক্ষে হবে **গণতান্ত্রিক** আর সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও একচেটিয়া পুঁজি-বাদের সম্পর্কে হবে **একনায়কত্ব**।

জাতীয় গণতান্ত্রিক (বিপ্লবী গণতান্ত্রিক) একনায়কত্বের কাজ হবে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলিকে বিপ্লবীভাবে সম্পাদন করা অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা, আমূল ভূমি সংস্কারের দ্বারা কৃষকদের মুক্তিসাধন করা এবং একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্ব অপসারিত করা।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিপ্লবী ভাবে সম্পাদন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী উচ্চতর স্তর, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের শর্তগুলি প্রস্তুত করবে।

যেহেতু জাতীয় গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব হল সেই সব শ্রেণীর একনায়কত্ব যারা চরিত্রগতভাবে অবৈর তাই এইটির শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে বিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক (বিপ্লবী গণতান্ত্রিক) একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিষ্কারভাবে বিচার করতে হবে। ভারতে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক অবস্থা আরব ও আফ্রিকার দেশগুলি অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। ঐ দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী এখনও পর্যন্ত একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ না করায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের এক-নায়কত্বের রূপ গ্রহণ করে। ভারতের পরিস্থিতি আরও পরিণত হওয়ায় এইটি শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়াদের যৌথ একনায়কত্বের রূপ গ্রহণ করবে। এই

ধরনের শ্রেণী সমবায়ে শ্রমিকেরা যে ভূমিকা গ্রহণ করে সেটি এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র দান করে।

আবার একই সঙ্গে ভারতীয় পরিস্থিতির বিপ্লবী সম্ভাবনাকে বড় করে দেখার বিপদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে যেখানে পুঁজিবাদী বিকাশ আরও বেশি অগ্রসর এবং শ্রমিকশ্রেণী আরও বেশি পরিণত (mature), সেখানে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের শর্তগুলি আরও বেশি পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আর তাই ল্যাটিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে নির্দেশ রয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তরের নেতৃত্ব দেবে। ভারতের পরিস্থিতি এক নয়। এখনও সেই স্তর আসে নি যখন শ্রমিকশ্রেণী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য ভারত তার নিজের পথ গ্রহণ করবে। একদিকে আরব বা আফ্রিকার দেশগুলির আর অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির পথ—কোনটিই ভারতের সঙ্গে খাপ খাবে না এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে তীব্র পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিকাশের পথ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিরই কাছাকাছি হবে কারণ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মতই ভারত দ্রুত একটি মধ্যস্তরের পুঁজিবাদী বিকাশের দেশে পরিণত হচ্ছে। ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক (বিপ্লবী গণতান্ত্রিক) প্রক্রিয়াটি একটি ব্যাপক অথচ আরও গভীর—এমন এক বিপ্লবে বিকাশ লাভ করার প্রবণতার দ্বারা চিহ্নিত হবে, যেখানে মৌল জনগণ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ওপর শ্রমিকশ্রেণী তার প্রভাব কতখানি ফেলতে সমর্থ হবে, তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। শ্রমিকশ্রেণীর একটি খুব বিরাট অংশ এখনও জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে মোহগ্রস্ত। শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের ব্যাপক অংশের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের অবস্থানে এখনও আসে নি। শ্রমিকশ্রেণীটিই তীব্রভাবে বিভক্ত। এইগুলিই বাধা যা শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করা থেকে প্রতিহত করছে।

তা সত্ত্বেও দেশের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তরে শ্রমিকশ্রেণীর একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ অনিবার্য। এর শ্রেণী অবস্থানের দৌলতে শ্রমিক-শ্রেণী একটি চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে। এইটি একমাত্র শ্রেণী যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সামাজিক বিকাশের বর্তমান ও ভবিষ্যত স্তরের মধ্যের যোগসূত্রকে বুঝতে

সক্ষম। এইটিই একমাত্র শ্রেণী যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় উদ্দীপিত, যার তাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায়, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তার রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী যত বেশি প্রভাব ফেলবে, তত দৃঢ়ভাবে বিপ্লবী গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রে বিকাশ লাভ করবে

সবের ওপরে যেটি চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল, আমাদের এটি বিবেচনা করতে হবে যে ভারতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে, একটি বিশ্ব পরিস্থিতিতে যেখানে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চূড়ান্ত শক্তি, যখন সদ্যস্বাধীন দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণী একটি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করছে।

এই দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী নানাভাবে তার নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে (যেমন অর্থনৈতিক সাহায্য, রাজনৈতিক সহযোগিতা, ভাবধারার প্রসার ইত্যাদি)। অ-পুঁজিবাদী পথ, জাতীয় গণতন্ত্র প্রভৃতি ধারণাগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার প্রকাশ। আন্তর্জাতিক সর্বহারা-শ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশলাভ করার প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বাহিরাগত পূর্বশর্তগুলি প্রস্তুত করছে।

কয়েকটি ভ্রান্ত ফরমুলা

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতের মার্কসবাদী মহলে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ফরমুলা স্বাভাবিক ভাবেই সমালোচনার উদ্রেক করে।

প্রথমেই আমাদের দেশের মধ্যে কিছু অতি বামপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীগুলি যে অবস্থান গ্রহণ করে সেইটি বিচার করা যাক্। অতি-বামপন্থীরা এশিয়ার সেই সব দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চায় যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জনগণের শক্তিগুলির জয়লাভের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জনগণতন্ত্রের পথটি বেছে নিয়েছে (যেমন চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি)। তারা ভারতের জন্য একটি অপুঁজিবাদী পথের সম্ভাবনাকে বর্জন করে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ভারতকেও অবশ্যই একটি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটি প্রচার করে তারা জোর দিয়ে বলে যে ভারত পুঁজিবাদী পথে সবচেয়ে বেশি বিকাশলাভ করা উপনিবেশ-

গুলির অন্যতম, ভারতের অগ্রগতির পথে ভারতীয় বুর্জোয়ারাই হল প্রধান প্রতিবন্ধক এবং শ্রমিকশ্রেণী এখনই বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে সমর্থ।

প্রথমতঃ তারা দেশের মধ্যে পুঁজিবাদী বিকাশের মাত্রাকে খুব বড় করে দেখে (আর তার অর্থ দাঁড়ায় যে তারা দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলাফলকে ছোট করে দেখে)। তারা একথা বুঝতে অসমর্থ যে ভারত অর্থনৈতিকভাবে এখনও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল, যে বর্তমান স্তরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই ভারতের সংগ্রামের প্রধান মর্মবস্তু; তারা এই ব্যাপারটি ধরতে পারে না যে এখনও পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদই ভারতের মূল শত্রু।

দ্বিতীয়তঃ যে অতি-বামপন্থীরা জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাও বড় শত্রু বলে মনে করে তারা দেশের মধ্যেকার সামাজিক বিরোধগুলিকে বড় করে দেখে। একদিকে তারা জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকাটিকে অস্বীকার করে, আর, অপর দিকে তারা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতাকে (maturity) বড় করে দেখে। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যের বিরোধের তীব্রতাকে তারা উপেক্ষা করে এবং তারা একথা বুঝতে অক্ষম যে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যের বিরোধ এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। ভারতে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে বিপন্ন ক'রেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিপ্লবী (যদিও সীমিত) সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করতে পারে। আর তা করলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে একটি সুযোগ দেওয়া হয় যা বিপ্লবী শক্তিগুলিকেই দুর্বল করে। এটি শুধুমাত্র বিপ্লবী শক্তিগুলির মূল্যের বিনিময়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকেই বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে এবং এর পরিণাম হবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী শক্তিগুলির বিচ্ছিন্নতা। ইন্দোনেশিয়া ও ঘানাতে যা ঘটেছে, যেখানে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের দক্ষিণপন্থী অংশগুলি বিপ্লবী অংশগুলির সঙ্কীর্ণ অবস্থানের সুযোগ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল তা থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ অতি বামপন্থীরা শ্রমজীবী জনগণের থেকে বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্নতার মাত্রাকে বড় করে দেখে আর লাফিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে শ্রমিকশ্রেণী এখনই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করেছে।

বাস্তব ঘটনাবলী দেখায় যে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বড় অংশ, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াদের একটি বড় অংশও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে রয়েছে। দেশের শক্তিসমূহের সম্পর্কটি এমন নয় যে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সহজেই সরিয়ে দেওয়া যায় অথবা শ্রমিকশ্রেণী সহজেই জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। এটি হবে একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া যার গতিপথে শ্রমিকশ্রেণী ধাপে ধাপে শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং ক্রমবর্ধিতভাবে বিপ্লবী শক্তিগুলির নেতৃত্ব অর্জন করবে।

এই অবস্থায়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব হল অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত, কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভারতের পরিস্থিতিতে বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ ভারতের জনসংখ্যার একটি খুব বড় অংশ হল পেটি-বুর্জোয়া। এই পেটি বুর্জোয়া অংশগুলি প্রত্যহই পুঁজিবাদী পথ সম্পর্কে মোহমুক্ত হচ্ছে, অধৈর্য হয়ে উঠছে, তারা একটি বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য সহজ সংক্ষিপ্ত সমাধানের পথ খুঁজছে, আর, তাই খুব সহজেই অতি বামপন্থী অবস্থানে চলে যাচ্ছে।

আবার একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-পুঁজিবাদী বিকাশের দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কেও অবশ্যই সাবধান হতে হবে। (১৩)

এই প্রসঙ্গে যা আমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তা হল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রলেতারিয় ও বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নেওয়ার তত্ত্বটি।

যৌথ নেতৃত্বের ধারনাটি জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকার একটি ভ্রান্ত মূল্যায়ন, বিশেষ করে, এর পৃথকীকরণের (differentiation) প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত উপলব্ধি থেকে জন্মগ্রহণ করে।

আসল প্রয়োজন হল অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সঠিক মূল্যায়ন। বুর্জোয়াদের একচেটিয় ও অ-একচেটিয়া অংশের মধ্যের পার্থক্যটি বিবেচনা করা অবশ্য প্রয়োজন। একচেটিয়া বুর্জোয়ারা দেশের মধ্যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সামাজিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। অপর দিকে, অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন কোন অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পাদনের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ

করে। আমরা যদি এই পার্থক্যটিকে বিবেচনা না করি তা হলে আমরা না পারব জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে আর না পারব অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করতে।

আবার সেই সঙ্গে একথা মনে করা ভুল হবে যে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা একটি দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবী শক্তি। এই কথাটি উপেক্ষা করা চলে না যে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মধ্যে মধ্য বুর্জোয়ারা এবং এমন কি বৃহৎ বুর্জোয়াদেরও কোন কোন অংশ রয়েছে। কাজেই অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারাও শোষক শ্রেণীরই একটি অংশ আর তাই তাদের একটি দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে। মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের কথা মনে করেই জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত ভূমিকার কথা বলে থাকে। অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগতিপূর্ণভাবে সংগ্রাম করবে এ কথা আশা করা, অথবা তারা শ্রমিকদের সঙ্গে যৌথভাবে দেশে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনে নেতৃত্ব দেবে, একথা আশা করার অর্থ হল তাদের মৌল শোষক চরিত্রটিকে উপেক্ষা করা।

যৌথ নেতৃত্বের ধারণার মূলে অ-পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অ-পুঁজিবাদী পথটিকে কখনও কখনও একটি তৃতীয় পথ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। ধ'রে নেওয়া হয় এটি এমন পথ যা একদিকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও অপরদিকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে সম দূরত্বে বিরাজ করে। অ-পুঁজিবাদী পথকে এক ধরনের অ-একচেটিয়া পুঁজিবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। কাজেই তাদের মতে অ-পুঁজিবাদী পথের ও পুঁজিবাদী পথের (যা অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা অনুসরণ করে) একই সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তারা "একই ফলাফল অর্জন করে।" তাদের মতে অ-পুঁজিবাদী পথের অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় পরিচিত পথে পুঁজিবাদী বিকাশকে অনুমোদন না করে, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধিকে খর্ব করে, যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে তার ক্ষমতাকে চূর্ণ করে, "স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা।" কাজেই পুঁজিবাদী পথে বিকাশেতে আপত্তি নয়, আপত্তি গিয়ে ঠেকে একচেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধি সম্পর্কে। পুঁজিবাদী পথ (অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের দ্বারা অনুসৃত) ও অ-পুঁজিবাদী পথের স্বার্থগুলির অভিন্নতা বারবার কীর্তন করতে গিয়ে আরও বলা হয়েছে যে

"এই পথে যখন বিকাশ ঘটে তখন পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলিই আক্রমণ বা উচ্ছেদের আশু লক্ষ্য হবে না।" এইটি লক্ষ্য করার বিষয় যে এই কর্মসূচীগুলিতে অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পুঁজিবাদ-বিরোধী লক্ষ্যটি, সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

যৌথ নেতৃত্বের ধারণাটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিধিটিকে শুধুমাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি, সুনির্দিষ্টভাবে সেই সব কর্তব্যগুলি যা অ-একচেটিয়া বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা যৌথভাবে সম্পাদিত হতে পারে, তারই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। অন্যকথায় এটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এনে দাঁড় করায়।

যৌথ নেতৃত্বের ধারণাটি, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীই যে মূলস্তম্ভ (pivot) এই ধারণাটিরই সম্পূর্ণ বিরোধী। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়ারা যৌথভাবে নেতৃত্ব দেবে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক মূলস্তম্ভ (pivot) হিসাবে কাজ করবে, এই দুই ধারণার মধ্যে কোন কম্পোস চলে না। যদি নেতৃত্বে বুর্জোয়াদের একটি অংশ থাকে তাহলে তারা তাদের কর্তৃত্বের অবস্থানকে কৃষক জনগণের আন্দোলনের পরিধিকে সীমিত করতে ব্যবহার করবে এবং এর ফলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর মূলস্তম্ভ (pivot) হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। বিপরীতভাবে, যদি অশোষক শ্রেণীগুলি, শ্রমিক, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া যৌথভাবে নেতৃত্বের কাজটি সম্পাদন করে তাহলে সে ক্ষেত্রে নেতা ও মূলস্তম্ভের মধ্যে কোন বিরোধিতার সৃষ্টি হয় না। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর মূলস্তম্ভ রূপে কাজ করার দায়িত্বটি তার প্রাপ্য প্রাধান্য পায়।

যারা মূলস্তম্ভ (pivot) এবং নেতার ভূমিকা এইভাবে গুলিয়ে ফেলে আসলে তারা কৃষকের ভূমিকাটিকে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকার সঙ্গে গোলমাল করে ফেলে। তারা এই ঘটনাটি উপেক্ষা করে যে বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অর্ধ-পথ পর্যন্ত নিয়ে যায় আর কৃষকরা এটিকে তার একেবারে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়। লেনিন সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে আমরা যেন সাধারণ ভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভূমিকার সঙ্গে কৃষকের ভূমিকাটি গুলিয়ে না ফেলি। বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব কেবলমাত্র এক ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব স্থাপন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাবে যা হল সমাজতন্ত্রের দিকে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ।

যারা প্রলেতারিয় ও বুর্জোয়াদের যৌথ নেতৃত্বের ধারণাটি পোষণ করে তাদের বিপ্লবী গণতন্ত্র সম্পর্কেই একটি বিভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তাদের মতে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ক্ষমতা হবে "শ্রমিকশ্রেণী, সর্বস্তরের কৃষক, শহরের পেটি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের অ-একচেটিয়া স্তরের একটি যৌথ বিপ্লবী একনায়কত্ব।" তারা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াদের (অ-শোষক শ্রেণীসমূহ) এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের (একটি শোষকশ্রেণী) সমপর্যায়ে স্থাপন করে। তারা বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রকে কৃষকদের গণতন্ত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। তারা বিপ্লবী গণতন্ত্র সম্বন্ধে লেনিনবাদী ধারণাকে একটি প্রহসনে পরিণত করে।

যৌথ নেতৃত্বের ধারণা শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নিয়ামক ভূমিকা গ্রহণ করা থেকে প্রতিহত করে। এইটি সমস্ত ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সচেতন উদ্যোগ গ্রহণের ভূমিকাকে খর্ব করে বুর্জোয়ারা, যারা এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ওপর জোর দেবে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অপছন্দ করবে, তারা নেতৃত্বে তাদের অবস্থানকে এই সংগ্রামের পরিধিকে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী লক্ষ্যের দিকে এর যাওয়াকে প্রতিহত করতে ব্যবহার করবে। এইটি শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্রমবর্ধিতভাবে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ থেকে প্রতিহত করবে। এই কথা ভাবা হাস্যকর যে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের যৌথ নেতৃত্বে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ক্রমবর্ধিতভাবে একটি পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করবে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা অর্জন করবে। একথা ভাবা হাস্যকর যে অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যৌথভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে পারে।

ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তাৎপর্য

বিভাস ঘোষ

জাতীয় গণতান্ত্রিক "ফ্রন্টের ভিত্তি ও
কেন্দ্রস্থল হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী।"
—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচী

আবার পশ্চিম বাংলার বুকে পঞ্চাশের মন্বন্তর নেমে এসেছে। আবার শুরু হয়েছে মৃত্যুর তাণ্ডব। পশ্চিম বঙ্গের ত্রাণ মন্ত্রীর হিসেবেই দেড় কোটি মানুষ অনাহারে ধুঁকছে। সত্যিকারের অবস্থা আরও ভয়াবহ। একি শুধু বন্যার ফল? বন্যার স্রোতের বহু আগে থেকেই কলকাতার পথে পথে বুভুক্ষুর আর্তনাদ মানুষকে বিচলিত করেছে। গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের দল এক মুঠো অন্নের জন্য ভীড় জমিয়েছে মহানগরীতে। তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর মুখে। এর পেছনে নিশ্চয়ই প্রকৃতির হাত নেই, খরা-বন্যা এর মূল কারণ নয়। কেন গ্রামের নিচের তলার মানুষ—ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন গরীব কৃষক, এমন কি মাঝারী কৃষকরাও মৃত্যুর গহ্বরের দিকে লাইন দিয়ে চলে? এর মূল কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আর তারই সঙ্গে জড়িত কৃষি ব্যবস্থা।

বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার

স্বাধীনতার এই ২৭ বছরে ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় এমন কোন আমূল পরিবর্তন ঘটে নি যাতে কৃষকরা দু মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে। এমন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন করা হয় নি যাতে ভূমিহীন কৃষকরা জীবন ধারণের যোগ্য জমি পায়, ক্ষেতমজুররা কাজ পায়, ন্যায্য মজুরী পায়, গ্রাম্য বেকারদের যোগ্য কর্ম-সংস্থান হয়।

ইংরেজ আমলের জমিদারী-জায়গীরদারী প্রথার অবসান ঘটান হয়েছে

সত্য, বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি আইন পাস করে কাগজে কলমে মধ্যস্বত্বের বিলোপ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু মেহনতী কৃষকের স্বার্থে ভূমি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।

বুর্জোয়া শাসকরা যে জমিদারীর বিলোপ করেছেন তাও বিনা খেসারতে নয়। ভূস্বামীদের খেসারত দিতে হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। খেসারতের এই বিপুল বোঝা চেপেছে কৃষকদেরই ঘাড়ে। কিন্তু আইনের পাতায় মধ্যস্বত্বের অবসান ঘটান হলেও কার্যক্ষেত্রে আজও নানা আকারের মধ্যস্বত্ব বর্তমান।

সারা ভারত কিসান সভার ২০তম (বারাসত) অধিবেশনে বলা হয়েছে, "জমিদারী বিলোপ আইনগুলির মারফৎ বিধিবদ্ধ মধ্যস্বত্বের অবসান ঘটান সত্ত্বেও প্রজাস্বত্ব ও উপ-প্রজাস্বত্ব সমস্যার যথাযথ সমাধান হয় নি। দেশের প্রায় সবত্র এই মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বের অস্তিত্ব বর্তমান। তার সাথে রয়েছে গ্রাম্য গরীবদের ওপর নানা ধরনের শোষণ।"

ভারতের অর্থনীতিকে পুঁজিতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাওয়াই জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ, তাই কৃষিতে তারা পুরোপুরি সামন্ত ব্যবস্থা রাখতে চায় না, কিন্তু তাই বলে সামন্ত ব্যবস্থার পুরো অবসানও তারা করতে রাজী নয়। তারা চলেছে আধা-সামন্ত ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করে।

কৃষক সভার রিপোর্টে বলা হয়েছে, "কংগ্রেস শাসকরা আধা-সামন্ত ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করার নীতি অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু তার পুরো অবসান করে নয়। তাদের কৃষি আইনগুলো থেকেই তা দেখা যায়। কতকগুলি বিষয়ে বর্তমান আধা-সামন্ত স্বার্থের সঙ্গে আপসের ভিত্তিতে ঐ আইনগুলি রচিত। অবশ্য কংগ্রেসী কৃষি নীতির সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে আধা-সামন্ত ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া, যেখানে আধিপত্য থাকবে পুঁজিতান্ত্রিক জোতদার খামারু ও ধনী কৃষকদের। এই নীতির ফলে কৃষকরা পিষ্ট হচ্ছে নানা ধরনের শোষণের চাকায়—পুঁজিতান্ত্রিক ও আধা-সামন্ত উভয় প্রকার শোষণেরই।..."

ভারতের বুর্জোয়া শাসকদের কৃষি সংস্কারের একটা বড় দিক হচ্ছে জমির উচ্চ সীমা বেঁধে দেবার আইন। সে আইনে যে কত ফাঁক ও ফাঁকি রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কতবার যে এই সীমা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা হল তারও ঠিক ঠিকানা নেই। শেষ পর্যন্ত যেসব আইন করা হয়েছে তার ফাঁকও যথেষ্ট।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, আইনগতভাবে পরিবার পিছু জমির উচ্চ সীমা হচ্ছে ১০ থেকে ১০৮ একর (৩০ থেকে ৩২৪ বিঘা) পর্যন্ত। আর একথা কারও অজানা নাই যে জোতদাররা নানা অছিলায় নানা নামে-বেনামীতে বহু জমি হাতে রেখেছে। তাছাড়া আছে নানা ছাড়ের তালিকা।

কংগ্রেস সদস্য ও কৃষি সংস্কার সম্পর্কে সুপণ্ডিত শ্রীহর্ষদেও মালব্য এম পি লিখেছেন, "আমরা সেই ১৯৪৯ সাল থেকে ভূমি সংস্কারের কথা বলে আসছি।...কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত আমাদের সীমা বাঁধা আইনগুলি পুরো কার্যকর করা হয় নি। আমাদের সীমা বাঁধা আইনগুলি কার্যকর করতে দেরির পর দেরি করে চলেছি আর জোতদার ভূস্বামীরা, যারা এই সব আইনের কবলে পড়বে, তারা তাদের আত্মীয়, ভাই বোন, মা, মামা প্রভৃতিদের নামে জমি হস্তান্তর করেছেন। এর চরম দৃষ্টান্ত হল পশ্চিম বঙ্গের এক জোতদার তার ফটিক নামে এক ঘোড়ার নামে পর্যন্ত জমি হস্তান্তর করেছেন।" (সোশ্যালিস্ট ইণ্ডিয়া, ২১.২.৭৪)

জোতদারদের হাতে যে কত জমি রয়েছে তার পুরো হিসাব পাওয়া কঠিন।

১৯৬৮ সালে তৈরি একটা অসমাপ্ত হিসাবে দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গে ৭,১১১ জন বড় জোতদারের হাতে এখনও রয়ে গেছে ২৪,২২৮ বিঘা জমি। সম্প্রতি মুখার্জী-মৈত্র কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে দেখা যায় ২৪-পরগনার জনৈক জোতদারের একলার হাতেই রয়েছে ১৫০০ বিঘা চাষের জমি ও হাজার হাজার বিঘা মেছো ভেরী। আর একটা হিসেবে দেখা যায় পশ্চিম দিনাজপুরের চারজন জোতদার বে-আইনীভাবে ৩,৩০০ বিঘা জমি কব্জায় রেখেছে।

আবার চাষের অযোগ্য বলে রেকর্ড করিয়ে রাখা হয়েছে বেশ মোটা পরিমাণ জমি যাতে সে জমি আর কৃষকদের মধ্যে বন্টন না করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে এই চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ, ১,২৮,৫৪০ একর বলে রেকর্ড করা আছে।

তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই যখন দেখতে পাওয়া যায় বুর্জোয়া সরকারের কৃষি সংস্কারের কল্যাণে উচ্চ সীমা বাঁধার আইনে গোটা দেশের ৪০ কোটি

একর চাষের জমির ভিতর মাত্র ২৪ লাখ একর উদ্বৃত্ত দেখান হয়েছে। তাও আবার ঐ উদ্বৃত্ত জমির অর্ধেক মাত্র বিলি করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চাষের জমির মাত্র ০·৩ শতাংশ বিলি হয়েছে। বুর্জোয়া শাসকদের কৃষি সংস্কারের এই হল নিষ্টুর পরিহাস।

আজ পর্যন্ত বুর্জোয়া শাসকরা যেটুকু বা কৃষি সংস্কার করেছেন তাও কার্যকর করার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি, বরং কার্যকর করার পথে যথেষ্ট বাধার সুযোগ রেখে দিয়েছেন। পলিসি ঘোষণায় ও তার রূপায়ণে ফাঁকের অন্ত নেই।

১৯৭০ সালে পরিকল্পনা কমিশন কৃষি সম্পর্ক পর্যালোচনার জন্য একটি "টাস্ক ফোর্স" গঠন করেন। ঐ কমিটির রিপোর্টে নিতান্ত হতাশার সঙ্গেই বলা হয়েছে, "স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে সাধারণের ক্ষেত্রে কথায় ও কাজে, পলিসি ঘোষণায় ও তার রূপায়ণের ভিতর যে ফাঁক দেখা গেছে, ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রের মত অত বড় ফাঁক আর কোথাও দেখা যায় নি।"

এই ফাঁকগুলি বুর্জোয়া শাসকরা আধা-সামন্ত শোষকদের সুবিধার জন্যই যে রেখে দিয়েছেন এবং মামলা মোকদ্দমার ভিতর দিয়ে তাঁদের বেরিয়ে যাবার পথ করে দিয়েছেন এবং ঐ ফাঁকগুলি যে ইচ্ছে করেই করা হয়েছে, সে কথা ঐ টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "সাফল্যের যে সামান্য সম্ভাবনাটুকু ছিল তাও ডুবে গেছে আইনের ফাঁক দিয়ে এবং সুদীর্ঘ মামলা-মোকদ্দমার ভিতর দিয়ে। ভূমি সংস্কার আইনগুলি নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ; কতকগুলি ফাঁক রাখা হয়েছে রীতিমত ইচ্ছে করে, আর কতকগুলি ফাঁক রয়েছে খসড়ার ত্রুটির জন্য।"

এই ফাঁকের ফলে জোতদার-ধনী কৃষকরা আদালতের আশ্রয় নিয়ে আইন এড়াতে পারে, কৃষকদের হয়রান করতে পারে। কারণ গরীব কৃষকের পয়সা খরচ করে আদালতে যাবার ক্ষমতা নেই। তাই ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, আইনের ফাঁকগুলি জোতদার ও উকিলদের কাছে "ভগবানের আশীর্বাদ" স্বরূপ।

ঐ রিপোর্ট একথাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে আইন কার্যকর করার কাঠামোটিই প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করছে। ঐ রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে,

"যাদের হাতে আইন কার্যকর করার ক্ষমতা ন্যস্ত সেই আমলাতন্ত্র ভূমি সংস্কার কার্যকর করায় মোটেই আগ্রহশীল নয়, কখন বা বিরূপ। এটা অবশ্য অনিবার্য, কারণ যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, যারা প্রশাসনের মাথায় বসে আছে হয় তারা নিজেরাই বড় জোতদার ভূস্বামী, নয়ত এদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।"

তাই বর্তমান কাঠামোটি বজায় রেখে সামান্য ভূমি সংস্কারও কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব। তারই ফলে এই বুর্জোয়া ভূমি সংস্কারও ব্যর্থ হচ্ছে।

সরকারী টাস্ক ফোর্স তাই নিতান্ত ক্ষোভের সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন, ...এই সকল কার্যসূচী সফল হয়েছে বলা যায় না। দেশের বহুলাংশে এখনও বর্গাদারী রূপে অতি শোষণমূলক ব্যবস্থা বর্তমান। এই ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা শুধু যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারকে কায়েম রেখেছে তাই নয়, আধুনিক কারিগরী ও উন্নত কৃষির পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কারের যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা কৃষির কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।"

বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার ব্যর্থতার নগ্ন প্রকাশ হচ্ছে ভূমি থেকে ব্যাপক আকারে কৃষক উচ্ছেদ ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি। সারা ভারত কিসান সভার ২১ তম অধিবেশনে (ভাটিন্দা) সম্পাদকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "গত দু দশকে ভারতের কৃষি কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ক্ষেতমজুরদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।...একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় এরা কৃষি জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ।"

১৯৬১ সালে সারা ভারতে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ। ১৯৭১ সালে এদের সংখ্যা ৪৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ। ওদিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯৬১ সালে ভূমির মালিক কৃষকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫২·৭৮ শতাংশ, ১৯৭১ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮·৩৪ শতাংশ। আর ভূমিহীনের সংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল ১৬·৭ শতাংশ, ১৯৭১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬·৩৮ শতাংশ। মোটামুটি হিসাবে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। যাদের জমি ৫

একরেরও কম, অর্থাৎ জমিতে যাদের ভরন পোষণ হয় না তাদের সংখ্যা কৃষি জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ।

খরা-বন্যায়, দুর্ভিক্ষে-মহামারিতে এই নিঃস্ব কৃষকের দলই হাজারে হাজারে মৃত্যুর পথে চলে। অবশ্য বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার গ্রামের কোন পরিবর্তন ঘটায় নি তা নয়। সে আমলের রাজা-রাজড়া ও বড় বড় জমিদারদের সে প্রতাপ আর নেই। কৃষিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে কৃষকদের এক অংশ লাভবান হয়েছে। তারা "সবুজ বিপ্লবের" সুযোগ নিতে পারছে। হাতে পয়সা থাকায় তারা আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে পারছে, সেচ ও উন্নত বীজের সুযোগ নিতে পারছে, অর্থকরী ফসল ফলিয়ে পয়সা করতে পারছে। কিন্তু এই ধনী কৃষক ও কুলাকের দল অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

হর্ষদেও মালবোর মতে, "কৃষি সংস্কারে ফাঁক থাকায়, ভুলভাবে সংস্কার কার্যকর করায় আমাদের গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষক, কুলাকের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম্য জনতার মাত্র সাত শতাংশ তারা। তারা দশ, পনের একর বা ততোধিক পরিমাণ জমির মালিক। এই ধনী কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এরাই গম অধিগ্রহণে বাধা দিয়েছে। এরা মণ্ডির আড়তদারদের সঙ্গে যুক্ত, আর ঐ আড়তদারদের মারফৎ শহরের বড় বড় ব্যবসাদারদের সঙ্গেও যুক্ত। এইভাবে তারা বড় বড় শহরের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গেও যুক্ত। এরাই রয়েছে গ্রামের সকল প্রতিক্রিয়ার মূলে।"

অবশ্য একটা কথা এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ট্যাক্স বৃদ্ধি, জিনিস-পত্রের অসম্ভব দর প্রভৃতি ধনী কৃষকদের একাংশকেও স্পর্শ করে। তাই যারা একচেটিয়া পুঁজির দালালে পরিণত হয়নি ধনী কৃষকদের সেই অংশটির জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

মোট কথা, দেখা যাচ্ছে ভারতে বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার (১) ইংরেজ আমলের জমিদারি-জায়গীরদারীর অবসান ঘটিয়েছে (২) আধা-সামন্ত প্রথাকে সঙ্কুচিত করেছে কিন্তু তার অবসান ঘটায় নি (৩) কৃষিতে আধা-সামন্ত প্রথার অবশেষের ওপরই পুঁজিতান্ত্রিক প্রথার সূচনা করেছে। ফলে কৃষকদের এক অংশ লাভবান হলেও ব্যাপক কৃষক সমাজ, বিশেষ করে ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক এবং এমন কি মাঝারী কৃষকরাও দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বুর্জোয়া শাসকরা যে মেহনতী কৃষকের স্বার্থে কৃষি বিপ্লব সমাধা করতে নারাজ তা লেনিন বহু আগেই দেখিয়ে গেছেন।

রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা

জারের রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে রাশিয়ার বুর্জোয়া দলগুলি কৃষকদের স্বার্থে কৃষি সংস্কার করতে আদৌ উৎসাহী ছিল না। জারের রাশিয়ায় উদারনৈতিক বামপন্থী বুর্জোয়া দল, ক্যাডেট দল চাইত আপস। লেনিন লিখছেন, "ক্যাডেটরা চায় যতদূর পারে বৃহদাকারে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করতে। তারা কৃষকদের মঙ্গলের জন্য সকল ভূসম্পত্তির পুরো হস্তান্তরের বিরোধী"। (লেনিন রচনাবলী, ১০ম খণ্ড)

তাই লেনিন কৃষকদের বলেছেন বুর্জোয়াদের ওপর ভরসা না রাখতে। তিনি বলেছেন, "জমি ও স্বাধীনতার বর্তমান সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করতে হলে কৃষকদেরকে ক্যাডেটদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে হবে, পুরোপুরি আত্মনির্ভর হতে হবে। তারা যেন ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বিলগুলির আলোচনায় বিভ্রান্ত না হয়। যতদিন ক্ষমতা থাকবে পুরনো স্বৈরাচারী, ভূস্বামী ও আমলাতান্ত্রিক সরকারের হাতে ততদিন ঐসব প্রস্তাবের আলোচনায় শুধু সময়ের অপচয় করা হবে।···কৃষকরা সহজেই ভূমি সমস্যার সমাধান করতে পারবে, যে মুহূর্তে পুরনো শাসনের বাধা চূর্ণ হবে। তাই এইসব বাধার পরিপূর্ণ অবসানের জন্য সকল দৃষ্টি দাও কৃষক সংগ্রামের দিকে।" (ঐ)

কৃষক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত লেনিন বার বার সেই কথার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সোজা ও পরিষ্কার ভাষায় কৃষকদের বলতে হবে ; যদি কৃষি বিপ্লবকে তার পরিণতিতে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে রাজনৈতিক বিপ্লবকেও তার পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে। কারণ যদি রাজনৈতিক বিপ্লবকে তার শেষ অবধি নিয়ে যাওয়া না হয় তাহলে স্থায়ী কৃষি বিপ্লব হবে না এবং বোধ হয় আদৌ কৃষি বিপ্লব হবে না।" (ঐ)

লেনিন আরও বলেছেন, "কৃষি বিপ্লব ফাঁকা বুলিই থেকে যাবে যদি তার পূর্ব শর্ত বিপ্লবী জনতার ক্ষমতা দখল না হয়। এই শেষোক্ত শর্ত ছাড়া কৃষি বিপ্লব হবে না, হবে কৃষক বিদ্রোহ, অথবা একটা ক্যাডেট কৃষি সংস্কার।" (ঐ)

তাই কৃষি বিপ্লব সমাধার জন্য লেনিন কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কথা বলেছেন, রাজনৈতিক সংগ্রামে তাদের অংশ গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন এবং ক্ষমতায় অংশীদার হবার কথা বলেছেন। লেনিন বলেছেন, "মৌল রাজনৈতিক বিপ্লব সমাধা করা খুবই কঠিন, ঠিক তেমনি কঠিন কৃষি বিপ্লব সাধন করা। আগেরটির সঙ্গে যুক্ত না করলে শেষেরটি অসম্ভব এবং প্রত্যেক সমাজতন্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন না করা, এর ওপর কোন আবরণ টেনে না দেওয়া,···বরং সবটাই খুলে বলা, কৃষকদের একথা বোঝান যে তারা যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত না যায় তাহলে তারা জমিদারের জমি দখল করার কথা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে পারে না।" (লেনিন রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড)

রাশিয়ায় কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলা ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলায় শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টি, সে যুগের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। লেনিন বলেছেন, "রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাসির কৃষি কর্মসূচী হচ্ছে কৃষি বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্মসূচী।"

স্বভাবতই সে যুগের রুশ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে এ যুগের ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য অনেক। সে যুগের রাশিয়ার বুর্জোয়া ক্যাডেট দলের সঙ্গে এ যুগের ভারতের বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের বিরাট তফাৎ।

কিন্তু লেনিনের সে যুগের উক্তির ভিতর একটি পরম সত্য রয়েছে। তা হল: কৃষি বিপ্লব সাধন করতে হবে কৃষকের স্বার্থে, কৃষককে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, কৃষককে বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শরিক হিসাবে গড়ে তুলে এবং বিপ্লবের পরিণতিতে ক্ষমতার অংশীদার করার কর্মসূচী ও সংকল্প গ্রহণ করে।

এই মাপকাঠিতে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী যে কৃষকের স্বার্থে কৃষি সংস্কার করতে পারেনি তা আমরা দেখেছি। এ কর্তব্য একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই সমাধা করতে পারে। তাই কৃষকেদের একান্ত প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর পথ

১৯৬৯ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছিলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এটাই দেখিয়ে দিয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, প্রকৃত সামাজিক অগ্রগতির জন্য কৃষকদের শক্রিয়-ভাবে যোগদান করাবার সুনিশ্চিত পথ হল তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করা। জাতীয় মুক্তি এলাকার এটাই কর্তব্য।"

তৃতীয় দুনিয়ায় যে শ্রমিক শ্রেণীকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে "ওয়ার্ল্ড কমিউনিস্ট মুভমেন্ট" বইটিতে বলা হয়েছে, "পৃথিবীর এই অঞ্চলে মৌল সামাজিক পরিবর্তনের বর্তমান স্তরে কৃষকদের ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা প্রয়োজন। এখানে শ্রমিক-শ্রেণী ও তার পার্টির পক্ষে কৃষকদের সম্পর্কে সঠিক মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতি গ্রহণ করা একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল সর্বাগ্রে কৃষি সমস্যার অবিচল ও মৌল সমাধান, এ ছাড়া উন্নয়নশীল জাতিগুলি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করতে পারে না।"

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলার ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও পিছিয়ে নেই। ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার জন্য যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কর্মসূচী কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেছে; তাতে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ; "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিত্তি ও কেন্দ্রস্থল হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী"। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ভিন্ন যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টই গঠন করা যায় না ; সেই কথার উপর জোর দিয়ে পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে ; "আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভূমিকা ও গুরুত্ব অবিচলভাবে ও ক্রমেই বেশী করে না গড়ে তুলে ও শক্তিশালী না করে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা যাবে না।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে উঠবে

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকেই ভিত্তি করে, শ্রমিক-বুর্জোয়া কিংবা শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মৈত্রীকে ভিত্তি ও কেন্দ্রস্থল করে নয়। যদিও বিপ্লবী মধ্যবিত্ত যুক্তফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় মিত্র হবে এবং অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা দোলায়মান হলেও যুক্তফ্রন্টে সামিল হবে।

ভারতের পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী যে সব চাইতে বিপ্লবী শ্রেণী ও তাকেই যে বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে সমাজতন্ত্রী মহলে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু কৃষককুলের ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্টতার অভাব দেখা যায়।

ভারতের সামাজিক কাঠামোর রূপান্তরে আধা-সামন্ত ব্যবস্থার অবসান একটি প্রধান কাজ। ভারতের বিপ্লব কৃষি বিপ্লবও বটে। তাই এই বিপ্লবে মেহনতী কৃষকরা একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। অবশ্য শ্রমিক শ্রেণীর সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই তারা সে ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমরা আগেই দেখেছি এই মেহনতী কৃষককুল গ্রামাঞ্চলে সব চাইতে বেশী শোষিত ও নিপীড়িত। তারা স্বভাবতই সামন্তব্যবস্থার পুরোপুরি অবসান চায়। আমরা এটাও দেখেছি ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের ফলে কৃষিতেও পুঁজির বিকাশ ঘটছে এবং যেহেতু ভারতে একচেটিয়া পুঁজির প্রভুত্ব রয়েছে তাই গ্রামাঞ্চলও একচেটিয়া পুঁজির নাগপাশ থেকে মুক্ত নয়। গ্রামাঞ্চল পুঁজিতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে মেহনতী কৃষকরা শুধু আধা-সামন্ত শোষণেরই শিকার হয় না, একচেটিয়া পুঁজির শোষণেরও শিকার হয়। চোরাবাজার, মুনাফাখোরী, কারখানাজাত পণ্যের আকাশচুম্বী দর—এ সবই কৃষকদের সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়। তাই একচেটিয়া পুঁজির শোষণ থেকেও কৃষকরা মুক্তি চায়। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনেও তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না বলে পুঁজিতন্ত্রের সঙ্কোচনে এবং অ-পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনে তাদের স্বার্থ রয়েছে। তাই এই বিশাল মেহনতী কৃষকসমাজ ভারতের বর্তমান বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর সব চাইতে সুদৃঢ় মিত্র। তাই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী বিপ্লবের গভীরতা ও ব্যাপকতা এনে দিতে পারে, বিপ্লবে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। আর এই কারণেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

কিন্তু শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে উঠবে কিভাবে? কেউ কেউ মনে করেন,

বর্তমানে কংগ্রেসের প্রভাবে যে কৃষক সমাজ রয়েছে তারা যেমনটি আছে তেমনিই থাকবে, কমিউনিস্টদের প্রভাবাধীন কৃষকদের সাথে তাদের কোন রকম যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে উঠবে।

এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। একটা কথা পরিষ্কার বোঝা দরকার, মেহনতী কৃষকদের বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলা যায় না। আজও ভারতে ব্যাপক কৃষককুলের ওপর বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রভাব প্রবল। কৃষকদের ভিতর এই মোহ বিস্তার করা হয় যে কংগ্রেসী বুর্জোয়া সরকার যে-কৃষি সংস্কার করছে, তাই ক্রমে কৃষকদের মুক্তি এনে দেবে।

লেনিনের কথা স্মরণে রেখে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণীর এই মিথ্যা প্রচারের অসারতা প্রমাণ করবে বাস্তব জীবনের জলন্ত অভিজ্ঞতা কৃষকদের সামনে তুলে ধরে, তাদের সামনে শ্রমিকশ্রেণীর পাল্টা কৃষি কর্মসূচী উপস্থিত করে, মেহনতী কৃষকদেরকে দৈনন্দিন সংগ্রামে টেনে এনে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

"দি ওয়ার্ল্ড কমিউনিস্ট মুভমেন্ট" বইটিতে "এশিয়ায় ও আফ্রিকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি কৃষকদের বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এবং তাদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে চেষ্টা করছে। এই কর্তব্য সাধনের জন্য তারা জোরের সঙ্গে মৌল কৃষি কর্মসূচী উপস্থিত করছে এবং এমন স্লোগান ও দাবি তুলছে যা কৃষকদের আশু চাহিদা মেটায় ও তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে।"

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবেও বুর্জোয়া প্রভাব থেকে কৃষকদের মুক্ত করার বিষয়ে বলা হয়েছে, "ঐক্য ও সংগ্রামের দ্বৈত নীতির ভিত্তিতে এই পলিসির সঠিক প্রয়োগ ও কার্যকর করার ভিতর দিয়েই মেহনতী জনতাকে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে স্থিরভাবে জয় করে আনা যাবে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা যাবে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যকে কেন্দ্রস্থল করে।"

মেহনতী কৃষককে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে টেনে আনার পদ্ধতি এই নয় যে, বুর্জোয়া প্রভাবিত কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কোন যোগসূত্র না রাখা বা মিলিতভাবে কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে

সংগ্রাম না করা। কমিউনিস্ট প্রভাবিত কৃষক সংগঠন নিশ্চয়ই বুর্জোয়াশ্রেণী প্রভাবিত কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কৃষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করবে, যেমনভাবে বুর্জোয়া প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন মিলিতভাবে লড়াই করে। এই ধরনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যেমন ক্রমেই ঐক্যবদ্ধ হয়, শ্রেণীসচেতন হয় এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ক্রমেই বুর্জোয়া প্রভাব মুক্ত হয়, তেমনিভাবে মেহনতী কৃষকরাও নিজ দাবি-দাওয়া নিয়ে মিলিত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়বে এবং ক্রমেই বুর্জোয়া প্রভাব মুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাবে আসবে। আর এইভাবে গড়ে উঠবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী।

মোদ্দা কথা হল, বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মেহনতী কৃষকদের মুক্ত করতে না পারলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়া যাবে না। আর শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়তে না পারলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রস্থল গড়ে উঠবে না, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টই গঠন করা যাবে না। এই দিক থেকে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর গুরুত্ব অপরিসীম।

বিষয়টি আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হয়ে উঠেছে এই জন্য যে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করার ফলে দেশ এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভিতর দিয়ে চলেছে, চোরাবাজার, মুনাফাখোরী, জিনিষপত্রের গগণ-চুম্বী দর, বেকারী, অনাহার ও স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর পরিস্থিতিকে অগ্নি-গর্ভ করে তুলেছে।

এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী বিরাট গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে। পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "আমাদের পার্টিকে আজ অগ্রণী হয়ে সারা ভারতে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সকল অংশের মানুষের সব চাইতে জ্বলন্ত সমস্যাবলীর ভিত্তিতে।" আর এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ক্রমেই "জনসাধারণের ভিতর বাম ও গণ-তান্ত্রিক ঐক্যের সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে হবে।"

ভারতে বর্তমানে যে শ্রেণী সমাবেশ রয়েছে, বিরাট ও ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর অনুকূলে এই শ্রেণী সমাবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েই শুধু ঐ পাল্টা সরকার গঠন সম্ভব।

ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তাৎপর্য

পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে "পার্টি গণ-সমর্থন গড়ে তুলবে, শাসক কংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল অংশ সহ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য গড়ে তুলবে এবং এই ঐক্যকে এমন এক রাজনৈতিক স্তরে তুলবে যাতে দেশে শ্রেণী সমাবেশের পরিবর্তন ঘটবে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর অনুকূলে। শ্রেণী সমাবেশের এই পরিবর্তন এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান জঙ্গী আন্দোলনই কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে সরকারী ক্ষমতায় বুর্জোয়াশ্রেণীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাতে সক্ষম করাতে পারে এবং বর্তমান সরকারের স্থানে কেন্দ্রে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।"

সুতরাং আগামী দিনের আশু কর্তব্য হচ্ছে ব্যাপক গণআন্দোলনের ভিতর দিয়ে বর্তমান শ্রেণী সমাবেশের পরিবর্তন ঘটানো। ভারতে বর্তমানে যে শ্রেণী সমাবেশ রয়েছে, তাতে একদিকে যেমন সামন্ত-আধাসামন্ত ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এবং সাম্প্রদায়িক ও নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব বর্তমান, তেমনি কৃষককুল সহ ব্যাপক জনতার ভিতর বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব বর্তমান। তাই একদিকে যেমন সংগ্রাম চালাতে হবে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, তেমনি সংগ্রাম চালাতে হবে কৃষককুল সহ ব্যাপক জনতাকে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য। এই ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে শ্রেণী সমাবেশের পরিবর্তন ঘটবে, ক্রমেই শ্রমিকশ্রেণী পুরোভাগে এসে দাঁড়াবে এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, যে ফ্রন্টে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত দৃঢ়পদে এগিয়ে আসবে এবং গণ-আন্দোলনের ব্যাপক ধাক্কায় অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশও এই ফ্রন্টে সামিল হবে। আর শুধু তখনই সম্ভব হবে পাল্টা সরকার গঠন যে সরকারে "মিলিতভাবে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করবে এমন সব পার্টি ও শক্তি যারা শ্রমিক, কৃষক, চরমপন্থী মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভিতরকার অ-একচেটিয়া দেশপ্রেমিক অংশের প্রতিনিধি।"

বর্তমান পর্যায়ে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর গভীর তাৎপর্য এই ক্ষমতা দখলে—পাল্টা সরকার গঠনে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন—নয়া উপনিবেশবাদের গোপন হাত

নির্মাল্য বাগচী

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আমাদের দেশে কাজকর্ম সুরু করে ১৯৫১ সালে। আজও তাদের কাজ অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে মার্শাল প্ল্যানের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটার পল হফম্যান পরবর্তীকালে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর ও সভাপতি হন। তিনি ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পণ্ডিত নেহেরু ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে এদেশে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সেই থেকে দাবি, তাঁরা আমাদের দেশে আমন্ত্রিত, অতএব তাঁরা সমস্ত সমালোচনার উর্ধে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে সি. আই. এ-র সঙ্গে অভিন্ন করে দেখলে ভুল হবে। আবার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন শুধু মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে ভাবলেও তেমনি ভুল হবে। আসলে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কাজকর্ম অনেক সূক্ষ্মভাবে চলে, এদের অনুপ্রবেশ জাতির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এদের একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা আছে, একটি দর্শন নিয়ে এরা চলেছে। সুতরাং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া কঠিন, এদের কাজকর্মের ব্যাপকতা, গভীরতা ও কৌশল বিস্ময়কর। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মত ব্যাপক না হলেও আর একটি ফাউণ্ডেশন এদেশে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তার নাম রকফেলার ফাউণ্ডেশন।

ভারত সরকার যদিও সি. আই. এ-র সঙ্গে যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পেয়ে এশিয়া ফাউণ্ডেশনকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন; কিন্তু ফোর্ড বা রকফেলার ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব খুবই উদার, যেন রকফেলার বা ফোর্ড ফাউণ্ডেশন সন্দেহের উর্ধে।

ভারত সরকার বার্ষিক এক টাকা খাজনায় নয়াদিল্লীর লোদি এস্টেটে তিন একর জমি(১) ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে দীর্ঘ ইজারা দিয়েছেন। সেখানে তাদের অফিস, বাসস্থান, অতিথিশালা গড়ে উঠেছে। ফোর্ড ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অ-ভারতীয় ব্যক্তিরা আয়কর মুক্ত, ফলে আমাদের রাজস্ব ভাণ্ডার কোটি

কোটি টাকা আয়কর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।(২) ভারত সরকারের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে এখনও মোহভঙ্গের কোন লক্ষণ নেই।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পশ্চাদ ইতিহাস একটু জেনে রাখা দরকার। ১৯৩৬ সাল—মার্কিন দেশে তখন ধনতন্ত্রের মহামন্দা চলছে—সেই অবস্থায় মার্কিন ধনকুবের হেনরী ফোর্ড ও তাঁর পুত্র এডসেল ফোর্ড ২৫ হাজার ডলারের একটি চেক কেটে এই প্রতিষ্ঠানটি পত্তন করেন। পরে প্রায় গোটা সম্পত্তিই প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে আসে।

মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই সময় থেকে একাধিক ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেন, এখন এদের সংখ্যা ২২ হাজার, বে-সরকারী হিসাব হল ৪৫ হাজার, এদের মূলধন দাঁড়িয়েছে দুই হাজার কোটি ডলার, এর মধ্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মূলধন হল ৩৬০ কোটি ডলার, রকফেলারের ৮০ কোটি, ডিউক ৬১ কোটি এবং কার্নেগী ৩৪ কোটি ডলার। ফাউণ্ডেশনের রাজা হল ফোর্ড ফাউণ্ডেশন।

হঠাৎ এত ফাউণ্ডেশন গজিয়ে ওঠার পিছনে অনেক উদ্দেশ্য আছে—ট্যাক্স নয়র, বদান্যতার নাম করে কর ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ, ব্যবসা ও বদান্যতা আমাদের দেশের মতই হাতে হাত মিলিয়ে চলে। তাছাড়া মনোপলির দুর্ভাবনা, সামাজিক ভারসাম্য বে-সামাল হয়ে পড়লে কি দাঁড়াবে কেউ জানে না, তাকে ঠেকা দেওয়ার জন্য এই সব ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে খয়রাত দানের ঘুষ বিতরণ পর্ব চালাতে হয়।

সেই ১৯৩৬ সালের দুর্যোগের দিনে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মিশিগান রাজ্যকে কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয় এবং সেখান থেকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৫০ সাল থেকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ইতিহাসের আধুনিক যুগ সুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের সাফল্য ও ব্যাপ্তি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে বিশ্বের আসরে নামতে বাধ্য করল। সেই বিশ্ব-পরিকল্পনার জালে ভারতবর্ষও বাঁধা পড়ল।(৩) তৃতীয় দুনিয়ার নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি যাতে সমাজতন্ত্রের প্রভাবে না পড়ে ও ধনতন্ত্র যাতে অটুট, অক্ষত থাকে এই উদ্দেশ্যে ফোর্ড ও রকফেলার ফাউণ্ডেশন দ্রুতগতিতে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশের পর দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মার্কিন রাষ্ট্রে যাঁরা কোন সময় শীর্ষ স্থান অধিকার করে বিশ্বরাজনীতিতে

হাত পাকিয়েছেন, এমন সব ব্যক্তিরাই ফোর্ড ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সভাপতি বা ডিরেক্টর হয়েছেন। পল হফমানের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। একদা মার্কিন রাষ্ট্রের সচিব, কেনেডী ও জনসনের মন্ত্রণাদাতা, ডীন এচিসন হলেন রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সভাপতি। পরবর্তীকালে আইজেন হাওয়ারের গোপন কাজকর্মের প্রতিনিধি জর্জ হারার সেই পদে অভিষিক্ত হন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বর্তমান সভাপতি হলেন ম্যাক জর্জ বুণ্ডি, যিনি এই সেদিনও রাষ্ট্রপতি জনসনের প্রশাসনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কোন সম্পর্ক নেই, এই প্রচার নিতান্তই অলীক। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মার্কিন প্রশাসনের অদৃশ্য বাহু হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।(৪)

যেহেতু ফোর্ড ফাউণ্ডেশন নিজেকে প্রশাসন থেকে বিযুক্ত করে রাখে, তাতে মার্কিন প্রশাসনের একে ব্যবহার করতে দারুণ সুবিধা হয়। এমন কিছু প্রস্তাব যা মার্কিন রাষ্ট্রের পক্ষে অন্য দেশের কাছে তোলা অসুবিধাজনক, মর্যাদার প্রশ্নটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের আব্রুর আড়ালে 'মিডল ম্যান' হিসাবে সে কাজ হাসিল করতে পারে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতবর্ষে এই ধরণের ভূমিকা অনেকবার নিয়েছে এবং এইভাবে মার্কিন প্রশাসনকে সেবা করেছে।(৫)

ভারতে 'ফোর্ড' ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি ছিলেন ডগলাস এন্‌সমিনজার তিনি একটানা ১৯ বছর একাজ করেন, তাপর ভারত সরকারের নির্দেশে ভারত ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে যে গোপনীয় পর্য্যালোচনা করেন, তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, সত্তরের দশক হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বিশেষ সন্দিহান ; ভারতবর্ষে গণতন্ত্র যদি ভেঙ্গে পড়ে, সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।(৬) মার্কিন ভাষায় গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র সমার্থক। কমিউনিজম-বিরোধিতাই এর মূল লক্ষ্য।

বদান্যতার আড়ালে কমিউনিজম বিরোধিতার যে ব্যাপক কর্মসূচী ফোর্ড ও রকফেলার ফাউণ্ডেশন চালিয়ে যাচ্ছে, তার কিছু কিছু বিবরণ জানা যায়। মনে রাখা দরকার প্রধানতঃ রকফেলারের আনুকূল্যে প্রিন্সটন ও চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ ও রাসায়ন বিভাগে আণবিক গবেষণা চলছে ; প্রথম যে আণবিক বোমা তৈরী হয়, সেখানে রকফেলারের দান ব্যয়ের বড় অংশ

বহন করেছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "রাশিয়ান ইনষ্টিটিউট" গত বিশ বছর ধরে রকফেলারের টাকায় চলছে; এখান থেকে মার্কিন "সোভিয়েত-বিশেষজ্ঞরা" শিক্ষা পেয়ে থাকেন ও এরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রকফেলারের টাকায় অন্ততঃ দু'শ "রুশ সমস্যা" নিয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে একটি প্রতিষ্ঠান Institute on War, Revolution and Peace; দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Strategy and Propaganda বিভাগ; জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে Centre for Strategic Studies. পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রচার চালাতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন সক্রিয় উদ্যোগী।(৭)

"রুশিয়া ফাউণ্ডেশন" এদেশ থেকে বিতাড়িত হবার পর, যে সব প্রতিষ্ঠান অনাথ হল, তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন "কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম" সংস্থাটি এখন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহায্য পেয়ে চলছে। সুতরাং অনেক কিছু বাগাড়ম্বের ছলনা ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আসল রূপটি ঢেকে রাখতে পারছে না।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের এদেশে আগমন ঘটে একটি বিশেষ মুহূর্তে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হয়, সেই থেকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সরকারী ও বে সরকারী স্তরে আনাগোনা সুরু হয়। প্রথম বছরগুলি ফোর্ড ফাউণ্ডেশন নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতে চায়, যাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয়; বেশ কালক্ষয় "আন্তর্জাতিক টীম" নামে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন রিপোর্টগুলি প্রকাশ করে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি এবং ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে দুখানি রিপোর্ট "আন্তর্জাতিক টীমে"র সমীক্ষা হিসাবে প্রকাশিত হল। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে গেল, স্বনামেই ঘোষণা সুরু হল।

১৯৫১ থেকে ১৯৭৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতবর্ষে মোট খরচ করেছে—ডলার ১০০ ৫৬ মিলিয়ন।(৮)

এই অর্থ বিভিন্ন খাতে এইভাবে বণ্টন করা হয়েছে :

কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়ন	ডলার ২৯'৮৬৩মি
শিক্ষা	ডলার ২৮'১৭৯মি
শিল্প ও ব্যবসা উন্নয়ন	ডলার ২০'১৩৫মি
রাষ্ট্রীয় প্রশাসন	ডলার ১০'৮০৯মি
অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচী	ডলার ১১'৫২০মি
মোট	১০০'৫০৬মি

অন্যদিকে রকফেলারের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ২১'৪৯ মিলিয়ন ডলার '৭৩ সালে নূতন কোন বরাদ্দ করা হয়নি।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মতে মার্কিন দেশের বাহিরে ভারতবর্ষেই তারা সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকেন। নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষকে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেন।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করা যাক্। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞরা ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন ; পরিকল্পনা পর্ষদের সঙ্গে এ'দের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ। যে সব গোপনীয় তথ্য ও ফাইল সংসদের সদস্যরাও জানতে পারেন না, সে সমস্ত খুঁটিনাটি এদের নখদর্পণে।

এমনি একজন বিশেষজ্ঞ হলেন ওলফ লেদেজিনেস্কি। এই ভদ্রলোক তরুণ বয়সে সমাজতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে মার্কিন দেশে চলে আসেন ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন, পরে মার্কিন প্রশাসনে উচ্চপদে আসীন হন। ম্যাক আর্থার জাপান দখল করার পর লেদেজিনেস্কি জাপানের ভূমিসংস্কারের ভার গ্রহণ করেন—উদ্দেশ্য জাপানে সমরবাদের পুনরুত্থান বন্ধ করা ও কমিউনিজমকে রোধকরা। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পর এশিয়ার কৃষক কুলকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুমান থেকে শুরু করে মার্কিন রাষ্ট্রনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞেরা ভূমিসংস্কারের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন—কিন্তু এ হল এক বিশেষ ধরণের ভূমি সংস্কার যার মূল লক্ষ্য হল—জমিতে ছোট ছোট জোত সৃষ্টি করা, তাদের শুধু খাজনা নির্দিষ্ট করা ও দখলের স্থায়িত্ব দেওয়া গরীব কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করার কোন লক্ষ্য ছিল না ; এক ধরণের বিত্তবান কৃষকশ্রেণী তৈরী করা,

যারা গ্রামীণ ধনতন্ত্রের রক্ষক হবে এবং কৃষি বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রকে বাধা দেবে। মার্কিন রাজনীতি এশিয়ার দেশে দেশে এই ভূমি সংস্কারের 'ষ্ট্রাটেজী' গ্রহণ করে—জাপান থেকে শুরু করে ফিলিপাইন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও সর্বশেষ ভারতবর্ষে এই একই পরীক্ষা চলছে। (১)

লেদেজিনেস্কিকে নিয়ে আমাদের দেশে খুব নাচানাচি চলেছে, এর লেখা, এ'র পুস্তিকা সরকারী আমলা ছাড়াও রাজনৈতিক নেতাদের হাতে হাতে ঘোরে, উদ্ধৃতি বারে বারে দেওয়া হয়। পরিকল্পনা পর্ষদ এর লেখা একটা পুস্তিকা প্রকাশ করে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেন :- A study on Tenurial Conditions in Package Districts.—ভূমি সংস্কারের বড় দরদী বলে ভারতবর্ষে পরিচিত হলেন তিনি। এখনও তিনি ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের একজন উপদেষ্টা।

লেদেজিনেস্কি বিভিন্ন দেশে কবে কবে ছিলেন তার হিসাব হল—

(১) জাপান—১৯৪৫-৪৬, ৪৭-৪৮, '৫০-৫৪ ;

(২) তাইওয়ান—১৯৪৯, ১৯৫১ ;

(৩) দক্ষিণ ভিয়েতনাম—১৯৫৫-৬২ ;

(৪) ভারতবর্ষ—১৯৬২ সাল থেকে একটানা

এই ভদ্রলোক জাপানে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বক্তৃতা করেন :—

"It was quite apparent to me that the agrarian reform now in progress has cut the political ground from under neath the feet of the communists in the Japanese countryside, thereby strengthening the forces that make for a middle of the road, stable, petit burgeois rural society."

দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৭ বছর একটানা প্রতিবিপ্লবী ভূমি সংস্কার প্রবর্তনে নিযুক্ত থাকেন তিনি ; দিয়েম সরকারের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও প্রেসিডেন্ট দিয়েমের ভূমি সংস্কার বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার যে হারে ভূমি সংস্কার শুরু করে, সেখানে লেদেজিনেস্কিকে হার স্বীকার করতে হল ; বরং উল্টো ফল হল, যে কৃষক বিপ্লবী সরকারের কাছ থেকে জমি পেয়েছে, তার জমিগুলি এরা কেড়ে নেবার চেষ্টায় বিরোধ আরো বেড়ে উঠল, বিপ্লব আরও জোরদার হল।

এই অবস্থায় হতাশায় মুহ্যমান লেদেঞ্জিনেস্কি ভারতবর্ষে এলেন এশিয়ার কৃষকদের কমিউনিজমের হাত থেকে শেষ উদ্ধার করার জন্য।

জেনে রাখা ভাল, ১৯৪৯-এর অক্টোবরে চীন বিপ্লব হয়ে যাওয়ার পরও শেষ রক্ষার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চীনের দুইটি প্রদেশে—কিয়াংসি ও সেজেচানে—লাল ফৌজের অগ্রগতি রোধ করার জন্য 'ভূমি সংস্কারে'র পরীক্ষা চালাবার জন্য উপস্থিত হন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে চীন দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

এ হেন ধুরন্ধর ব্যক্তিটি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞ হয়ে এদেশে অবস্থান করছেন ও ভূমি সমস্যা নিয়ে ঢালাও উপদেশ ও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

লেদেঞ্জিনেস্কি আরও খোলাখুলি তাঁর উদ্দেশ্য অন্যত্র প্রকাশ করেছেন :—

"If land reforms to improve the welfare of peasants are not initiated before it is too late and from above...then they, the communists, will do it for them. In that event, much more will be lost than the landlord's land."

১.

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞরা ভারতে খাদ্য সংকট নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করেছেন—১৯৫৯ সালে তাঁদের লোকজনের রিপোর্ট বের হল :

"India's Food Crisis and steps to meet it"(১০)

সুরু হল এক একটি ধাপ। "অধিক ফসল ফলাও" বা "সমষ্টি উন্নয়নের" শৈশবের স্তর পার হয়ে, ১৯৬০-৬১ সালে "প্যাকেজ" প্রোগ্রাম নামে ম্যাজিকের খেলা সুরু হল; এর আসল নাম হল—The Intensive Agricultural District Programme (IADP); ১৯৬৪-৬৫ সালে নূতন নামকরণ হল—The Intensive Agricultural Area Programme (IAAP); ১৯৬৯ সালে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও 'সবুজ বিপ্লব'; সবুজ বিপ্লবের ঢোড়ে ভারত সরকারের কৃষি ভবন ও মেতে উঠলেন। এর সঙ্গে ১৯৭৩ সালে পাল্লালাল দাসগুপ্তের Comprehensive Area Development Programme (CADP)-র কোনও ধারাবাহিকতা কি সন্ধান করা যায় না?

ফল হল, মার্কিন সারের বড় ব্যবসা ফেঁদে উঠেছে; মার্কিন দেশ, কানাডা,

মেক্সিকো থেকে ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভারতীয় সরবরাহ মিশন বছর বছর(১১) কত দামে নানাধরণের সার কিনেছে তার হিসাব হল :

১৯৬২ ৬৩	=	১৬·৬০ কোটি টাকা
৬৩-৬৪	=	১৬·০০ "
৬৪-৬৫	=	৩৮·০০
৬৫-৬৬	=	৭০·০০ "
৬৬-৬৭	=	১৭০·০০ "
৬৭-৬৮	=	২১১·০০ "
৬৮-৬৯	=	১৯৮·০০ "
৬৯-৭০	=	৪২·০০ "
৭০-৭১	=	৫০·০০ "
৭১-৭২	=	৫১·০২ "
৭২-৭৩	=	১৮১·৫৭ "
৭৩-৭৪	=	১৬৪·৩৭

অতএব মার্কিনী কৌশল জয়যুক্ত হল : ভূমি সংস্কারকে ঠেকানো, ধনী কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করা, এবং সার এদেশে চালান দেওয়া ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশীটাই কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ব্যয় সার্থক হয়েছে ; পিছনকার যে রাজনীতি ও অর্থনীতি কাজ করেছে, সে মতলব ধরা কঠিন নয়।

অল্প বছরের মধ্যে লেদেঞ্জিনেস্কি ভোল পালটিয়ে ফেলেছেন, আগে যেটুকুবা জমির সর্বোচ্চ সীমা ব· ভূমি বণ্টনের কথা বলতেন, সে সব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ; এখন বলছেন,—

"In the light of India's past experience and current political realities major emphasis on ceilings now is not warranted,... the role played by the big owners in the new technology is deemed paramount."(১২)

২.

ফোড· ফাউণ্ডেশনের দ্বিতীয় লক্ষ্য শিক্ষার প্রতি ; মূল্যায়নের পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় (শারদীয়, ১৩৭৯) আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ফোর্ড

ফাউণ্ডেশনের অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই সময় (১৯৫২-৫৩) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বিশেষজ্ঞ যুক্ত ছিলেন তাঁর নাম ফিলিপ কুম্বস ; পরবর্তীকালে তিনি কেনেডি সরকারের সহকারী সচিব নিযুক্ত হন ; এই ফিলিপ কুম্বস একখানি বই লিখেছেন—The World Educational Crisis ; সেই বইয়ে ভারতবর্ষের বহুমুখীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সংস্কার মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী করা হল, তা সম্পূর্ণ আমেরিকার অনুকরণে (akin to American Comprehensive schools),(১৩ এই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিষময় ফল সম্পর্কে অনেক মূল্য দিয়ে বেশ দেরিতে আমাদের বুঝতে হয়েছে।

নূতন যে 'দশ শ্রেণীযুক্ত' মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে, তার একটি বৈশিষ্ট্য হল "work education" শিক্ষা ও উৎপাদন কর্মের মধ্যে যোগ সাধন। আমাদের দেশের পুরনো চিন্তাধারা ও বাস্তব অবস্থায় এই কাজটি খুবই কঠিন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ এই প্রকল্পটি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন—তার নাম ইউগিন ষ্ট্যালি। দীর্ঘদিন অর্থনীতিবিদ হিসাবে ভারতবর্ষকে উপদেশ দিয়েছেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার প্রতি সমস্ত দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করতে ; হঠাৎ শিক্ষা বিশেষকরে work-education এর দিকে তিনি নজর দিয়েছেন। এই ভদ্রলোকের পূর্ব ইতিহাস হল ইনিও দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েম সরকারের সময় খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। যখন লেদেঞ্জিনেস্কির তথাকথিত ভূমি সংস্কার চূড়ান্ত ব্যর্থ হল, তখন ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালে ডঃ ইউগিন ষ্ট্যালী সায়গনে এসে উপস্থিত হলেন ; তিনি প্রতিবিপ্লব চালাবার জন্য এক নূতন দাওয়াই বাতলালেন—Strategic hamlet programme(১৪) গ্রামগুলিকে ঘিরে গ্রামের লোকদের দলে দলে পুরে বন্দী শিবির তৈরী করা। এহেন ব্যক্তি আজ শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, বড় ভয়ের কথা, নানা সন্দেহ মনে আসে। কিন্তু এঁরাই তো শিক্ষা মন্ত্রক ও পরিকল্পনা পর্ষদকে উপদেশ দিয়ে চলেছেন ; ভারত সরকারের মনে তো কোন দ্বিধা নেই এন. সি. ই. আর. টি. (National Council of Education, Research and Training) তো ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের লোকজনে ঠাসা।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন—নয়া উপনিবেশবাদের গোপন হাত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯৬৬) কার রচনা ? ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞ ম্যালকম উইলী আরও দুই সঙ্গী নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৩ সালে প্রবেশ করলেন রেজিস্টার সাহেবকে তাড়িয়ে তাঁর ঘরখানি দখল করে বসলেন; শুরু হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ্যোপান্ত খোঁজখবর অনুসন্ধান ; এদের সঙ্গে উপাচার্য বিধুভূষণ মল্লিক, রেজিস্ট্রার গোপাল রায়চৌধুরী ও কোষাধ্যক্ষ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় জুটে গেলেন ; ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থায় এঁরা আমেরিকা ঘুরে আসলেন, উদ্দেশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। আইনের খসড়া তৈরী হল—সে খসড়ার মূল ভিত্তি হল : ম্যালকম উইলী সাহেবের রিপোর্ট এবং তৎসহ ডগলাস এন্‌পমিজার সাহেবের ভূমিকা।

কলকাতা গেজেটে [বিশেষ সংখ্যা চতুর্থ (ক) অংশ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪] আইনের যে খসড়া সরকারীভাবে প্রকাশিত হল, সে খসড়ায় যে "উদ্দেশ্য ও কারণের বর্ণনা" দেওয়া হল, তার ভাষা একেবারে হুবহু ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অন্তবর্তী রিপোর্টের ভাষা, কি করে ভাষাগত এত গভীর মিল হতে পারে সেটা বোঝা মোটেই শক্ত নয় ; অথচ বিধানসভা বা বিধান পরিষদে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জোরগলায় ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সংস্রব অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু ফোর্ড ফাউণ্ডেশনই এর রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন :—

"The Bill embodies many of the recommendations of the "Report on a study of the University of Calcutta" by the three man team, with adaptations by the Vice-chancellor and the Education Minister of West Bengal" (১৫)

এরপর ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূল ভিত্তি যে তাঁদেরই রচনা এই গৌরবের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে ধীরে ধীরে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন তাঁদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসলেন, সে এক বিচিত্র কাহিনী। এখানে অবশ্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মূল ভূমিকা নিলেও সহযোগী হলেন রকফেলার ফাউণ্ডেশন। এক-দিকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পক্ষে সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়খ্যাত ম্যালকম উইলী, অন্যদিকে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের পক্ষে গিল প্যাট্রিক, যিনি সি. আই. এর লোক বলে বহুল পরিচিত।

খোদ রাজধানীতে অবস্থিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় "বিজয়"—ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ইতিহাসে নিশ্চয়ই একটি বড় ঘটনা। সি. ডি. দেশমুখ সে সময় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন যে কত লক্ষ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। প্রথম পদক্ষেপ ঘটল ১৯৬৮ সালে "টিউটোরিয়েল" ব্যবস্থা খোলা নিয়ে; দ্বিতীয় পদক্ষেপ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পুনর্গঠন; তারপর চলতে লাগল আমেরিকার ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্পর্কে অধ্যাপক নিয়োগ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা অর্থনীতি, আইন, জীব-বিজ্ঞান চর্চা কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন;—বিরামহীন নানাবিধ কার্যকাণ্ড। আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হল। দেশমুখ সাহেব এত বিমোহিত হলেন যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল একটি "Planning Unit"এর হাতে। সেখানে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি ঠিকই স্থান করে নিলেন আর ফাউণ্ডেশনের অনুদান অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে লাগল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ফোর্ডের টাকায় "অধ্যাপক বিনিময়ের" নামে মার্কিন দেশে বারে বারে যেতে লাগলেন; মার্কিন দেশ থেকেও পাল্টা স্রোত বইতে লাগল। বিভিন্ন সময়, ছাড়াও শুধু ১৯৬৭ সালে ৫০ লক্ষ ডলার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ফোর্ডের কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। এটা এক বছরের পক্ষে সর্ববৃহৎ অনুদান, এছাড়া আরও কয়েক লক্ষ ডলার বিভিন্ন বছরে নানাভাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে। এর মধ্যে "দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স"ও আছে। (১৬)

"বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন"—এই সব ফাউণ্ডেশন ফোর্ড, রকফেলার ও এশিয়া—এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দেখেও না দেখার যে ভূমিকা নিয়েছেন তা সত্যি লজ্জাকর। সি. ডি. দেশমুখ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, ১৯৫৬-৬১; সেখান থেকে অবসর নিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ৬২-৬৭; দেশমুখের পর চেয়ারম্যান হন ডাঃ ডি. এস. কোঠারী। দুঃখের বিষয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সব বিদেশী সংস্থা সম্পর্কে কোন নীতিই ছিল না, সুতরাং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। ১৯৬৬ ৬৭ সালের বার্ষিক রিপোর্টে প্রথম সামান্য সচেতনতার উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রস্তাব করা হয়েছে, এইসব বিদেশী অনুদান মঞ্জুরী কমিশন ও

ভারত সরকারের বাছাই অনুযায়ী দিতে হবে। কিন্তু এসব সদিচ্ছা মাত্র ছিল, এক কোন কার্যকারিতা ছিল না। ভারত সরকার রকফেলার সম্পর্কে কিছুটা কড়াকড়ি প্রয়োগ করেন, তাও ১৯৬০ সালের আগে নয়। (১৭) কিন্তু ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে অনেক সময়ই ঘরের লোকের মত ব্যবহার করা হয়েছে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনামাও তৈরী করে ফেলল। ম্যালকম উইলী ও আর্থার ব্রাক মিলে ১৯৬৮ সালে প্রকাশ করলেন—A Self Study Manual for Indian Universities and Colleges এবং এর ভূমিকা লিখলেন মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি. এস. কোঠারী।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন "জেনারেল এডুকেশন কোর্স" নামে এক শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে—দিল্লী, আলিগড় ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করে দিলেন ও তারপর মঞ্জুরী কমিশনকে বাকি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করাতে রাজি করিয়ে নিলেন; মঞ্জুরী কমিশনকে সেজন্য প্রায় দুই লক্ষ ডলার অনুদান দিয়ে হ্যানস সাইমনদ নামে এক ফোর্ড বিশেষজ্ঞকে মঞ্জুরী কমিশনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল; তাঁর সব খরচ ফোর্ডই বহন করতে লাগল। কমিশনও ব্যবস্থাটা মেনে নিল।

মাত্র সম্প্রতি, ১৯৭৪ সালে, মঞ্জুরী কমিশন দীর্ঘদিন ধরে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনকে প্রশ্রয় দেওয়ার পর কতকগুলি শর্ত আরোপের কথা জানিয়েছেন:

(১) ফাউণ্ডেশন যে অর্থ ব্যয় করতে রাজি হবেন, সে অর্থ সরাসরি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিতে পারবেন না; সমস্ত অর্থ ও তার বণ্টন মঞ্জুরী কমিশনের হাতে ছেড়ে দিতে হবে;

(২) কর্মসূচী, লোক-নিয়োগ এবং পুস্তক ক্রয়ের ব্যাপারে কমিশনই সব কিছু ব্যবস্থা নেবে;

(৩) ভারতীয় অধ্যাপকদের অনুমোদিত শিক্ষণীয় কর্মসূচীর জন্য বিদেশ ভ্রমণ শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।(১৮)

এই সব শর্ত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মেনে নিলে বুঝতে হবে, অবস্থার ঘটেছে।

আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পক্ষপুটে রয়েছে—একটি প্রশাসন সংক্রান্ত ও দুইটি ব্যবসায় ও শিল্প পরিচালনা সংক্রান্ত। হায়দ্রাবাদের "অ্যাডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ কলেজ"-ইংলণ্ডের হেনলী-অন-টেমসের

অনুরূপ কলেজের নকলে গড়া হয়েছে—সেখানে ১৯৫১-৬১ সালের মধ্যে ফোর্ড প্রায় ১৩ লক্ষ ডলার দিয়েছে। কলকাতার "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ম্যানেজম্যাণ্ট" গড়ে উঠেছে আমেরিকার ম্যাসাচুয়েটস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র ছাঁদে ও আমেদাবাদের "ইনষ্টিটিউট অফ ম্যানেজম্যাণ্ট" গড়ে উঠেছে "হার্ভাড স্কুল অফ বিজনেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের" ছাঁদে। এই দুটি প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ বে-সরকারী শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞ ডঃ জর্জ রবিনস ১৯৫৯ সালে এই বিশেষ দিকটি নিয়ে একটি রিপোর্টে প্রকাশ করেন এবং এম. আই. টি'র আলফ্রেড স্লোয়ান কলকাতার প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কলকাতার প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ১৯ লক্ষ ডলার এবং আমেদাবাদ পেয়েছে ২৫ লক্ষ ডলার।(১৯)

এছাড়া আরও বেশ কিছু শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ফোর্ডের অনুদানে পরিপুষ্ট—পিলানীতে বিড়লাদের ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হায়দ্রাবাদের সেণ্টাল ইনষ্টিটিউট অফ ইংলিশ, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগ, ইন্সটিটিউট অফ কনষ্টিটিউশনাল ও পার্লামেণ্টারী স্টাডিজ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি, প্রভৃতি···অগণিত, শেষ নেই। এর লক্ষ্য একটিই, ভারতবর্ষে আমেরিকার ভাবধারার একটি শিক্ষিত "এলিট" শ্রেণী সৃষ্টি করা, যারা কমিউনিজম-বিরোধিতা চালিয়ে যাবে।

৩.

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষ যেন ভারী বা মূল শিল্প স্থাপনে আগ্রহী না হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা মার্কিন অর্থনীতিবিদদের গভীর উষ্মা ও বিরক্তি সৃষ্টি করে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কর্তারা বিচলিত হয়ে পড়েন, তাঁরা এদেশে এসেছেন, মার্কিন মনোপলির স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে। তাঁদের বক্তব্য ভারতবর্ষ তার সমস্ত অর্থনীতিতে গুরুত্ব দেবে কৃষির উপর আর ক্ষুদ্র শিল্প গড়ার দিকে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞেরা দুবার ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন সম্পর্কে

রিপোর্ট প্রকাশ করেন—(১) The International Planning Team Report on Small Industries in India (1954) (2) Report of the International Perspective Planning Team on Development of Small scale Industries in India (1963).

এই উদ্দেশ্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে "স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি সার্ভিস ইনষ্টিটিউট", "এক্সটেনসন সার্ভিস" ও "ট্রেনিং সার্ভিস" কেন্দ্র স্থাপন করেছে।(২০)

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বিশেষজ্ঞ ডঃ ইউজিন ষ্ট্যালি—একজন বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ—এঁর উল্লেখ এই প্রবন্ধের অন্যত্র রয়েছে—তিনি এই ক্ষুদ্র শিল্প অর্থনীতির প্রবক্তা। এই তত্ত্বের পিছনে দুটি লক্ষ্য রয়েছে—এক, ভারী শিল্প গড়ে না উঠলে ভারত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উপর নির্ভরশীল থাকবে দুই, দেশে যদি অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পপতি গড়ে ওঠে, তবে তারাই হবে ধনতন্ত্রের প্রধান সমর্থক, সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, এইভাবে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতকে গেঁথে রাখা যাবে। এমন কি সমবায় ভিত্তিতে ছোট শিল্পোৎপাদনেরও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বিরোধী।(২১)

৪.

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পক্ষপাতী। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনই আগ বাড়িয়ে ভারত সরকারের কাছে এই প্রস্তাব করে; এই যোগাযোগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ভারত সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করে। এই নব-ম্যালথাস ভক্তরা সামাজিক দুর্গতির মূলে জন সংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করে থাকেন, এবং এই দুর্গতির সমাধানের পথ অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে সন্ধান না করে জনসংখ্যা হ্রাস করার প্রচার করে থাকেন। মার্কসবাদীরা ব্যক্তির জীবনে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না; কিন্তু সামাজিক সমস্যার নিরসনের উপায় বলে কিছুতেই মনে করেন না।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জীবতত্ত্ববিভাগগুলিকে এই কাজে গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন এবং মোটা অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন—যেমন, দিল্লী, বোম্বাই, বানারস, কেরল, মহীশূর ও রাজস্থান বিশ্ব-

বিদ্যালয়গুলি। এ ছাড়া নয়াদিল্লীর "অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস", বাঙ্গালোরের "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স", "ইনষ্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার" আনন্দ, বোম্বাই-এর "টোপিওয়ালা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ", মাদ্রাজের "ইনষ্টিটিউট অফ অবস্টেট্রিকস ও গাইনোকলজি"—প্রজনন সংক্রান্ত জীববিদ্যার গবেষণা করার জন্য ফাউণ্ডেশনের অর্থ পেয়ে থাকে। এর জন্য ফোর্ড শুধু ভারত সরকারকে দিয়েছে—সাড়ে নয় লক্ষ ডলার।(২২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ভারত সরকারকে সরাসরি ৩০ কোটি টাকা দিয়েছেন।

৫.

"কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং সংগঠন" ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ। ফোর্ডের ভাষায়, কলকাতা হল, "নৈরাশ্যের নগর" ফোর্ডের লক্ষ্য হল, কি করে কলকাতাকে "আশাও সম্ভাবনার" নগরে পরিণত করা যায়। ১৯৬১ থেকে ৬৯ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে পেয়েছে ৫১ লক্ষ ডলার।(২৩) ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বিশেষজ্ঞরা দলে দলে এই সংস্থায় কাজ করে গেছেন; কলকাতার কোন তথ্য বা মানচিত্র এদের কাছে গোপন নেই; অনেক কিছু পাচার হয়েছে, এই অভিযোগ বারে বারে বিধানসভা ও পরিষদে উঠেছে। এমন কি কলকাতার বাহিরে দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, বৃহত্তর কলকাতা সব কিছুতেই এই সব বিশেষজ্ঞরা হাত দিয়েছেন। তা ছাড়া ভারত সরকারের যোজনা পর্ষদ ও অন্যান্য রাজ্যের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত অফিসারদের এখানে বছরের পর বছর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ও পরে আমেরিকা ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। এই ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রশাসনের মূল মূল স্থানে যে সব অফিসার আছেন, তাঁদের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন চিনে রেখেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার হবার পর সি. এম. পি. ও থেকে ফোর্ডের সাহেবরা একেবারে চলে না গেলেও, নূতন আর কেউ আসছেন না। কলকাতার কোন উন্নতি না হলেও, টাকা খরচ হয়েছে দেদার এবং মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এই কয়বছরে যা জানবার সবই জেনেছেন। ব্লক ও ইউনিয়ন স্তরে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ধরণের মানচিত্র তৈরী হয়েছে; বীরভূম জেলার গ্রামীণ

অর্থনীতির সমস্ত খুঁটিনাটি সমীক্ষা গ্রহণ করেছেন। এসব কিছুর সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এদেশে যে জাল বিস্তার করেছেন, তার শেষ লক্ষ্য হল দেশের রাজনীতিতে প্রবেশ, এবং তার মোড় ঘোরানো। একথা তাঁদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য গোপনীয় রিপোর্টে ভালভাবেই তুলে ধরেছেন—

"On the political side, perhaps we should open doors to travel and study tours outside of India for cnrrent as well as potential political leaders...to ventilate their minds, to have new experiences, so that they, in turn, will take an increasingly open and forward view about the kinds of national policies and legislation required for India to succeed in its development as a viable economy and a viable democracy"(২৪)

অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতাদের ধরতে হবে এবং বিদেশ মানে মার্কিন মুলুকে নিয়ে গিয়ে মার্কিন চিন্তাধারার শরীক করতে হবে, যাতে তাঁরা ফিরে এসে সেই ধরনের নীতি ও আইন গ্রহণ করেন। বিরোধীদলের রাজনৈতিক নেতারা—যাদের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনমূলক—তাঁদেরও নিতে হবে। কাজ কঠিন ও ঝুঁকি আছে কিন্তু সাবধানে চললে দারুণ সাফল্য(২৫) এরপর ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ষোলকলা পূর্ণ হবে, ভারতবর্ষ মার্কিন নয়া-উপনিবেশে পরিণত হবে।

কিন্তু এই গোপনীয় রিপোর্ট ১৯৬৬ সালে লেখা, তারপর বিশ্ব রাজনীতি ও দেশের অভ্যন্তরে বহু পরিবর্তন ঘটেছে; ফোর্ডের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় নি; কিন্তু ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আশা ছাড়বার পাত্র নন; তাঁরা নূতন নূতন সূক্ষ্ম কৌশল নিচ্ছেন।

পরিশিষ্ট

(১) লোকসভা বিতর্ক—৬ মে, ১৯৬৫

(২) নিউ এজ সাপ্তাহিক—১৯ নভেম্বর, ১৯৭২

(৩) "the accelerating growth of Soviet power and the emergence of a powerful Communist China"—The Ford Foundation : Annual Report 1961.

(৪) "These philanthropies jealously guard their independence of government yet their actions have unquestionably contributed much to the advancement of the underlying purposes of U. S. Foreign Policy"—Philip. H. Coombs : **The Fourth Dimension of Foreign Policy** : p. 71.

(৫) P. J. Eldridge : **The Politics of Foreign Aid in India** : pp 23-24.
"It seems reasonable to argue that they can approach delicate questions...which governments fear to approach."

(৬) The Ford Foundation **Self study of the India Program** (mimeo) : p 22.

(৭) International Affairs-Monthly Moscow, Dec, "Benevolence as camouflage" by N. Vetrova.

(৮) External Assitance : Govt. of India : 1971-72 & 72-73.

(৯) **France/Asie**-Bilingual Review—Vol XXIV-200-No. 1 1970 : Alfred W. McCoy "US Foreign Policy and the Tenant Farmers of Asia."

(১০) "We recognise the need for considering programmes for the relief of those who have no land, and of those who cultivate too little land. But **it is imperative to achieve this objective in ways that will not retard the increases in food production which are vital to national welfare**....care should be exercised, however, so as not to break up farms that are efficiently and productively operated"—p 29 (italics in the original)

(১১) Annual Reports of Department of Supply : Govt. of India.

(১২) **The Economic and Political Weekly** : Annual Number, 1972.

(১৩) Philip H. Coombs : The World Educational Crisis, p 79.

(১৪) **France-Asie** : op. cit.

(১৫) The Ford Foundation in India and Nepal : **A Status Report** ; Oct. 1, 1966 ; p 102.

(১৬) The **Ford Foundation in India (1951- 968)**, with a fore ward by C. D. Desmukh ; এবং **US Facts speak about aid and Education**, published by the Front against US Imperialist Penetration, Delhi University, 1969.

(১৭) External Assistance, Govt. of India 1960, p 75,

(১৮) The Hindustan Standard, 29 Aug, 1974.

(১৯) The Ford Foundation **Summary of grants from 1951 to 1969.**

(২০) External Assistance Govt. of India : 1963.

(২১) "as a rule no attempt should be made to have co-operator's association for production"—"Report on Small Industries in India, The International Planning Team, the Ford Foundation. (1954)

(২২) The Ford Foundation Grants in Population 1966.

(২৩) The Ford Foundation **Summary of grants from 1951 to 1969.** Op. cit.

(২৪) The Ford Foundation **Self study of the Indian Program** (mimeo), op. cit—p 86.

(২৫) এই উদ্দেশ্য যা তাদের গোপনীয় রিপোর্টে রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা করুন তাদের প্রকাশ্য ঘোষণা :—

In making its assistance available in India, the Foundation—remains entirely outside the political arena and does not seek to further any particular ideology or the purposes of any one party or group.

—[**The Ford Foundation and Foundation supported activities in India**—p 2]

কংগ্রেসে প্রগতিশীল বিচারের মানদণ্ড

রণধীর দাশগুপ্ত

কংগ্রেসের মধ্যে কারা প্রগতিশীল—এটা একটা মামুলী প্রশ্ন নয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া থেকেই এই প্রশ্ন উদ্ভূত। এই প্রশ্নের সমাধান না করে বিপ্লবের শ্রেণী মৈত্রীর সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব।

অথচ এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত না থাকার ফলে ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের উপর প্রগতিশীলতা নির্ধারণের প্রবণতা অনেক সময়ে প্রকট হয়ে ওঠে। বিষয়টি আরও জটিলতা ধারণ করে এই কারণে যে কোন কোন বিষয়ে যাঁরা প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁরা আবার অপর বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে আবির্ভূত হন। এই সমস্যাটা অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতি নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত ভূমিকার জন্য। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা যখন প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবার যখন এই বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পন করে তখন কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলেরা তাদের শাসকদলের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে সমর্থন করে বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও বলিষ্ঠপদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এই কারণে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি আদৌ আছে কিনা অথবা থাকলে তারা কতটা প্রগতিশীল—এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে বামপন্থী মহলে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হয় তত্ত্ব ব্যতিরেকে যার তাৎক্ষণিক সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কংগ্রেসের মধ্যে কোন প্রগতিশীল শক্তি আছে বা থাকতে পারে—এ কথা সি পি এম এবং অন্যান্য বামপন্থী দল বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে কংগ্রেসই হল দেশের প্রধান শত্রু। কংগ্রেস সম্পর্কে তাদের ধারণা হল কংগ্রেস হচ্ছে সমশ্রেণীভুক্ত বা সমগোত্র সংগঠন। সেই হিসাবে তাদের

আছে সমগ্রভাবেই কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল। এটা তাদের অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার উৎস। অপর দিকে, কংগ্রেসের প্রগতিবাদীদের পক্ষ থেকে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে কোনো রকমের সহযোগিতা করতে অসম্মতি অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতাকে আরও তীব্র করেছে।

অথচ কংগ্রেস হচ্ছে বহুজাতিক এবং বহুশ্রেণী ভিত্তিক সংগঠন। কংগ্রেসের মধ্যে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর একাংশ আছে তেমনই আছে বুর্জোয়াশ্রেণী। যেমন আছে কৃষক সমাজ তেমনই আছে জোতদার, ধনীকৃষক ও ব্যবসায়ী। পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আছে প্রগতিশীল সম্ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তেমনই আছে চরম প্রতিক্রিয়াশীলেরা। কংগ্রেসের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর প্রভাবও বিশেষভাবে বিদ্যমান। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। কংগ্রেসের মতাদর্শ বুর্জোয়াশ্রেণীরই মতাদর্শ। কংগ্রেস সরকার দেশকে পরিচালনা করছে ধনতান্ত্রিক পথে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রই হচ্ছে এদের শাসন পদ্ধতির কাঠামো। শাসকশ্রেণী যখন দেশের সংহতির কথা বলে থাকেন তখন তাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকেই উর্ধে তুলে ধরেন।

আবার একথাও ভুললে চলবে না যে কংগ্রেস হচ্ছে বহু বিপরীত শ্রেণী শক্তির মিশ্রন। কংগ্রেসের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের পাশাপাশি চলেছে নীতির সংগ্রাম, যদিও এই সংগ্রাম অত্যন্ত দুর্বল ও অসংগঠিত। ইন্দিরা সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী অর্থনৈতিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে গুঞ্জন আছে কিন্তু কোন সংগঠিত প্রতিবাদ নেই। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেসের প্রগতিবাদীদের নৈতিক সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিন্তু সেই সংগ্রামে তাঁরা কখনই দৃঢ় নন। কারণ, তাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দ্বারা এতই আচ্ছন্ন যে শ্রেণীসংগ্রামকে সমর্থন করতে বা শ্রেণী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে তাঁরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সোচ্চার।

বহুজাতিক সংগঠন এবং বহুশ্রেণী ভিত্তিক সংগঠন বলে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল (গণতান্ত্রিক শক্তি) এবং প্রতিক্রিয়াশীল উভয়েই রয়েছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে ভগ্নজানু বলে কংগ্রেস সরকারের প্রতিক্রিয়া-

শীল নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারছেন না। অতএব কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি নেই—সি পি এম-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই শক্তি যে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল—এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সমস্যাটাকে কেবল এই নিরিখ দিয়ে বিচার করা যায় না। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান স্তরে কো'ন্ কোন্ শ্রেণী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবে এবং সেই সেই শ্রেণীর অংশ কংগ্রেসে আছে কিনা—এটি হিসাবের মধ্যে এনে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের ভূমিকা বিচার করতে হবে। কারণ, দেশে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বিপ্লবী শক্তিসমূহ নেতৃত্বের বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে বিপ্লব প্রবাহে অংশ গ্রহণ করবে। কারণ শ্রেণী সংগ্রাম কে কতটা প্রগতিশীল, তা প্রমাণ করে দেবে এবং নেতৃত্বের বাধা-বিঘ্নকে তোয়াক্কা করবে না। আজকে কংগ্রেসে যে শক্তি দুর্বল পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে এবং শ্রেণী সংগ্রামের আঘাতে সেই শক্তি সবল হয়ে নতুন নেতৃত্বের সন্ধান করবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে যারা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবে তারা হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, পেটিবুর্জোয়ারা এবং একচেটিয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা অংশ। এই জাতীয় বুর্জোয়ারা দোদুল্যমান প্রকৃতির হলেও বিপ্লবের শক্তি। এরা কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাবশালী। কংগ্রেস সরকারের সাহায্য ব্যতীত এদের শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার অসম্ভব। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সমাজ এবং পেটিবুর্জোয়াদের একটা বৃহৎ অংশ কংগ্রেস অনুগামী এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত। যারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবে তারা যেমন কংগ্রেসের মধ্যে রয়েছে, আবার যারা প্রতিবিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তাদের শক্তিও কংগ্রেসের মধ্যে বিদ্যমান। অতএব কংগ্রেস জাতীয় বিপ্লবী সংগঠন নয়। কংগ্রেস হল বুর্জোয়া সংগঠন। কংগ্রেসের বিভক্তিকরণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তারা শ্রেণী চরিত্রের পরিবর্তন হয় নি।

কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়া যারা রয়েছে তাদের বাদ দিয়ে যেমন জাতীয় গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা অসম্ভব তেমনই আবার বামপন্থী পার্টিসমূহের

মধ্যে ঐক্য হলেও উপরিউক্ত শক্তিকে বাদ দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। বিপ্লবে যাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে এবং বিষয়গত স্বার্থ আছে তাদের কোন অংশকে বাদ দিলে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, বরং যাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হয় তারাই এর সুযোগ গ্রহণ করে এবং বিপ্লবী শক্তির ভেদকে লক্ষ্য করে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে। এর ফলে বিপ্লব ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হয়। এটা হল ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। জার্মানীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে যদি শ্রমিকশ্রেণী সমর্থন না করত বা অংশ গ্রহণ না করত তা' হলে সেই বিপ্লব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত। আবার রুশদেশে ১৯০৫ সালে শুরু থেকে কৃষকেরা যদি সশস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর সহযাত্রী হোত তা'হলে বিপ্লবের ভাগ্য ভিন্নরূপ হোত। বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করা যাদের বাস্তব স্বার্থ, তারা কোন কারণে বা পশ্চাৎপদতার জন্য অগ্রসর হতে যদি দ্বিধা-গ্রস্ত হয়, তা'হলে তাদের বাদ দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির কাজ নয়। বরং কমিউনিস্ট পার্টিকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে পশ্চাৎপদ অংশ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় এবং সচেতনতায় সংগঠিত হয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে। অতএব কংগ্রেসের বাইরে হোক বা ভিতরে হোক বিপ্লবের মিত্র-শক্তির প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রণকৌশলের কাজ বিপ্লবের শক্তিকে অনুসরণ করা নয় বরং ধাপে ধাপে তাদের সচেতন করা, সংগঠিত করা, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য গড়ে তোলা এবং বিপ্লবের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করা।

কংগ্রেসের মধ্যে এমন শক্তি আছে যারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবে। আংশিক হলেও শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়ারা কংগ্রেসের অনুগামী শক্তি। এরা বিপ্লবের শক্তি। আর আছে একচেটিয়া পুঁজিপতি নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়ারা যাদের একাংশ বিপ্লবে অংশগ্রহণে আগ্রহী। এরা সকলেই প্রগতিশীল শক্তি। কিন্তু বিপ্লবী প্রগতিশীলতার সঙ্গে সংস্কারবাদী প্রগতিশীলতার পার্থক্য আছে। বিপ্লবে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে যেমন আছে শোষক শ্রেণী, (যেমন জাতীয় বুর্জোয়ার দেশপ্রেমিক অংশ) তেমনই আছে শোষিত শ্রেণী (যেমন শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি)। অতএব প্রগতিশীল বলে সকলের ঐতিহাসিক ভূমিকা একপ্রকার হতে পারে না বা সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। বলা বাহুল্য, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দোদুল্যমান চিত্ত জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা একরকম হতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সীমিত নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা বিস্তৃত। শ্রমিকশ্রেণী হল নতুন সভ্যতা এবং নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টিকর্তা আবার শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তম্ভ। সেটি বুর্জোয়ারাও শ্রমিক-কৃষকের অর্থাৎ যারা শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় সহযাত্রী। জাতীয় বুর্জোয়ারা, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম শক্তি কিন্তু তারা শোষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাই অ-শোষকশ্রেণীর ভূমিকার সঙ্গে তাদের তফাৎ আছে এবং থাকবে।

কেবল তা নয়, গত কয়েকবছর যাবৎ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, এমন কি কংগ্রেস অনুগামী শ্রমিকদের মধ্যেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কংগ্রেস অনুগামী আই এন টি ইউ সি-র শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্রবল। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন শিল্পে কংগ্রেস ও আই এন টি ইউ সি-র নেতাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শ্রমিকেরা ধর্মঘটে শামিল হয়েছে এবং সরকারী দমননীতির সম্মুখীন হয়েছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বনাম শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য—অলক্ষ্যে এই সংগ্রাম চলেছে। যাদের আমরা কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ বলে আখ্যা দিতে থাকি, তাঁরা এসব ধর্মঘটের বিশেষ করে রেল ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছেন, এমনকি ধর্মঘট ভাঙার কাজেও তাঁরা কোথাও কোথাও লিপ্ত হয়েছেন। লোকসভায় এই প্রগতিশীল কংগ্রেস সদস্যরাও রেল ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছেন। কংগ্রেস অনুগামী বা আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক এবং কংগ্রেসের এই প্রগতিশীল সদস্যদের অবস্থানের মধ্যে এই তারতম্য লক্ষণীয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি দেশে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। অস্বাভাবিকভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের বর্ধিত বেতন এবং মহার্ঘ ভাতার শতকরা ৫০ ভাগ কেটে নেওয়ার জন্য যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে, তাতে সরকারের ইপ্সিত মুদ্রাস্ফীতি ত রোধ হয়-ই নি বরং পুঁজিবাদী সংকটের বোঝা শ্রমিক-শ্রেণী ও কর্মচারীদের উপর আরও বেশি করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক

শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বিরাট আক্রমণ পুঁজিবাদকে সংকট থেকে রেহাই দেবে না বরং ভবিষ্যতে দলমত নির্বিশেষে গোটা শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করবে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না।

আশা করা হয়েছিল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নীতি দেশকে যে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধের অজুহাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং ধনী কৃষক ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করে যে খাদ্যনীতি রচনা করা হয়েছে যার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে অনাহার ও দুর্ভিক্ষ—কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ এবং সংসদের প্রগতিশীল কংগ্রেস সদস্যরা এই সব নীতির প্রতিবাদ করবেন, জনসাধারণকে এর বিপদ সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং অন্যান্য বামপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করে শ্রীমতী গান্ধীর দক্ষিণপন্থী নীতিকে বাধা দেবেন এবং দেশকে সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করবেন। এটার নামই সত্যিকার প্রগতিশীলতা। প্রতি মুহূর্তে দক্ষিণপন্থী নীতি ও কার্যকলাপের কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম প্রগতিশীলতা নয়। যে প্রগতিশীলতা দেশকে উদ্বুদ্ধ করে, জনসাধারণকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে, দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্পর্কে পথ নির্দেশ করে, সেই প্রগতিশীলতা সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে সেই প্রগতিশীলতার বিকাশ সাধন করা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতা যে প্রগতিশীল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কারণ এই সহযোগিতা আমাদের দেশে বিপ্লবী শক্তিকে সাহায্য করে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক পথ আঁকড়ে থাকাও যে প্রতিক্রিয়াশীল এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই কারণ এই পথ প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং শক্তিশালী করে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানে একটি স্ববিরোধ রয়েছে। তাঁরা সোভিয়েত এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সমর্থন করেন, আবার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গরীবী হঠাবার নামে ধনতান্ত্রিক পথকেও আঁকড়ে ধরে থাকেন। এই স্ববিরোধিতা অতিক্রম করাই হবে প্রগতিশীলতার মানদণ্ড।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আমরা যাদের অধিকতর প্রগতিপন্থী (এখানে অধুনা-লুপ্ত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ফোরামের কথা মনে রাখতে বলি) বলে আখ্যা দিয়ে থাকি তারা এখনও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কারাগারে বন্দী। এটা অনিবার্য যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র হবে দ্বিমনা, সীমিত এবং সংকীর্ণ। কংগ্রেসের প্রগতিশীলেরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুসৃত নীতিতে বিচলিত কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁরা এই নীতির বিপদ অনুধাবন করলেও কোন বিকল্প পথ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন না। এঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কিন্তু বহুজাতিক কর্পোরেশনকে ভারতে আমন্ত্রণকে অপছন্দ করলেও এর বিরোধিতা করতে সাহস পান না জনসাধারণকে এর বিপদ সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে পারেন না। তাঁরা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিপদ সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল-দের শক্তি যে সম্প্রতি বেড়ে চলেছে সে সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে যে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী প্রভূত পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছে এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট সতর্কতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বিরোধী এই দৃষ্টান্তও বিরল নয়। জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের সমর্থনে তাঁরা এগিয়ে আসতে সাহস পান না। এঁরা সরকারের অনেক নীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের প্রচণ্ড মোহ ও ভীতি রয়েছে। এঁদের কোন সংগঠন নেই, এঁদের কোন সুস্পষ্ট বিকল্প নীতি নেই। সর্বোপরি এঁরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সংক্ষেপে বলা চলে এঁদের মধ্যে অবশ্যই প্রগতিশীলতার উপাদান আছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এঁদের মধ্যে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের চেতনার উন্মেষ হয় নি। বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের মাপকাঠি হল : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ না হলেও অন্ততঃ পুঁজিবাদবিরোধী ধারণায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হ'বে। যারা বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পতাকা বহন করবেন তাঁদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুঁজিবাদবিরোধী কর্মপন্থা সম্পাদনের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। অনতান্ত্রিক পথ এবং দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিকে সজোরে আঘাত করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মেহনতী কৃষকের স্বার্থে প্রগতিশীল

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জীর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে পরিবর্তন করার সংগ্রামে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। এই কাজ যাঁরা করতে পারবেন তাঁরাই হবেন কংগ্রেসের ভিতরকার খাঁটি প্রগতিশীল শক্তি, তাঁরাই হবেন বিপ্লবী গণতন্ত্রী। এঁরাই হবে গোটা বুর্জোয়ার সেই বামপন্থী বিপ্লবী অংশ যারা শ্রমিক, কৃষক তথা মেহনতী মানুষের স্বার্থ প্রতিফলিত করবে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অধিকতর দৃঢ় ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু এই কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে না। এই শক্তির উন্মেষে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন ভূমিকা পালন করলে এবং গণসংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে গণপার্টিতে পরিণত হলে কংগ্রেসের মধ্যে আজ যারা নিরাকার প্রগতিশীল বলে খ্যাত তারা বিপ্লবী গণতন্ত্রী শক্তিতে পরিণত হবে। এর অর্থ হচ্ছে বহুজাতিক এবং বহু শ্রেণীভিত্তিক কংগ্রেসের মধ্যে নীতিকে কেন্দ্র করে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে উঠবে যা বাইরের বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

এই কাজ আদৌ সহজসাধ্য নয়। কংগ্রেসের মধ্যে যাদের প্রগতিশীল বলা হয় তাদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে প্রচার ও আলোচনা, তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষতঃ ভারতে নয়া-উপনিবেশবাদের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ড, সংকট জর্জরিত ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণের ফলে জনগণের দুর্গতি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি ও বাজারের উপর আধিপত্য, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পুঁজিবাদবিরোধী ধারার উদ্ঘাটন এবং কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশের পরিবর্তে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কারের প্রবর্তন—এ সব বিষয়বস্তু মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। কেবল মাত্র যৌথ আন্দোলনের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক এবং তত্ত্বগত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা যায় না। কংগ্রেসী প্রগতিশীলদের এ সব বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারলে তাদের রূপান্তর ঘটবে। তারা হবে তখন সত্যিকার প্রগতিশীল অর্থাৎ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি। এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি ইন্দিরা সরকার অনুসৃত মধ্যপন্থার কৌশলে বিচলিত হবে না, বরং দোদুল্যমান শক্তিকে পক্ষে টেনে এনে মধ্যপন্থার মোকাবিলা করে সঠিক নীতি ও পন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে। এরাই তখন দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করবে। এই শক্তির সৃষ্টি গণ-

আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামে জোয়ার সৃষ্টি করবে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী গঠনের পক্ষে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা এক বিরাট সম্পদ। বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে বাম ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য যেমন দৃঢ় হবে, তেমনই আরও দৃঢ় হবে সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ মৈত্রী।

এই কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত এই কঠিন কাজ আর কে করতে পারে ?

পত্রিকা-পরিচয়

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স' পার্টিসমূহের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে চলেছে মাসিক 'ওয়র্ল্ড' মার্কসিস্ট রিভিউ' পত্রিকাটি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ২৬টি ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ১৪৫টি দেশে প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের সৌভাগ্য যে এখন এই পত্রিকাটি কলকাতা থেকে বাংলাতেই প্রতিমাসে প্রকাশিত হচ্ছে—'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' নামে।

এই একটি পত্রিকা যেমন আমাদের সামনে তুলে ধরছে বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটটি, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিকাশের সঙ্গে জড়িত নানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রশ্নগুলির সমাধান প্রয়াসের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রে'।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেহারা ও চরিত্র যেমন স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেয় এর রচনাসমূহে তেমনি ঐসব বিপ্লবী শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিচয় পাচ্ছি প্রত্যেকটি দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে।

এই পত্রিকাটির অপর একটি আকর্ষণীয় দিক হল সদ্যস্বাধীন ও অনুন্নত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ ও সমস্যাসমূহের তথ্যনিষ্ঠ ও তত্ত্বগত আলোচনা। বন্ধুপ্রতিম পার্টিগুলির পারস্পরিক আলোচনার খবরা-খবর ও এই পত্রিকার মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে বিকশিত করতে ও বিকাশের নতুন নতুন সমস্যার আলোচনায় 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রে'র অবদান গৌরবময়।

বাংলা ভাষায় এর প্রকাশ আমাদের গর্বিত এবং উৎসাহিত করে। প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট কর্মী ও দরদী, গবেষকের অবশ্যপাঠ্য 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'।

ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

শিল্পোন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হল পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। ভারতের ক্ষেত্রে এখনও আমরা উন্নত পরিবহনের সঙ্গে সহাবস্থান দেখি আদিম গো-যানের। চাহিদার তুলনায় এখানে মাল পরিবহনযোগ্য যানের যোগানের নিদারুণ অপ্রতুলতা।

সুখের বিষয় কয়েকজন বাঙালী শিল্পপতি ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ এই কলকাতাতেই একটি নতুন সংস্থা তৈরী করেছে—**ইনসোভ্ অটো লিমিটেড**। এরা সোভিয়েত "প্রমাশ এক্সপোর্টে" বিপুল কারিগরী ও অর্থ-নৈতিক সহযোগিতায় উত্তরপ্রদেশের সাণ্ডিলাতে একটি মাঝারী ব্যবসায়িক যান নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করছেন—যার মূলধন হচ্ছে ১৬ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এটিই হচ্ছে ভারতের প্রথম বেসরকারী উদ্যোগ যেখানে সোভিয়েত সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিয়েছে।

একচেটিয়া প্রভাব মুক্ত এই সংস্থার মূলধনী মালিকানার একটা বৃহৎ অংশ হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যা এই সংস্থাকে ভারতীয় শিল্পে একটি নতুন ও বিশিষ্ট মর্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই উদ্যোগটির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণও একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এখানকার কর্মীদের সঙ্গে পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক শ্রমিক-মালিকের নয়—পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত এই সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক।

এই কারখানার নির্মাণকার্য শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই কারখানাটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে বছরে ১২০০০ ছোটো ট্রাক ও জীপ তৈরী করবে। এই মোটরযানগুলি যেমন দেশের সর্বত্র চলাচলের উপযোগী তেমনি প্রতিরক্ষার প্রয়োজনও মেটাতে পারবে। আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সার্বিক সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে—**ইনসোভ্ অটো লিমিটেড**।

ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা

ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য সোভিয়েত সাহায্য সংক্রান্ত ঐতিহাসিক চুক্তিটি তখন স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

আজ এই সহযোগিতার পরিধি বহুবিস্তৃত। এই সহযোগিতা ভারতকে তার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রসারিত করতে, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে।

সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত বা নির্মীয়মান প্রায় ৭০টি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সহজ শর্তে ভারতকে ঋণ দিয়েছে ১০২২ কোটি টাকা।

সোভিয়েত সহযোগিতায় ভারতে নির্মিত শিল্পোদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন হয় মোট ধাতুবিদ্যাগত সাজসরঞ্জামের ৮০ শতাংশ, ভারী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের ৬০ শতাংশ, তেল উৎপাদন ও পরিশোধনের ৫০ শতাংশ, ইস্পাতের ৩০ শতাংশ। বলাবাহুল্য এইসব শিল্পোদ্যোগের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারেরই। সোভিয়েত সহযোগিতায় নির্মিত হতে চলেছে তেল, কয়লা, রাসায়নিক, অ্যালুমিনিয়াম, তামা ও অন্যান্য বহু প্রকল্প। ৬০ লক্ষ টন শোধনক্ষমতাসম্পন্ন মথুরা শোধনাগার হবে ভারতের বৃহত্তম তেল শোধনাগার।

ভারতের বিদ্যুৎশক্তি সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় সোভিয়েত সহযোগিতা অদূরভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৭টি নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত হরিদ্বারের ভারী বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম কারখানায় জেনারেটর উৎপাদনের ভিত্তিতে

কলকাতায় ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণেও সোভিয়েত সহযোগিতা কলকাতার যানবাহন সমস্যা সমাধানের কাজে অনেকখানি সাহায্য করবে।

ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা অবশ্য শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত, ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তিতেই তা মূর্ত হয়েছে। এই সহযোগিতা উভয় দেশের জনগণের স্বার্থানুগ এবং এশিয়ায় তথা সারা পৃথিবীতে শান্তি ও সহজ সম্পর্ক সুরক্ষিত করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

যদি ভেজাল চা কিনে
ঠকতে চান, অযথা দাম
বেশী দিতে চান তবে

সাপ্পায়ার টি
কোম্পানীতে
আসবেন না

(১০ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০০০১

With Best Compliments Of :

★
★
★

SARKAR ELECTROPLATING
WORKS

3, Dedar Baksh Lane
Calcutt-16.

With Best Compliments from

M/s. Nundy
Commercial Co.

1/A, Canning Street,
Calcutta-1

(Jute goods Dealers &
Suppliers)

Phone : 22-2267
35-1875

দৈনিক
ও
সাপ্তাহিক

কালান্তর

পড়ুন

এই প্রতীক কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ই-আই-সি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্‌ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌
আপনার সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬